শংকর ঘোষ

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলকাতা-৬

প্রকাশক : শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

মুখবন্ধ

কোন বই-এর ভূমিকা লেখা বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, ঋদ্ধ লেখকের পক্ষেই সম্ভব। আমি আমাকে এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি মনে করি না। কেননা যে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও সাহিত্যিক নৈপুণ্য ও ভাষার সাবলীলতা থাকা দরকার, তা আমার নেই, আছে একটি মাত্র অধিকার। তা হলো আমি ছিলাম মাষ্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের একজন সাধারণ সৈনিক।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার মাষ্টারদার নির্দেশেই চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব সফল আক্রমণ করে মাষ্টারদার বহু দিনের স্বপ্ন—পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়া — বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। তিনিই বিপ্লবী দলের প্রথম মহিলা শহীদ। এজন্য বাঙালী গৌরব ও গর্ববোধ করতে পারে।

প্রীতিলতা ওরফে রাণী এক অনন্যসাধারণ অবিস্মরণীয়া মহিলা। তাঁর অসীম সাহস, অকৃত্রিম দেশপ্রেম এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগের জন্য দেশবাসীর অন্তরে তাঁর স্থান চিরকাল অম্লান থাকবে বলে আমার নিঃসংশয় বিশ্বাস। তাঁর জীবন ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে এই বই লেখার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা বোধ নিয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সত্যিকারের নির্ভুল জীবনী রচনা কঠিন কাজ। তিনি ছিলেন গোপন বিপ্লবী দলের সদস্যা। বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হতো। দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করে, বহু বিপ্লবীর সাথে কথা বলে, তাঁর সম্পর্কে বই পড়ে, প্রীতিলতার আত্মীয় পরিজনদের সাথে কথা বলে, তদানীন্তন ভারতের পুরানো

সংবাদপত্র ও পুলিশ ফাইল ঘেঁটেঘুটে প্রীতিলতা সম্পর্কে একটা ছবি আঁকা হয়েছে। এই সুন্দর ছবিটি কল্পনাপ্রসূত নয়। বরং বাস্তবমুখী। অসাধারণ পরিশ্রম এবং প্রীতিলতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের ফসল এই জীবন কথা। আমার মনে হয়, বইটির প্রচুর প্রচার হবে এবং ভবিষ্যতের নবজাতকেরা এই বই পড়ে মানসিক বৈভবে সমৃদ্ধ হবে। দেশকে, দেশের আপামর জনসাধারণকে ভালবাসতে শিখবে। অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সত্য ও সঠিক পথের অনুসারী হবে, এই আমার প্রতীতি। লেখকের অকৃপণ নিষ্ঠার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং তিমির বিদারী, আলোর দিশারী তরুণতরুণীদের বইটি সংগ্রহ করে পড়ার আবেদন জানাই।

বীরকন্যা প্রীতিলতার আরও দু'খানা জীবনী দু'জনের লেখা আমি পড়েছি। তাতে পূর্ণেন্দুবাবুর বই পক্ষপাতদুষ্ট। বিপ্লবীদের বড় করতে গিয়ে প্রীতিলতার আত্মহত্যার ঘটনাকে গুলির আঘাতে মৃত্যু বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যজন মহিলা। তিনি রামকৃষ্ণের সাথে প্রীতিলতার প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কের কল্পনা করেছেন। যা ইতিহাসের বিকৃতি। কিন্তু এ বইটি তা নয়। অনুকূল স্রোতে তরী তরতর করে আগুয়ান হয়, গুন টেনে লগি ঠেলে তাকে নিয়ে যেতে হয় না। প্রীতিলতার জীবন তরীটি পাঠকপাঠিকাকে অনুকূল স্রোতের মত টেনে নিয়ে যাবে লেখকের নৈপুণ্যে। লেখকের নিরলস সাধনা, কঠোর শ্রম, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান বীভৎস অবক্ষয়ের যুগে একজন মহীয়সী মহিলার অসাধারণ জীবন কাহিনী রচনার জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাই। বীর প্রসবিনী চট্টলার প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ তেজস্বিনী প্রমাণ করুক কবিগুরুর অন্তরের কথা, 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা' যেন ধরার ধূলায় না হারিয়ে যায়। লেখকের আপ্রাণ চেষ্টা প্রশংসার্হ। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের মত স্বাধীনতার জন্য তপস্বিনী প্রীতিলতার নিঃশেষে প্রাণদানের ইতিহাস যতই প্রচারিত হবে ততই দেশের মঙ্গল বয়ে আনবে। বইটি দেশের বহুল ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হউক এই আন্তরিক কামনা জানিয়ে অনভিজ্ঞ আমার কথা শেষ করছি।

বিনোদ বিহারী চৌধুরী

আমাদের কথা

'অধিকাংশ মৃত্যুই পাখির পালকের মত হাল্কা, কিন্তু কোন কোন মৃত্যু পাহাড়ের মত ভারী।' যাঁদের জীবনপ্রদীপ সভ্যতার অনির্বাণ অগ্নিশিখাকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে সমিধ হিসাবে কাজ করেছে, যাঁদের অস্তিত্বের একটাই অর্থ — 'কতদিন বাঁচলাম এটা বড় কথা নয়, কেন বাঁচলাম, কাদের জন্য বাঁচলাম, এটাই আসল কথা' — তাঁদের মৃত্যুতেই সমগ্র মানবহৃদয় আলোড়িত হয়, তাঁদের মৃত্যুই পাহাড়ের মত ভারী। আজ থেকে ঠিক ৭৫ বছর আগে এদেশের বুকে এরকমই এক মহান আত্মোৎসর্গের ঘটনা ঘটেছিল। 'আমার মৃত্যুতে বহুদিনের সংস্কার ভেঙে খান খান হয়ে যাবে, রক্তাক্ত এই সংগ্রামের পথে হাজারে হাজারে যোগ দেবে দেশের বোনেরা, ভাইদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে মানবমুক্তির সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা পালন করবে' — এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন প্রীতিলতা। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম নারী শহীদ। দিনটা ছিল ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২।

বিবেককে আবিলতায় আচ্ছন্ন করে বাঁচতে চেয়েছে সব যুগের নিপীড়কেরা। এ কালও তার ব্যতিক্রম নয়। ক্লেদাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যৌবনকে বিপথগামী করার দ্বারা ওরা বাঁচতে চায়। এই কারণে, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, মাষ্টারদা, প্রীতিলতার জীবনসংগ্রাম ওদের কাছে আতঙ্কের বিষয়। এঁদের স্মৃতিকে দেশ থেকে মুছে ফেলতে চায় ওরা। এঁদের ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অন্ত নেই ওদের।

আবার দেশের সংগ্রামী বিবেক মহান এই পূর্বসূরীদের জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা আহরণ করে আজকের দিনে বন্ধুর পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পায়, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। এ দেশের বুকে নবজাগরণের সংগ্রামে যাঁদের কীর্তি অতুলনীয়, স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই পরিচালনা করেছিলেন, তাঁদের জীবনকে অনুসরণ করেই পথ চলার শিক্ষা আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শ্রী শিবদাস ঘোষ। তিনিই এই সব মহান মানুষদের জীবনচর্চার গুরুত্ব নতুন আলোকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'প্রমিথিউসের পথে' একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। অন্ধকার দূর করার যে অভিযান এই দেশে চলছে আমরা সেই পথেরই যাত্রী। প্রীতিলতার প্রামাণ্য জীবন কাহিনী রচনার এই চেষ্টা দেশের সংগ্রামী মানুষের সেই বিবেকী অভিযানের সামান্য অংশমাত্র। সহৃদয় পাঠকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন এই প্রামাণ্য জীবনকাহিনী রচনা কত দুরূহ। তিনি ছিলেন গোপন বিপ্লবী দলের কর্মী, তাঁদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হত। ফলে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রমাণ রেখে যাওয়া ছিল সংগঠনের নীতিবিরুদ্ধ। দীর্ঘ আট বছর আগে যখন এই চেষ্টা আমরা শুরু করেছিলাম তখন মাষ্টারদার সংগঠনের যে সমস্ত

বীর বিপ্লবীরা প্রীতিলতাকে দেখেছেন ও তাঁর কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রয়াত। শুধু বিপ্লবী অর্দ্ধেন্দু গুহ ও বিপ্লবী দীনেশ দাশগুপ্ত প্রীতিলতা সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করতে পেরেছিলেন। আমরা প্রীতিলতার প্রামাণ্য জীবনকাহিনী রচনা করতে চাই শুনে আনন্দও পেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রদ্ধেয় এই দুই বিপ্লবী আজ প্রয়াত। এই গ্রন্থ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ আমাদের হল না।

প্রীতিলতার জীবন কাহিনী রচনায় তাঁর পরিবার পরিজনদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় শহীদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষ ওয়াদ্দেদার, ভ্রাতৃবধূ মঞ্জুশ্রী ওয়াদ্দেদারের কথা। তাঁরা তথ্য দিয়ে, স্মৃতিচারণা করে, না জানা অনেক ঘটনার উল্লেখ করে, তাঁদের পরিবারের সেই সময়কার কথা বর্ণনা করে আমাদের আলোকিত করেছিলেন। তাঁদের আশীর্বাদ আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু ওঁরাও আর আমাদের মধ্যে নেই। এই জীবনকাহিনীও তাঁদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারলাম না।

এঁদেরই কন্যা গোপা ওয়াদ্দেদার আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। আমরা যখনই সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে গিয়েছি, তিনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তথ্য সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছেন প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র, বেথুন কলেজের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান উত্তরা চক্রবর্তী ও খাঁটুরা প্রীতিলতা হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হরিপদ দে। এঁদের সাহায্য না পেলে প্রীতিলতার জীবনের অনেক কাহিনীই আমাদের অজানা থেকে যেত। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

মাষ্টারদার সুযোগ্য অনুগামী, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী — শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী শ্রী বিনোদবিহারী চৌধুরী এই প্রচেষ্টায় নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। ৯৮ বৎসর বয়সের সংগ্রামী এই মানুষটি বাংলাদেশের চট্টগ্রামবাসী। সম্প্রতি আমাদের জেলার বারাসতে তিনি এসেছিলেন বিশেষ প্রয়োজনে। এখানে তিনি মূল পাণ্ডুলিপিটি শুনে সোৎসাহে তা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। গ্রন্থের একটি অমূল্য মুখবন্ধ লিখে তিনি আমাদের গর্বিত করেছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রাজ্যের বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাস ঘোষের কথা। মূল পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়ে তার পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে তিনি যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন তা আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

গ্রন্থের গ্রাহক হয়ে, কম্পোজিং-এর কাজ করে যারা এই গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করেছেন তাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে আমাদের অনেক দিনের চেষ্টার ফসল এই জীবনকাহিনী। আমরা যথাসম্ভব তথ্যনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যদি কোথাও অপূর্ণতা

থেকে যায় বা অন্য কোন ধরনের পরিবর্তন পরিমার্জনের পরামর্শ আপনাদের থাকে তবে তা সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌঁছে দিলে আমরা এই প্রকাশনাকে আরও সুন্দর আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব।

এই জীবন কাহিনী যদি সেই অগ্নিঝরা দিনগুলির স্রষ্টাদের সংগ্রামকে বুঝতে খানিকটা সাহায্য করে তবে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

শংকর ঘোষ

* প্রথম পরিচ্ছেদ *

বাড়ীর দক্ষিণে ছিল বড় বড় আম-জাম-নিম-কাঠালের গাছ, ফাঁকে ফাঁকে শটির ঝোঁপ, কচুবন, আসাম লতার জঙ্গল আর একটা উঁচু ঢিবি। ঢিবিটা জংলী গাছে ভর্তি। ভাই বোনেরা মিলে সেটা পরিষ্কার করেছিল। ঢিবির পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে পায়ে চলা মেঠো পথ। অনেক দূরে ধানক্ষেত, তারপর সারি সারি টিলা। গরমকালে দুপুর বেলায় যখন তারা ঘরে টিকতে পারে না, তখন সবাই মিলে এখানে এসে বসে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় দেহমন জুড়িয়ে যায়। ঘরের কাজ সেরে পাখা হাতে নিয়ে মা-ও এসে বসেন তাদের সাথে। তারপর যখন গোধূলিবেলায় অস্তায়মান সূর্য চারদিক রাঙিয়ে দিয়ে বিদায় নেয়, তখন মা বলেন, 'আর না, এবার ঘরে চল।'

হাতে বাঁশী নিয়ে প্রায়ই সে আসে এখানে। সাথে কনকও থাকে।

কিন্তু আজকাল আসতে হয় লুকিয়ে লুকিয়ে। সেদিন যে কি হয়ে গেল! কিছুতেই সে লোভ সামলাতে পারে নি। কয়েকদিন আগে পূর্ণেন্দুদা' এসেছিলেন। বলেছিলেন — 'কয়েকটা বই রাখতে পারবে? সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে।' তারপর একদিন গভীর রাতে বইগুলো নাড়তে নাড়তে একটা বইয়ের প্রচ্ছদে এসে চোখ আটকে গিয়েছিল তার। কচি কিশোর একটা মুখ, সমস্ত মুখ দিয়ে যেন জ্যোতি বেরিয়ে আসছে, নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে আছে ফাঁসির পাটাতনের পর, মাথার উপর ঝুলছে একটা ফাঁস দেওয়া দড়ি, একজন সাহেব ঘড়িতে সময় দেখছে, হাতে রুমাল, জল্লাদের হাত হাতলের উপর — নীচে লেখা 'বীর ক্ষুদিরাম'। নিজেকে সে সামলাতে পারে নি। ঘুমন্ত কনকের দিকে এক পলক তাকিয়ে হারিকেনটা বাড়িয়ে সে ডুবে গিয়েছিল বইয়ের মধ্যে। কখন যে ভোর হয়ে গিয়েছে টেরই পায়নি। সারাদিন কেমন কেটে গিয়েছিল ঘোরের মধ্যে। একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে মনের দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল — এও কি সম্ভব! কিসের জোরে পারলো! কোথা থেকে পেল এত শক্তি! এরা কি এই দেশের ছেলে! সেই শুরু।

আজ সে চলে এসেছিল দুপুরবেলায়। কনক তখন স্কুলে। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত।

আমগাছের তলায় মাদুর পেতে গুড়িতে হেলান দিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। কানাইলাল। হুঁশ ফিরল পায়ের আওয়াজে। তাকিয়ে দেখে দাদা এসেছেন। কাছে এসে বইটা হাতে নিয়ে দাদা বললেন — 'এই বুঝি তোমার পাশের পড়া রাণী?'

সহসা উত্তর দিতে পারে না রাণী। তারপর বলে, 'তুমি বারণ করেছিলে, আমি শুনিনি, অন্যায় করেছি দাদা?'

এরকম যে হতে পারে তা পূর্ণেন্দুরও মনে হয়েছিল। সে লক্ষ্য করেছে তার এই বোনটি যেন একটু অন্য ধরনের। স্বল্পবাক, শান্ত, দৃঢ়চেতা। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেন,

'ক্ষুদিরামের জীবন তো জেনেছ, কোন জায়গাটা তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে?' চুপ করে বসে থাকে রাণী। বুঝতে পারে দাদা আগ্রহ ভরে তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে। তারপর থেমে থেমে বলে —

'ঐ জায়গাটা। বিচারক জিজ্ঞাসা করছেন, রায়ের অর্থ বুঝতে পেরেছ? ক্ষুদিরাম মিটিমিটি হাসছেন। বিচারক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলতে চাও? জবাব দিলেন, দেশের যুবকদের বোমা তৈরীর কৌশলটা শিখিয়ে দিতে চাই।'

খানিক থেমে আবার বলে — 'দৃপ্তপদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছেন ক্ষুদিরাম, ফাঁসির দড়ি হাতে নিয়ে জল্লাদকে প্রশ্ন করছেন, দড়িতে মোম মাখাও কেন তোমরা? কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব!'

বইটা মাদুরের উপর রেখে দাদা বলেন — 'জান রাণী, দেখবে কানাইলালও একই ধরনের মানুষ। মৃত্যু এঁদের কাছে সত্যিই ছেলেখেলা। ফাঁসির দিন সকালবেলায় তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হয়েছিল। দণ্ডাদেশ শোনার পরও তাঁর ওজন বেড়ে গিয়েছিল। শোননি, 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' — এ যেন ঠিক তাই। এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয় রাণী, এ সবই ঘটনা, এ সবই সত্য।'

শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল রাণী। জলের ধারা কখন যে তার কপোল ভিজিয়ে দিয়েছে তা টের পায় না সে। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে প্রশ্ন করে, 'আমরা মেয়েরা এদের মত হতে পারিনা দাদা?'

এ প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না পূর্ণেন্দুর। মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দেবে, এ ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। কিন্তু বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে পারে না পূর্ণেন্দু। শুধু বলে — 'এই প্রশ্নের উত্তর একদিন তুমি নিশ্চয়ই পাবে রাণী। সন্ধ্যা হয়ে এল, এখন চল ঘরে যাই।'

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিমপ্রান্তে আস্কারখান দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোল ঘেসে নেমে গেছে একটা সরু গলি। ঐ গলির শেষপ্রান্তে মিউনিসিপ্যালিটির বড় নালার উত্তরে মাটির দু-খানা দোতলা বাড়ী। বাড়ীর সামনে ছোট ফুলবাগান। এখান ওখান থেকে সংগ্রহ করা ফুলের ডাল মাটিতে পুতে বাগান তৈরী করা হয়েছিল। প্রকৃতির অকৃপণ

দানে যখন বাগানের এই সব গাছ — জুঁই, জবা, বেল, গন্ধরাজ — ফুলে ফুলে ভরে উঠত তখন তার সৌন্দর্য সবাইকে মোহিত করত। বাগান ঘেরা এই শান্ত পরিবেশে মাটির ঐ দোতলা বাড়ীতে বাস করত ওয়াদ্দাদার পরিবার। মিউনিসিপ্যালিটির হেড ক্লার্ক জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দাদার, স্ত্রী প্রতিভাদেবী, তাঁদের ছয় সন্তান — মধুসূদন, প্রীতিলতা, কনকলতা, শান্তিলতা, আশালতা ও সন্তোষ।

এই পরিবারের পদবী ছিল দাশগুপ্ত। শোনা যায়, এদের কোন এক পূর্বপুরুষ নবাবী আমলে 'ওয়াহেদেদার' উপাধি পেয়েছিলেন। এই ওয়াহেদেদার থেকে 'ওয়াদ্দাদার' বা 'ওয়াদ্দার'।

শৈশব খুবই দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে কেটেছিল জগদ্বন্ধুবাবুর। বাবাকে হারিয়েছিলেন ছেলেবেলায়। ছোট দু-ভাই মহেন্দ্র হরেন্দ্র তখন একেবারে শিশু। কোন উপায় দেখতে না পেয়ে তাদের মা তিন সন্তানকে নিয়ে স্বামীর ভিটে ডেঙ্গাপাড়া ত্যাগ করে পটিয়া থানার ধলঘাটে এসে ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এইখানে, মামার বাড়ীতে, দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করে জগদ্বন্ধুবাবু বড় হয়েছিলেন। নিজে লেখাপড়া শিখেছিলেন, ভাইদের মানুষ করেছিলেন।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর মা ও মামারা তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দাদাশ্বশুর ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ছিলেন তখনকার দিনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। একান্নবর্তী বিরাট সংসার তাঁর। বিশাল বাড়ী, বার মহল, পূজামণ্ডপ — দারোয়ান, দাসদাসী, ঢালাও আড্ডাখানা। তাঁর সাধ ছিল নাতজামাই ব্যারিস্টার হয়ে হাইকোর্টে ওকালতি করবে। তিনি ভেবেছিলেন, জগদ্বন্ধু অর্থসাহায্য নিয়ে তার এই সাধ পূর্ণ করবে। কিন্তু দাদাশ্বশুরের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিতে জগদ্বন্ধুবাবু রাজী হলেন না। তিনি এসে ভর্ত্তি হলেন কলকাতার রিপন কলেজে। এখান থেকে আই. এ পাশ করার পর চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরী নিয়ে তিনি ফিরে এলেন ধলঘাটের মামার বাড়ীতে। এই বাড়ীতে ১৯১১ সালের ৫ই মে, মঙ্গলবার প্রীতিলতার জন্ম। আদর করে প্রতিভাদেবী নাম রেখেছিলেন — 'রাণী'।

১৯০৫ সালে বাংলার জনজীবনকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এল 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন'। তারপর শুরু হল বিদেশী দ্রব্য বয়কট। চারিদিকে প্রতিবাদ। মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট, অরন্ধন। লোকের মুখে মুখে ফিরছে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' — এই গান। অগ্নিঝরা কলমে অরবিন্দ লিখছেন, 'The joy of seeing one's blood flow for country and freedom'. জাতীয় চেতনার এই নতুন দীপ্তি জগদ্বন্ধুবাবুকেও প্রভাবিত করেছিল। সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে তিনি যোগ দেন নি। কিন্তু দেশের প্রতি আবেগ তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করতেন। ইস্কুলের চাকরী ছেড়ে তখন তিনি সবে যোগ দিয়েছেন আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে। অফিসের সাহেব বড় কর্তা একদিন ভারতবাসী সম্পর্কে অবমাননাকর

মন্তব্য করেছিল। জগদ্বন্ধুবাবু প্রতিবাদ করলেন। ফলে চাকরিটি তাঁকে খোয়াতে হল। অভাবের সংসারে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়লেও এ নিয়ে তিনি কোনদিন আফশোষ করেন নি। কখনও এ প্রসঙ্গ কেউ উল্লেখ করলে স্বল্পবাক জগদ্বন্ধুবাবু বলতেন — 'দেশের কত মানুষ কত ত্যাগ স্বীকার করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন, আর আমরা এই সামান্য কাজটুকু পারব না!'

স্বচ্ছল ঘরের মেয়ে ছিলেন প্রতিভাদেবী। ছেলেবেলা কেটেছিল প্রাচুর্যের মধ্যে। তিনি ছিলেন দাদু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর খুব আদরের। কিন্তু স্বামীর দরিদ্র সংসারের সমস্ত সমস্যা নীরবে হাসিমুখে মোকাবিলা করতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। সামান্য যা আয় করতেন জগদ্বন্ধুবাবু, তাতে সংসার চালানো ছিল দুষ্কর। প্রতিভাদেবী একটা শাকসব্জীর ক্ষেত তৈরি করেছিলেন, ঘরে ছিল গরুর দুধ, আর ছিল বড়-সড় একটা ফলের বাগান। ছিল একপাল পোষা ছাগল, অনেকগুলো হাঁস, দুটো গরু — বুধী আর শ্যামা। একটা ধবধবে সাদা, অন্যটা সাদার উপর কালো কালো ছোপ। জগদ্বন্ধুবাবুকে লুকিয়ে প্রতিভাদেবী মাঝে মাঝে হাঁসের ডিম বিক্রি করতেন। দু'এক পয়সা ঘরে আসতো, সংসারের কাজে লাগতো।

চরিত্রের একটা অপূর্ব দৃঢ়তা ছিল তাঁর। ব্যক্তিগত অসুবিধা তাঁকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। রাণীর আত্মদানের পর জগদ্বন্ধুবাবু যখন কর্মচ্যুত হলেন তখন সহায় সম্বলহীন এই পরিবারের তিনি হাল ধরেছিলেন। ধাত্রীবিদ্যা শিখে তারই সামান্য আয়ে তখন হাসিমুখে তিনি সংসার চালিয়েছেন। এই সময়কার একটা ঘটনা তাঁর কোমল অথচ দৃঢ় মনের পরিচয় বহন করে।

সেদিন মেয়ে শান্তিলতার বিয়ে। বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনের ভীড়, সবাই কাজে ব্যস্ত, প্রতিভাদেবীর দম ফেলার ফুরসৎ নেই। এমন সময় পাশের গ্রামের একজন ঘোড়ারগাড়ী নিয়ে হাজির হলেন। তার একমাত্র মেয়ে আসন্নপ্রসবা, যন্ত্রণায় ছটফট করছে, প্রতিভাদেবীকে যেতেই হবে।

সবাই বোঝানোর চেষ্টা করলেন — তা কি করে হয়! ওর মেয়ের বিয়ে, একটু পরেই বর-বরযাত্রী এসে হাজির হবে, এসময় কি ওর যাওয়া চলে? অসহায় ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কোন কথা বললেন না প্রতিভাদেবী। সবার অগোচরে বাক্স গুছিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সবাই বলে উঠলো — 'আপনি চললেন নাকি!' তিনি বললেন — 'এ সময়ে না গেলে চলে? একটা মেয়ের জীবন মরণ সমস্যা। তোমরা তো রইলে। এ দিকটা একটু সামলে নিও।'

রাণীর আত্মদানের পর ইংরাজ শাসকদের প্রবল অত্যাচার নেমে এসেছিল এই দরিদ্র অসহায় পরিবারের উপর। তাঁদের দুঃখের শেষ ছিল না। ইচ্ছা থাকলেও আত্মীয় স্বজনেরা যোগাযোগ রাখতে পারতেন না — পাছে তাদের উপর রাজশক্তির দমন পীড়ন নেমে আসে; প্রতিবেশীরাও যথাসম্ভব তাঁদের এড়িয়ে চলতেন। এত দুঃখকেও

কিন্তু প্রতিভাদেবী দুঃখ বলে মনে করেন নি। রাণীর আত্মদানের মূল্য তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। গর্ব করে বলতেন — 'রাণী আমার দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছে।'

দাদা মধুসূদন ছিল দুরন্ত, বেপরোয়া। পড়াশুনায় তাঁর মনোযোগ ছিল না। তাঁর জন্য জগদ্বন্ধুবাবু গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু স্কুল পালিয়ে তামাক খাওয়ার দিকেই ছিল তাঁর ঝোক। তবুও সে ছিল বাবার বড় আদরের, তাঁকে শাসন করার উপায় ছিল না। প্রতিভাদেবী মাঝে মাঝে চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাতে জগদ্বন্ধুবাবু ক্ষুণ্ন হতেন, কাজের কাজ কিছু হোত না।

রাণী আর কনক থাকত এক ঘরে। ঘরের দুদিকে দুটো চৌকি পাতা। একটা রাণীর অন্যটা কনকের। রাণীর চৌকিটা ছিল জানালার ধারে। ভাগাভাগি করে দুইবোন মাকে সাহায্য করত। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা — এই সব কাজ ছিল রাণীর, ছাগলের দেখাশোনা করতে হোত কনককে। একটা কেরোসিন লণ্ঠন মাঝখানে রেখে পড়াশুনা করত দু'বোনে। বাবা মাঝে মাঝে পাশে এসে বসতেন। সাহায্য করতেন দু'জনকে।

আর ছিল বাসন্তীদি। মেজকাকার মেয়ে। তার থেকে মাত্র পাঁচ মাসের বড়। ওর জন্মের পরই কাকীমা মারা গিয়েছিলেন। মা ওকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। কি দুরন্ত ছিল ও! বাড়ীর দক্ষিণ দিকে আম-জাম-পেয়ারা গাছের ডালে যখন ও চড়ে বসত আর মা লাঠি হাতে বলতেন — 'নাম্, পড়ে যেয়ে হাত-পা ভাঙ্গবি', তখন কি মজাই যে লাগ্‌ত।

কিন্তু কাজের সময় একেবারে অন্য মেয়ে ও। সকাল বেলায় ভাত খেতে তার একটুও ভাল লাগত না। নিজের হাতে সুজি-পরোটা করে নিয়ে এসে বেশ ভারিক্কী চালে বলত — 'পড়া রাখ্, খেয়ে নে।'

মার গলা ছিল সুন্দর, সুরেলা। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় যখন গুণগুণ করে 'এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা' গানটা গাইতেন, কি ভালই যে লাগত! মায়ের পাশে গিয়ে তখন বসত সে। হেসে মা তাকে কাছে টেনে নিতেন। গান শেষ হলে বলতেন, 'তুলসীতলায় প্রদীপটা জ্বেলে দাও মা।'

বাবার গলায় সুর ছিল না, কিন্তু তিনি গানের সমঝদার ছিলেন। ডেঙ্গাপাড়া থেকে শহরে আসতেন এক বাঁশীওয়ালা, নাম নবীন ধুবী। প্রায়ই তিনি রাণীদের বাড়ীতে রাত কাটাতেন। তখন বাড়ীতে একটা ছোটখাট গানের আসর বসে যেত। ছেলেমেয়েরা সব গোল হয়ে নবীনবাবুকে ঘিরে বসত। জগদ্বন্ধুবাবু ফরমাস করতেন আর নবীনবাবুর বাঁশীতে বেজে উঠত কখনও কীর্তন, কখনও ভাটিয়ালী, কখনও রামপ্রসাদী, কখনও বা দেশাত্মবোধক গানের সুর। তবে একটা গান ছিল বাধা। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।' বাজাতে বাজাতে নবীনবাবুর চোখ জলে ভরে উঠত, তন্ময় হয়ে শুনতেন জগদ্বন্ধুবাবু। গান শেষ হলে মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে যেতেন। বুকটা কেমন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠত তার।

---

* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ *

সেই রাতটা কি আনন্দের! সারারাত ঘুম হয়নি, বিছানায় এ পাশ ও পাশ করেছে সে। বাবা বলেছেন, 'কাল তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব মা।' এই দিনটার স্বপ্ন সে কতদিন দেখেছে! দাদা যখন বই খাতা নিয়ে স্কুলে যেত, সেও বায়না করত। মা বলতেন, 'আর একটু বড় হও, তারপর যাবে।' বাবা হাসতেন আর বলতেন, 'এখন যাওয়ার বায়না, এরপর তো না যাওয়ার বায়না শুরু হবে।' মা এসে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, 'কখনও না, রাণী আমার ফার্স্ট হবে, দেখে নিও।' বাবা বলতেন, 'হলে ভাল, মধুও তো প্রথম প্রথম এরকম করত।'

দাদাকে নিয়ে বাবার বড় দুঃখ ছিল।

তারপর এল সেই দিন। সকাল সকাল স্নান করিয়ে মা ভাত খাইয়ে দিয়েছিলেন। কপালে পরিয়ে দিয়েছিলেন চন্দনের ফোঁটা। মাকে প্রণাম করে সে যেয়ে উঠল ঘোড়ার গাড়ীতে। এই তার প্রথম গাড়ী চড়া। নতুন স্কুল জীবনের ভাবনার আনন্দে পথ যে কখন ফুরিয়ে গিয়েছে, টেরই পায়না রাণী। হুঁশ ফিরল বাবার কথায়। 'নেমে আয় মা, আমরা এসে গিয়েছি।' গাড়ী থেকে নেমে তাকিয়ে দেখে বড় বড় হরফে লেখা, — 'ডাঃ খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়'। অবাক হয়ে ভাবে এতবড় স্কুলে সে পড়তে আসবে রোজ!

সেদিন সারা শহরে প্রচণ্ড উত্তেজনা, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। বাবা এসে মাকে বললেন —'শুনেছ, কি মারাত্মক ব্যাপার! রেলওয়ে কারখানার লোকেদের বেতন নিয়ে যাচ্ছিল, কারা যেন গাড়ী থামিয়ে ডাকাতি করেছে। কি ভয়ানক সাহস!'

তারপর মাসখানেক পর, শহরে আবার উত্তেজনা। ডাকাতরা নাকি ধরা পড়েছে। বাবা বলছিলেন, একজন উমাতারা স্কুলের শিক্ষক আর একজন পোর্ট অফিসের কেরানী।

বলি বলি করে একদিন কথাটা বলেই ফেলে রাণী, 'মাষ্টার মশাইতো ডাকাত কেন বাবা?'

বাবা হেসে বলেন, 'ওরে পাগলী, ওঁরা কি যে সে ডাকাত! ক্ষুদিরামের দলের লোক ওঁরা। ওঁরা সব স্বদেশী —'।

সে শুনেছে, বাবা মাকে বলছিলেন, মাষ্টারমশাইয়ের নাম সূর্য সেন। আস্কারখান দীঘির ওপাশে যে জঙ্গল সেখানে একটা ঘরে নাকি তিনি থাকেন। উফ্! কি সাহস!

সেদিন মণিদা এসেছিলেন বাড়ীতে।

মা বললেন, 'আজ গিয়েছিলি মনু?'

মণিদা বললেন, 'সেই সকালবেলা। সব বলছি। আগে কিছু দাওতো জ্যেঠী।

খেয়েদেয়ে শান্ত হয়ে এক এক করে সব বলে যেতে থাকেন মণিদা। মা তন্ময় হয়ে শুনতে থাকেন। মণিদা বলেন, 'নির্বিকার তিনটে মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন কাঠগড়ায়। নিজেদের মধ্যে হাসছেন, গল্প করছেন, কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ব্যারিষ্টার সেন সাহেব প্রশ্ন করে করে সরকারী সাক্ষীদের জর্জরিত করছেন আর ওঁরা মুচকি মুচকি হাসছেন।'

অনেকক্ষণ পরে মা জিজ্ঞাসা করেন, 'ওঁরা ছাড়া পাবে তো মনু?'

চুপ করে থাকেন মণিদা, তারপর বলেন, 'তাই তো আমরা চাই জ্যেঠী'।

রাণী ভাবে, 'ওঁরা ছাড়া পাবেন, নিশ্চয়ই পাবেন।'

কল্পনার[২] সাথে পাল্লা দিয়ে চলাই ভার। কি ভীষণ দুরন্ত ও! এক ক্লাস নীচে পড়ে আমার। কিন্তু রোজ দুপুর রোদে ওর সাথে ব্যাডমিণ্টন খেলতেই হবে। টিফিন হতে না হতেই ছুটে চলে আসে, আর তাড়া লাগিয়ে বলে — 'চল্ চল্, দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওপরের ক্লাসের দিদিরা এখনই কোর্ট দখল করে নেবে।' টানতে টানতে আমাকে নিয়ে যায়।

ইতিহাসের শিক্ষিকা উষাদিকে খুব ভাল লাগে তার। মাঝে মাঝে উষাদি তাকে ডেকে নিয়ে যান নিজের ঘরে। কত গল্প হয়! উষাদির নিজের কথা, তাঁর পড়াশুনার কথা, ঢাকার কলেজ জীবনের কথা। দিদি তাকে দেশবিদেশের নানা কাহিনী গল্প করে শোনান। সেদিন যেতে আদর করে পাশে বসালেন। তারপর নিজেই তুললেন পাহাড়তলী মামলার কথা। দিদি বললেন — 'তুমি শুনেছ?' রাণী এক এক করে সব বলে যায়। বাবার কথা, মার কথা, মণিদার কথা। তারপর বলে, 'বাবা বলেছেন — ওঁরা সব স্বদেশী ডাকাত।' উষাদি হেসে বলেন, 'ডাকাত নন, শুধু স্বদেশী। দেশকে ওঁরা ভালবাসেন, তাই ইংরাজরা ওঁদের ডাকাত বলে।' বলতে বলতে উষাদির গলা ভারী হয়ে আসে। রাণীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকদিন। স্কুল ছুটির পর উষাদি তাকে ডেকে নিলেন নিজের ঘরে। ছোট একখানা বই দিয়ে বললেন — 'মন দিয়ে এটা পড়বে রাণী। তোমাদের বইতে এঁদের কথা নেই। এঁদের কথা তোমাদের জানতে দেওয়া হয়না। পড়া হয়ে গেলে বন্ধুদেরও বইটা পড়তে দিও।' হাতে নিয়ে রাণী দেখে — 'ঝাঁসীর রাণী'।

কদিন পড়াশুনায় একেবারেই মন বসাতে পারে না সে। শুধু মনে পড়ে ঝাঁসীর রাণীর কথা। তাঁর অসীম সাহসিকতা, ঘোড়ায় চড়ে খোলা তরবারী হাতে ইংরাজ সৈন্যদের সাথে লড়াই, বিশেষ করে সেই জায়গাটা — যেখানে পুরুষের বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীবাই বলছেন 'মেরী ঝাঁসী নেহী দুঙ্গী' — রাণী কিছুতেই ভুলতে পারে না।

একদিন ছুটির পরে বইটা ফেরৎ দিতে গিয়েছিল। ঊষাদি হেসে বলেছিলেন — 'বইটা তোমাকে দিলাম রাণী।' তারপর বললেন — 'পড়েছ?' কোন কথা বলতে পারেনি সে। দিদি হয়ত তার মনের সব কথা বুঝতে পেরেছিলেন। হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলেছিলেন — 'আমাদের এরকম হতে হবে রাণী'।

সেবার ফার্স্ট হয়েছিল সে। বাবার কি আনন্দ! মা হেসে বাবাকে বলেছিলেন, 'কি, বলেছিলাম না।' অফিস থেকে ফিরে ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে বাবা বললেন — 'এটা তোমার।' প্যাকেট খুলে দেখে, 'টম কাকার কুটীর'। কি ভাল যে লেগেছিল।

নিগ্রোদাস টম, তাঁর মহানুভবতা, ধৈর্য, বীরত্ব আর অসহায়তা; ইভাঞ্জেলিনের শিশুমনে নিঃস্ব মানুষের প্রতি গভীর মমতা, দাসপ্রভুদের নির্মম অত্যাচার তাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু ঐ জায়গাটা সে বারবার পড়ত। যেখানে মৃত্যুপথযাত্রী কন্যার পাশে বসে পিতা সেণ্টক্লেয়ার বারবার আর্তনাদ করছেন আর বলছেন — 'ইভা, ইভা, মা আমার', এই জায়গাটায় এসে সে কিছুতেই চোখের জল চেপে রাখতে পারত না।

স্কুলে তখন গার্ল গাইড শুরু হয়েছে। অনেকটা ব্রতচারী ঢংয়ের সংগঠন। রুগীর প্রাথমিক পরিচর্যা, শরীরচর্চা, ড্রিল — এ সবই শেখানো হত এখানে। শিখতে আনন্দ পেত, ভাল লাগত। কিন্তু ''I shall be loyal to God and King emperor' — এই শপথবাক্যটা পাঠ করতে কিছুতেই মন চাইত না। 'God' কথাটায় আপত্তি নেই, কিন্তু 'King emperor!' বাবার মুখে কতবার শুনেছে — 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে'। বাবা যখন উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠত। সেই ইংরাজের রাজার কাছে অনুগত থাকার শপথ নিতে হবে! মন মানতে চায় না। একদিন ঊষাদিকে কথাটা বলেছিল। সজল চোখে ঊষাদি বলেছিলেন — 'এ দেশে আমরা I shall be loyal to God and my Country বলব তার উপায় কি? আমরা যে ওদের অধীন রাণী'।

বাড়ী থেকে স্কুলের পথে বটগাছতলার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মেঠো পথ গিয়ে মিশেছে বাগদীপাড়ায়। এখানেই থাকেন বাগদী মাসী। মাঝে মাঝে আসেন তাদের বাড়ীতে। সঙ্গে থাকে দুটো নাদুস নুদুস শিশু। সর্বাঙ্গ ধুলোয় মাখা । কিন্তু ওদের পেলে রাণীর জ্ঞান থাকে না। আদর করে চটকে একেবারে অস্থির করে তোলে। মা আঁতকে উঠে বলেন 'করছিস কি খুকী, ছেড়ে দে। ব্যথা পাবে না ওরা!' বাগদী মাসী খিল খিল করে হাসতে থাকেন। আর শিশু দুটো আদরের এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করে তার দিকে দুষ্টুমীভরা মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখে মা দাওয়ার এক কোণায় চুপ করে বসে আছেন।

বিষণ্ন, গম্ভীর। মার পাশে যেয়ে বসে রাণী। তার হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে বলেন, 'বাগদী বউয়ের ছেলে দুটো আজ দুপুরে মারা গেল রে খুকী।' তারপর যেন আপন মনে বলতে থাকেন— 'গরমকালে কাদাগোলা জল খেয়েই মরল বাছারা।'

রাণীর মনে হয় এখনই সে দৌড়ে চলে যায় বাগদীমাসীর বাড়ীতে। তার পাশে যেয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোন কথা না বলে সে চুপ করে মা'র পাশে বসে থাকে।

উষাদি শুনেই বললেন -- 'এই তো স্বাভাবিক রাণী। শোননি, ইংরাজ রাজত্বে কলেরায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। সুজলা সুফলা আমাদের দেশের এই হাল করেছে ইংরেজ। অকালে ঝরে যাওয়াই তো এ দেশের শিশুর ভবিতব্য।' রাণী লক্ষ্য করে বলতে বলতে উষাদির গলা ভারী হয়ে আসে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন — 'এর প্রতিকার আমাদের করতেই হবে রাণী।'

উষাদির সব কথা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তাঁর আবেগমথিত কথাগুলো তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। চোখ বুঝলেই 'শিশু দুটোর মুখ' সে স্পষ্ট দেখতে পায়। বারবার তার মনে হয় —

কেন এমন হয়, কেন?

তারপর কেটে গিয়েছে অনেকদিন। পূর্ণেন্দুদা চট্টগ্রামে নেই, পড়তে গিয়েছেন কলকাতায়। রাণীরও ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ। গভীর রাতে একদিন ঘুম ভেঙ্গে যায় কনকের। দেখে হারিকেনটা আড়াল করে একমনে কি লিখে চলেছে দিদি। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কি লিখছিস রে দিদি?'

চমকে উঠে হেসে ফেলে রাণী। 'নাটক, আমরা মেয়েরা নাটক করব। বেশ হবে — নারে?' মাথা নেড়ে সায় দেয় কনক।

কদিন পর শুরু হয়ে গেল নাটকের মহড়া। কিন্তু সমস্যা হল এক জায়গায়। সাহেব সাজার মত ফর্সা মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়? রাণী-কনকের যা গায়ের রং তাতে সাহেব সাজা! তারপর এগিয়ে এল অভিনয়ের দিন। চৌকি জোগাড় করে মঞ্চ তৈরীও শেষ। বাড়ী বাড়ী যেয়ে অভিনেত্রীরা আমন্ত্রণ জানায় সকলকে। অপটু হাতের রচনা শুধু আবেগের জোরেই জয় করে নেয় দর্শকমন। রাণী গাইল --- 'অবনত ভারত চাহে তোমারে।'

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর একদিন সে প্রণাম করতে গিয়েছিল উষাদিকে। পাশে বসিয়ে উষাদি বলেছিলেন — 'এখানেই থেমে যেওনা রাণী। আরও পড়বে, আরও জানবে, তবেই তো বুঝতে পারবে জীবন কি রকম হওয়া উচিৎ। সংসার প্রতিপালনেই মেয়েদের জীবন সার্থক, এই মিথ্যা মোহের বিরুদ্ধে তোমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।'

এটাই তার মনের কথা। স্কুলে বসে সে আর কল্পনা কতদিন ভেবেছে বড় হয়ে

বিজ্ঞানী হবে, কলকাতায় যাবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাবে — কিন্তু সে সব বুঝি আর হয়ে উঠবে না।

তাকে নিয়ে ইদানিং বাবা খুব চিন্তায় আছেন তা বুঝতে পারে রাণী। বাবা সেদিন মাকে বলছিলেন — 'পড়াতো অনেক হল, এবার তো অন্য ব্যবস্থা দেখতে হয়।' মা তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিলেন।

বাড়ীতে আজকাল ঘটকের আনাগোনাও শুরু হয়েছে। হয়ত আর কদিন পরে......। দুঃখে বুক ফেটে যায় তার।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে। বাবা খুব খুশী। রাণী ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। মা রীতিমত ভোজের আয়োজন করেছেন। আনন্দের এই আয়োজনের মধ্যেও একটা সংবাদে রাণীর বুক কেঁপে ওঠে। কারা যেন তাকে দেখতে আসবে। সারা রাত তার ঘুম হয় না। যে জীবনের স্বপ্ন সে এতকাল দেখেছে, এইভাবেই কি তার শেষ হবে!

দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে বিছানায় সবে একটু গা এলিয়ে দিয়েছেন প্রতিভাদেবী, রাণী ঢুকলো মায়ের ঘরে। আদর করে কাছে বসিয়ে প্রতিভাদেবী বললেন — 'মুখটা এমন শুকনো কেন মা?' কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে রাণী। আরও কাছে সরে এসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রতিভাদেবী বলেন, 'কিছু বলবি আমাকে?'

বাবা মায়ের ইচ্ছার কখনও অবাধ্য হয় নি রাণী। কি করে কথাটা পাড়বে সে ভেবে পায় না। কদিন ধরে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এক মন বলছিল, সব মেয়েই তো এই পথে চলে তুমিই বা চলবে না কেন? অন্য মন জোরালো প্রতিবাদ করেছে, সবাই চলে বলে তুমিও চলবে? শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে, সবার পথ তার পথ নয়। কিন্তু বলতে এসে কথাটা যে গলায় আটকে যাচ্ছে! কি মনে করবেন মা! বাবা নিশ্চয়ই দুঃখ পাবেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলেই ফেলে রাণী — 'আমি আরও পড়ব মা। আমাকে কলকাতায় ভর্তি করে দাও।'

প্রতিভাদেবী হেসে বলেন, 'এই কথা, তা তোর বাবাকে বল —।'

— 'না, তুমি বল।'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন প্রতিভাদেবী, তারপর বলেন, — 'আচ্ছা'।

সবকথা শুনে জগদ্বন্ধুবাবু বলেন,— 'তাইতো, এদিকে যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি আমি। আগামী সপ্তাহেই তো ওকে দেখতে আসবে ওরা, কি বিপদ!'

মেয়ের মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রতিভাদেবীর। জোর দিয়ে বলেন, — 'তা কি হয়! তুমি ওকে কত উৎসাহ দিয়েছ। ফল বেরোবার দিন ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সেকথা মনে আছে? আর ফিরতে তো হৈ হৈ করে পাড়া কাঁপিয়ে।'

হেসে ফেলেন জগদ্বন্ধুবাবু। তারপর বলেন, — 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু........'

স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে প্রতিভাদেবী বলেন, 'না কিছুতেই তুমি আপত্তি করতে পারবে না। পড়তে যখন চাইছে তখন পড়ুক। ওদের আসতে তুমি বারণ করে দাও।'

চিন্তা করে জগদ্বন্ধুবাবু বললেন, 'বেশ তাই হোক, তোমাদের যখন এত ইচ্ছা।'

সব শুনে উষাদি বললেন — 'কি আনন্দ যে হচ্ছে! তুমি ইডেন কলেজে পড়তে যাবে শুনে খুব ভাল লাগছে। একদিন আমিও ঐ কলেজের ছাত্রী ছিলাম। সেইসব দিনগুলো এখনও চোখের সামনে ভাসে, রাণী।' তারপর কত কথা! কি ভাবে পড়াশুনা হোত, কোন অধ্যাপক কেমন ভাবে ক্লাস নিতেন — এইসব। একবার কলেজের বাৎসরিক উৎসবে আচার্য রায় এসেছিলেন। মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করেছিল কলেজের মেয়েরা। এতগুলো মেয়েকে একসাথে কলেজে পড়তে দেখে আচার্য রায়ের কি আনন্দ!

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ফেনীর মেয়েদের স্কুলে পড়াতে যেত সে। সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরই পেত না রাণী। সেদিন সবে ফিরেছে স্কুল থেকে। বাবা আগেই অফিস থেকে বাড়ী চলে এসেছিলেন। তাকে দেখে বললেন — 'চিঠি এসেছে মা। সব গুছিয়ে নিও। সোমবার সকালেই রওনা হতে হবে আমাদের।'

মাকে প্রণাম করে, ভাই-বোনেদের আদর করে বাবার সাথে রাণী রওনা হল ঢাকার উদ্দেশ্যে। জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল তার।

———

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ *

'প্রিয় নয় খাঁটি হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমাদের',— সেদিন লীলাদি[৩] এই কথা বলেছিলেন। কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গিয়েছে। ভর্ত্তি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আতঙ্কের সেই সব দিন কেটে যাওয়ার পর গুছিয়ে নিয়ে পড়াশুনা শুরু করতে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। তারপর নিলীমাদির সাথে পরিচয়। নিলীমাদির হাত ধরেই ঘনিষ্ঠতা লীলাদির সাথে।

লীলাদিকে যত দেখে তত অবাক হয়ে যায় রাণী। দেশের কাজে জীবনটা তিনি উৎসর্গ করেছেন। আর কি প্রচণ্ড কর্মশক্তি! এক হাতে কত কাজ সামলাচ্ছেন! স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালাচ্ছেন, আবার মেয়েদের লাঠি ছোরা খেলা শেখার বন্দোবস্ত করছেন। এই ধরনের আরও কত কাজ! মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। এত কাজ এক হাতে সামলাচ্ছেন, দেখে বোঝাই যায় না।

ঢাকায় আসার কয়েকদিন আগে কথা হচ্ছিল পূর্ণেন্দুদার সাথে। সে ইডেন কলেজে পড়তে যাবে শুনে দাদা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। সেদিন সকাল থেকেই মনটা ভার হয়ে ছিল। ঢাকায় পড়তে যাওয়ার আনন্দ ছাপিয়ে যাচ্ছিল মাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট। কোনদিন মাকে ছেড়ে থাকেনি সে।

দাদা আসতেই দু'জনে গিয়ে বসেছিল বাড়ীর পিছনে সেই উচুঁ ঢিবিতে। দাদা শোনাচ্ছিলেন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নানা গল্প। বন্ধুদের সাথে গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে যাওয়া, মনুমেন্টের তলায় সুভাষচন্দ্রের ভাষণ শোনা ইত্যাদি কত কথা। শুনতে শুনতে রাণীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর দাদার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বলে — 'আমরা মেয়েরা দেশের কাজে যোগ দিতে পারি না, এই কি তোমার ধারণা?' প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পূর্ণেন্দু বলে, 'মেঘটা কেমন আস্তে আস্তে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে দেখ। এখনই বোধ হয় ঝড় আসবে।' একটু হেসে রাণী বলে — 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না দাদা।'

চুপ করে থাকে পূর্ণেন্দু । ঝোড়ো হাওয়া তাঁর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে থাকে। তারপর বলে — 'আজ থাক ভাই, এখন বাড়ী চল, ঝড় এসে পড়ল।'

দাদার কথা রাণীর অজানা নয় । দাদারা তাদের কি দুর্বলই না মনে করে। 'ঘরের বাইরে এসে দেশের কাজ করা চলবে না' — কেন? তারা মেয়েরা কি এতই অক্ষম, এতই দুর্বল? এই সব চিন্তা সে কোনমতেই মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তার মনে হয় — অতদিন আগে লক্ষ্মীবাই পেরেছেন, তাহলে তারা পারবে না কেন?

সামনেই পরীক্ষা। পড়াশুনার চাপ খুব। তার উপর প্রতিভাটা পড়ল জ্বরে। বেচারা অল্পতেই কাতর হয়ে পড়ে। সবদিক সামলাতে যেয়ে দিদির ওখানে যাওয়া হয় নি বেশ

কয়েকদিন। তিনি থাকেন বক্সীবাজারে। সেদিন গিয়ে দেখল, দিদি বাইরের বাগানে বকুলগাছ তলায় মাদুর পেতে বসে আছেন। পাশে পরিচিত সেই সেতার, ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা বইখাতা। তাকে দেখেই মৃদু হাসলেন। বইখাতা সরিয়ে বসার জায়গা করে দিতে দিতে বললেন — 'আজ একটা সুন্দর কবিতা পড়লাম, এস তোমাকে শোনাই।' দিদি শুরু করলেন,

'যদি ঝড়ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ মাঝে
অঞ্চল আবরি
অগ্নি রাখি দিও, জাগি সারা বিভাবরী!
আর সব নারী ভবে প্রিয়-পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ ব্রত-পরায়ণা
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোর জপা!
দৃঢ় পরন্তপা।'

আবৃত্তি শেষ করে অনেক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'অগ্নি রাখি দিও, জাগি সারা বিভাবরী — কি সুন্দর, না?'

সেদিন দিদি অনেক কথা বলেছিলেন। তাঁর স্বপ্নের কথা, তাঁর সাধনার কথা। কলেজ জীবনের নানা কথা। তিনি তখন বেথুন কলেজে পড়তেন। কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বড়লাট পত্নী আমন্ত্রিত হয়ে এলে প্রথানুযায়ী ছাত্রীরা নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানাত। অসম্মানজনক এই প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রথা বন্ধ করে দিতে হয়। ঢাকায় তিনি যখন এম.এ-তে ভর্ত্তি হলেন, কমন রুমে বসে থাকতেন তিনি ও সুরমাদি, ক্লাসে যাওয়ার আগে স্যারেরা ডেকে নিয়ে যেতেন। এই সব কাহিনী। তারপর দিপালী সংঘের প্রতিষ্ঠা। কবিগুরু একবার দিপালী সংঘে এসেছিলেন। বলতে বলতে দিদির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তারপর খানিক থেমে ঘরে যেয়ে একটা পুরানো পত্রিকা তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন — 'শরৎবাবুর একটা লেখা আছে। পড়ে দেখো। তোমার মনের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে, তার অনেক কথার উত্তর এতে পাবে।'

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে দিদির দেওয়া লেখাটা নিয়ে বসে রাণী। শুরুতেই বড় বড় হরফে লেখা — 'স্বরাজ সাধনায় নারী'। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে লেখাটা যেন ঠিক তেমনিভাবে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। পড়তে থাকে রাণী। ''আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন — আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছেন না। কোথায় কোন অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতি মুহূর্তেই আভাস দিচ্ছেন এ হবার নয়। যে চেষ্টায় যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুধুমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাকবে না।''

রাণী যেন নতুন পথ দেখতে পায়। "মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উলটো দিকটাও আবার ঠিক এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে — নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের তেমনি ঝরে গেছে।"

"এই সমবেত নর-নারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠবে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারীই হোক, খসে পড়তে মুহূর্ত বিলম্ব হবে না, তাতে বাধা দেয় পৃথিবীতে এমন শক্তিমান কেউ নেই।"

রাণীর ইচ্ছা হয় অন্ধকার এই রাতে সে ছুটে চলে যায় দিদির কাছে। চিৎকার করে বলে—'দিদি আমরা পারব।'

পরদিন বিকালে রাণী গিয়ে আবার হাজির হয় দিদির কাছে।

অনেকক্ষণ রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। তারপর কাছে বসিয়ে প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়ে বলতে থাকেন — 'আমাদের পারতেই হবে রাণী। ঘর ও বাইরের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ রেখা টানা আমাদের চলে না। বাইরের ঝড়ঝাপটা আমাদের জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করছে যে ঘরের মানুষেরও বাইরের খবর না রেখে উপায় নেই। যারা বলেন দেশসেবায় নারীর অধিকার নেই তারা মানুষের সামনে চলার প্রয়োজনকেই অস্বীকার করে। তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই রাণী।'

তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকদিন। দিদির কথাগুলো প্রায়ই তার মনে পড়ে। মনে মনে কথাগুলো সে আওড়ায়। বেশ জোর পায় মনে। সত্যিই তো —ঘর ও বাইরের কৃত্রিম বিভেদরেখা টানা উচিৎ নয়। ঘরের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে তাদের আজ বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে। এই হল সত্যকার পথ। তাহলেই একদিন অধীনতার শৃঙ্খল খসে পড়বে।

'কাল বাড়ী যাবে, খুব আনন্দ, তাই না?' তারপর দিদি হাসতে হাসতে বললেন, 'আসার সময় মা'র হাতে তৈরী পিঠে পুলি নিয়ে এসো।' সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। দিদি বলছিলেন, 'জান রাণী, অশিক্ষা আমাদের দেশের মেয়েদের বড় হীন করে রেখেছে। এই অন্ধকার আমাদের দূর করতে হবে।' তারপর তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন—'আসবে আমাদের সাথে?'

রাণীর বলতে ইচ্ছা হয় — 'আমি তো আপনাদেরই।' কিন্তু কোন কথাই সে বলতে পারে না। মাথা নীচু করে বসে থাকে।

রাণীর মনের কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না দিদির। একটা হলুদ রংয়ের ফর্ম দিয়ে বললেন — 'বাড়ী থেকে আসার সময় এটা পূরণ করে নিয়ে এসো।' হাত বাড়িয়ে

ফর্মটা নেয় রাণী। তারপর দিদিকে প্রণাম করে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

কয়েকদিন হল বাড়ীতে এসেছে রাণী। দিদিকে পেয়ে কনকের কি আনন্দ! মা হেসে বললেন — 'রোগা হয়ে গিয়েছিস খুকী।' বিকাল বেলায় বাড়ী এসেই বাবা বললেন, 'চল. চল — তাড়াতাড়ি চল, অনেকদিন দীঘির পাড়ে যাওয়া হয় না।' সেদিন বাবার কত প্রশ্ন! এক এক করে রাণী বলে যায় কলেজের কথা, পড়াশুনার কথা, নিলীমাদি-লীলাদির কথা। লীলাদি কেমনভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করছেন জেনে বাবার খুব আনন্দ হয়েছিল। বলেছিলেন — 'এরাই তো আমাদের গর্ব মা, সরোজিনী নাইডুর কথা জানিস তো?'

আগের দিন রাতে বৃষ্টির সাথে সামান্য ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আর তাতেই ফুলগাছগুলো সব মাটিতে শুয়ে পড়েছে। সারাদিন কেটে গেল গাছের পরিচর্যায়। অনেক বেলায় খেয়েদেয়ে যখন সবে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে, কনক এসে খবর দিল — 'পূর্ণেন্দুদা এসেছেন।' অনেকদিন পর দেখা হল দাদার সাথে। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে সেই যে কথা হয়েছিল তারপর আর দেখা হয় নি। মাঝে মাঝে দাদার কথা মনে হোত। লীলাদি ফর্মটা দেওয়ার পর বহুবার দাদার কথা মনে হয়েছে। ভেবেছে — দাদার সাথে পরামর্শ করা দরকার। ফর্মটা সে বারবার পড়েছে। ফর্মের একটা কথা তার খুব ভাল লাগে — 'প্রয়োজন হইলে দেশের মুক্তি সংগ্রামে আমার সর্বস্ব, এমন কি জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিব।' কি চমৎকার!

দাদার সাথে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। দু'জনে গিয়ে বসেছিল বাড়ীর পিছনের সেই টিবিতে। তখন বিকালবেলা। দুপুরের গুমোট ভাবটা তখনও কাটেনি। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। দাদাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সে খুব ক্লান্ত। ঘাসের উপর ধপ করে বসে দাদা বললেন, 'ঢাকা থেকে আমাদের জন্য কি নিয়ে এলে?' মৃদু হেসে রাণী বলে, 'খাবার নয় খবর এনেছি।' তারপর দাদার দিকে ফর্মটা বাড়িয়ে দেয়। পূর্ণেন্দু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফর্মটা দেখতে থাকে । রাণী বলে — 'কি করতে বল তুমি আমাকে?'

সহসা জবাব দিতে পারে না পূর্ণেন্দু । তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে — 'তোমার কথা মাষ্টারদাকে বলব রাণী।'

দাদার কথায় রাণীর বুকটা ধক্ করে ওঠে। দাদার মুখে কত কথাই না শুনেছে মাষ্টারদা সম্পর্কে। তিনি থাকতেন দেওয়ানবাজারে। পুলিশ তাঁকে ধরবার জন্য বাড়ী ঘিরে ফেললে তিনি নাকি দোতলা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই রকম আরও কত কথা। সেই মাষ্টারদাকে দাদা তার কথা বলবেন! শুনে কি বলবেন মাষ্টারদা!

'কি ভাবছ?' — দাদার কথায় চমকে উঠে হেসে ফ্যালে রাণী। তারপর দাদার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করে, 'আমাকে একদিন মাষ্টারদার কাছে নিয়ে যাবে দাদা?'

কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে পূর্ণেন্দু। দাদার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাণী। লক্ষ্য করে দাদার মুখে কেমন একটা আলো আঁধারীর ভাব খেলা করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ বয়ে যাওয়া একটা দমকা হাওয়ায় যেন হুঁশ ফিরল পূর্ণেন্দুর। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে — 'ঝড় উঠতে পারে, চল ঘরে যাই।'

তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকদিন। দিনগুলো কাটে আগের মত। মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করা, বুধি-শ্যামার পরিচর্যা করা, নিয়ম মতো বই নিয়ে বসা, কনকের সাথে আরতিদের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া, ঊষাদির খোঁজ খবর নেওয়া। কিন্তু একটা চিন্তায় মন সব সময় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। 'কই দাদাতো আর এলো না।' সেদিন বলেছিল — 'তোমার কথা মাষ্টারদাকে বলব রাণী।' সত্যিই বলতে পেরেছে? কি বলেছেন মাষ্টারদা? যদি বলেন — না পূর্ণেন্দু, মেয়েদের এই কাজে এখন যোগ দেওয়া চলবে না — তাহলে? কি করবে সে? এই সব চিন্তায় মনটা অস্থির হয়ে থাকে। দিনের বেলা একরকম। কিন্তু রাত যেন কিছুতেই ভোর হতে চায়না। এই উতলা অবস্থা মার নজর এড়ায় না। সেদিন বলেছিলেন, 'তোর কি হয়েছে খুকী?' হেসে পাশ কাটিয়ে সে উত্তর দিয়েছিল, 'কদিন পরেই তো চলে যেতে হবে মা।'

ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। ঢাকা রওনা হতে হবে কাল সকালে। আজ দুপুরে বাড়ীতে ভাল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হচ্ছে। যা সে ভালবাসে বাবা বেছে বেছে সে সব যোগাড় করেছেন। সকাল থেকেই মা রান্নাঘরে। কনকটা কিছুতেই কাছ ছাড়া হতে চাইছে না। সকাল থেকে তার মনও ভার হয়ে আছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে একটা কথা বারবার মনে আসছে। 'কই পুর্ণেন্দুদাতো এল না। তাহলে কি.....।'

দেখা মিলল বিকাল বেলায়। দাদাকে দেখে বুকটা ধক্ করে ওঠে রাণীর। দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করে সে। কি আছে সেখানে?

তাকে দেখেই গম্ভীরভাবে পূর্ণেন্দু বলে, 'চল রাণী, একটু বেড়িয়ে আসি।' সেই টিবির উপর এসে বসে তারা। দাদার মুখের দিকে চাইতে পারে না রাণী। ভাবে, এখনই শুনতে হবে সেই চরম কথাটা, 'মাষ্টারদা নিষেধ করেছেন।' তবুও নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। ধীরে ধীরে বলে — 'কি বলেছেন মাষ্টারদা।' বোনের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পায় পূর্ণেন্দু । স্নেহে শ্রদ্ধায় অন্তরটা তার পূর্ণ হয়ে ওঠে। মৃদু কণ্ঠে বলে, 'মাষ্টারদা অনুমতি দিয়েছেন।'

আনন্দে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না রাণী। চোখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। বোনের চোখের জল তাকে অবাক করে না। সে জানত এরকমই হবে।

সে দিনও দাদার মুখে অনেক কথা শুনেছিল মাষ্টারদা সম্পর্কে। তাঁর কথা বলতে বলতে দাদার গলা ভারী হয়ে এসেছিল। দাদা বলছিলেন, 'একদিন বসে আছি মাষ্টারদার পাশে। আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, জন্মেছি যখন তখন তো

মরতেই হবে, তাই মরবই যখন সার্থক মৃত্যুবরণের সাধনাই আমাদের করতে হবে। একজন প্রশ্ন করল — দাদা, আমাদের আত্মদানেই কি দেশ স্বাধীন হবে? মাষ্টারদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীর, শান্তকণ্ঠে বললেন আমাদের এই কয়জনের চেষ্টাতে স্বাধীনতা আসতে পারে না। কিন্তু এই অল্প কয়জনের আত্মদানে মানুষের বিবেক জাগবে, তারা সাহস পাবে, দলে দলে মানুষ আত্মবলিদানে এগিয়ে আসবে —তবেই আসবে দেশের মুক্তি। আমাদের আত্মদানের মূল্য এইখানে। তাঁর যে রূপ সেদিন দেখেছিলাম তা আজও ভুলতে পারি নি। আমরা যেন নতুন দিশা দেখতে পেয়েছিলাম।' তারপর তার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে দাদা বলেছিলেন — 'মাষ্টারদার পথেই জীবনটা আমি গড়তে চাই রাণী।'

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে নি রাণীর। মা এসে উঁকি মেরে দেখে বলেছিলেন, 'তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় খুকী । ভোরে উঠতে হবে।' কিন্তু চোখে সেদিন ঘুম ছিল না। বারবার দাদার কথাগুলো মনে পড়ছিল। 'মাষ্টারদার পথেই জীবনটা আমি গড়তে চাই রাণী।' অদ্ভূত একটা শিহরণ খেলে যায় মনে। আনন্দ হচ্ছিল এই কথা ভেবে, মাষ্টারদা তাকে অনুমতি দিয়েছেন। সারা রাত ভাবে, মাষ্টারদার বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখতে পারবে তো! কিন্তু এই দ্বিধা এই সংশয়কে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। বারবার নিজেকে বোঝাতে থাকে, 'তুমি পারবে, তোমাকে পারতেই হবে রাণী।'

---

* চতুর্থ পরিচ্ছেদ *

আই. এ পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে এল রাণী। সেদিন ছিল ১৯শে এপ্রিল, ১৯৩০। আগের দিন রাতে ভয়ংকব গতিতে বয়ে যাওয়া একটা বিধ্বংসী ঝড় যেন চট্টলবাসীর জীবনধারা চিন্তা চেতনাকে ওলট পালট করে দিয়েছে। যুব বিদ্রোহের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী আজ চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে। প্রভাস-নরেশ-ত্রিপুরা-বিধু-অর্দ্ধেন্দু শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। কান্না তাদের ঘরেও। শ্মশান থেকে বাবা এইমাত্র ফিরেছেন। ফিরেই চলে গিয়েছেন পাশের ঘরে। তাদের কাছ থেকে চোখের জল গোপন করার চেষ্টা করছেন বাবা, বুঝতে পারে রাণী। চোখের জল নিয়েই মা নিত্যদিনের কাজ করে চলেছেন। শহীদদের আর কাউকে চেনে না সে, নামও শোনেনি কখনও, শুধু অর্দ্ধেন্দুদা[৪]...........।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। তখন তারা ধলঘাটে গ্রামের বাড়ীতে। বয়সে সামান্য বড় অর্দ্ধেন্দুদা। ভীষণ দুরন্ত ছিল ও। একদিন তার চোখে লঙ্কার গুড়ো ছিটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, ফিরেছিল সন্ধ্যার পর। সেদিন বাড়ীতে একটা হুলস্থুল কাণ্ড। তারা শহরের বাড়ীতে, জামালখানায় চলে আসার পর অর্দ্ধেন্দুদারাও চন্দনপুরায় বাড়ী করে চলে এসেছিল। মাঝে মাঝে বাবার সাথে অর্দ্ধেন্দুদা আসত তাদের বাড়ীতে। বিজ্ঞানের খুব ভাল ছাত্র ছিল। অধ্যাপকেরা ভালবাসতেন ওকে। আশা করতেন তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করবে ও। বাড়ীতেও তাকে নিয়ে কত আশা! সেই অর্দ্ধেন্দুদা সব ছেড়ে এইভাবে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল! গর্বে আনন্দে বুক ভরে যায় তার..।

বাবা তার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ তারা দু'জনে এসে দীঘির পাড়ে বসেছে। ও পারের বট গাছটার পাশ দিয়ে সূর্য ক্রমশ দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাবার কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই। একমনে তাকিয়ে আছেন জলের দিকে। তারপর আপন মনেই বলে উঠলেন—'সব শেষ হয়ে গেল মা।'

বাবার এমন আর্তকণ্ঠ কোনদিন শোনেনি রাণী। গভীর ব্যথায় বুকটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে, বৈশাখের দক্ষিণা হাওয়া বটগাছের পাতাগুলো কাঁপিয়ে দিতে থাকে। আগে হলে বাবা বলতেন, 'এখন ঘরে চল মা', কিন্তু আজ যেন কোন হুঁশ নেই।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের উপরে বুলিয়ে নেন বাবা। তারপর বলেন, — 'ওর বাবা কেমন রাগী তাতো জানিস মা। ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন, 'বেছে নাও, হয় রাজনীতি না হয় বাড়ী।' বাবাকে প্রণাম করে সেই যে অর্দ্ধেন্দু বাড়ী ছেড়ে গেল, আর ফিরে এলনা। তারপর .....', কথা আর শেষ করতে পারেন না। তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। অনেকক্ষণ পরে বলেন—'ওর শবদেহ যখন আনতে গেলাম, তখন দেখলাম সবার চোখে জল। শেষ সময়ে নাকি বলেছিল, Let me die

in peace. শান্তিতে মরতে দাও আমাকে।'

সেদিন বেশ রাত করেই তারা বাড়ী ফিরেছিল। কনক ঘুমিয়ে পড়েছে। মা হারিকেনটা কমিয়ে দিয়ে মাদুর পেতে বারান্দায় বসেছিলেন। তাদের ঢুকতে দেখেও বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন — 'আর দেরী করিস না খুকী।'

সেদিন আর কোন কথাই হয় না। না খেয়েই বিছানায় আশ্রয় নেয় রাণী। কিন্তু ঘুম কোথায় চোখে! খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে সে উঠে পড়ে। কনকটা কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। হারিকেনটা বাড়িয়ে দিয়ে বাবার কাছ থেকে পাওয়া 'স্বাধীনতা' পত্রিকাটা পড়তে শুরু করে সে।

"ধন্য চট্টগ্রাম, তুমি কেবল জাতিকে সার্থকতার মুখ দেখাও নাই, কেবল জাতির লাঞ্ছিত আত্মসম্মানকে বাঁচাও নাই, তুমি জাতির বিপ্লবী প্রাণকে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাপকতার আদর্শের সহিত পরিচিত করাইয়াছ। জাতির লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর দিতে শিখাইয়া ছিলেন ক্ষুদিরাম, জাতির কলঙ্ক ঘুচাইয়া ছিলেন কানাইলাল, জাতির ভিতরে যে মনুষ্যত্ব জাগিতেছে, ব্যক্তিগতভাবে সত্যেন, বীরেন, ধিংড়া প্রভৃতি তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন বিপ্লব অংকের শুরুতেই। বাঙালী কাপুরুষ, বাঙালী যুদ্ধ করিতে জানে না — এই অপবাদ ঘুচাইয়া ...... যুদ্ধোদ্যমের আদর্শ বাঙালীকে প্রথম দেখাইয়াছিলেন যতীন্দ্রনাথ। ...... চট্টগ্রাম তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্যে প্রথম হাত দিয়াছে।.....

এই তো চাই, নির্যাতনের পর নির্যাতনে মানুষ জাগুক, স্বাধীনতার উদ্যমের ব্যাপকতার আদর্শ সফল হউক। একটা জাতির দাসত্বের কলঙ্ক মুছিবার প্রয়াসে রক্তপাতের হিসাবে মূঢ় জাতিকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়া লাভ কি?

......আজ চট্টগ্রামের প্রদর্শিত পথে ব্যাপকতর আদর্শের জীবনে নূতন কর্মীদল বাহির হইয়া আসুক। জেলার পর জেলায় বিদেশী শাসকের ক্ষমতার অভিমান আর মোহ ধুলিসাৎ হউক, জয় হইতে জয়ের অভিযানে জাতি মত্ত হইয়া উঠুক, সাফল্য হইতে সাফল্যের পানে ছুটিয়া জাতির আত্ম-অবিশ্বাস দূর হইয়া যাক, অগণিত ভবিষ্যদ্বংশীয়ের কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধাভিনন্দন জাতির যুবকদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক! স্তরের পর স্তর আঁধার কাটিয়া গিয়া পূর্ব দিগন্তে উষার আলো দেখা দিতেছে। আর দেরী নাই।"

বারবার লেখাটা পড়ে রাণী। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত'র এই লেখাটা তাকে উদ্বেলিত করে। তারপর বইয়ের তাকে কাগজটা গুঁজে রেখে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। জ্যোৎস্নালোকিত আমবাগানের মাথার উপর দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বারান্দার এক কোণায় যে দিকে ফুলবাগান সেদিকে এসে বসে পড়ে রাণী। অতিকষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করতে থাকে সে, কিন্তু অবাধ্য অশ্রু কোন মতেই বাগ মানতে চায় না। মধ্যরাতের বয়ে যাওয়া মৃদুমন্দ হাওয়া গাছের পাতাগুলো নাড়িয়ে দিতে থাকে। ঘোরের মধ্যে রাণী এসে দাঁড়ায় বাড়ীর পিছনের দিকের সেই উঁচু ঢিবিতে। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে জায়গাটায় আলো

আঁধারীর পরিবেশ রচনা করেছে। একটা গাছতলায় বসে দূরের দিকে তাকিয়ে সারি সারি টিলার অস্পষ্ট অবয়ব দুচোখ ভরে দেখতে থাকে রাণী। এই শৈলশ্রেণীর মধ্যে মাষ্টারদারা কোথায় আছেন কে জানে! মনে মনে রাণী কল্পনা করে, সে যেন মাষ্টারদার সাথে আছে, জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবী ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে, মাষ্টারদা তার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন; সেও যেন মাষ্টারদার সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, গৌরবের অংশীদার। নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশের দিকে রাণী একমনে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে — কবে তার এমন সৌভাগ্য হবে। কবে গিয়ে সে দাঁড়াবে বিপ্লবী ভাইদের পাশে।

বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার দিনটা এখনও মনে পড়ে। কি বৃষ্টি, কি বৃষ্টি! সারা আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়েছে! একজন তো হেসে বললেন, 'তোমার নাম কি বর্ষা? এমন দিনে ভর্ত্তি হলে!' কলেজের বিরাট বিল্ডিংটার পাশে নিজেকে কত ছোট বলেই না মনে হয়েছিল। সমস্ত পরিবেশটা-বিহ্বল করে তুলেছিল আমাকে। সদর গেট থেকে লাল সুরকির পথ এঁকেবেঁকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে পোর্টিকোর সামনে। পোর্টিকো থেকে নিচু লম্বা সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে কিছু দূরে — মিশেছে একটা খোলা স্বল্প পরিসর বাঁধানো উঠোনে — যার দুধার দিয়ে চলে গিয়েছে ক্লাসরুম। ঠিক উল্টোদিকেই একটা হল — সেটা লাইব্রেরী। বেথুন সাহেবের মূর্ত্তি রয়েছে সেখানে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও নাকে চশমা এঁটে বই পড়ছেন। পাশেই বাগান। দেবদারু ও নানা নাম না জানা গাছে ভর্ত্তি। পরে দেখেছিলাম গাছগুলির গায়ে গায়ে বটানিকাল নাম লেখা ইংরাজীতে। যেন সরস্বতীর উপবন। সব মিলিয়ে চিত্ত বিহ্বল করা একটা পরিবেশ যেন।

কলেজের প্রথম দিনটা চমৎকার কেটেছিল। ধুতি পাঞ্জাবী পরা গৌরবর্ণের একজন অধ্যাপক ঢুকেই বললেন —'তোরা সংস্কৃত পড়তে চাস না কেন? আমাদের পণ্ডিতমশাই কি বলতেন জানিস? বলতেন — তোদের রবিঠাকুর লিখেছে, আজ কিসের তরে নদীর চরে চখাচখির মেলা। আর আমি বলি — কিং কারণমদ্যারে নির্জ্জলাসরিদন্তরমিতচক্রমিথুনমেলম্। কোন্‌টা শুনতে ভাল? তোদের বাংলা না আমার সংস্কৃত?' বলে যখন হা হা করে হাসতেন, কি ভালই না লাগত! সংস্কৃতের আমি মুগ্ধভক্ত। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম সুখেন্দুবাবুর ক্লাস।

আর ছিলেন স্টেলা বসু। আমাদের ইংরাজী পড়াতেন। তাঁর বাংলা উচ্চারণ নিয়ে প্রায়ই আমরা হাসিঠাট্টা করতাম নিজেদের মধ্যে। তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন — "মেয়েরা যখন Paradise Lost পড়বে তখন একেবারে মোহিত্ হয়ে যাবে।" কি ভালই না তিনি বাসতেন আমাদের।

অধ্যাপক নির্ম্মলকান্তি মজুমদারের কথাও ভোলা যায় না। কি সুন্দর ইংরাজী

পড়াতেন। নিজের আঙ্গুলের উপর তাঁর দৃষ্টিনিবদ্ধ থাকত, ভুলেও মুখ তুলে চাইতেন না। একদিন ছুটি শুরু হবার আগের দিন শেষ ঘন্টায়, দক্ষিণ দিকের বারান্দার পাশে ছোট ঘরে অনার্সের ক্লাস — আমরা কজন বসে আছি, আকাশে ঘনঘটা, দেবদারু গাছের পাতাগুলো বাতাসের হিল্লোলে কাঁপছে থরথর করে, ছোট বড় বৃষ্টি ভেজা গাছপালায় সবুজের সমারোহ, চারিদিকে মরসুমী ফুলের মেলা — এমন দিনে পড়তে কারও ভালো লাগে! এমন সময় স্যার ক্লাসে ঢুকতেই আমরা ধরে বসলাম গল্প বলতে হবে। স্যার নিরুপায় হয়ে 'Reflection on Mothers' Affection থেকে প্রায় দুই পৃষ্ঠা কবিতার মত আবৃত্তি করে গেলেন।

বোধহয় আমাদের উচ্ছলতা দেখে স্যারও খানিকটা অভিভূত হয়েছিলেন। নিজেই বললেন, 'এস, তোমাদের একটা কবিতার কয় লাইন শোনাই।' ভরাট গম্ভীর গলায় স্যার শুরু করলেন —

'বিলাস বর্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
অগ্রগামী আজি সবাকার
বল রাজপুতনারে — বেণী বিসর্জিতে পাবে
বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন
অন্তরে সে বীরাঙ্গণা, শৌর্য্যে ভরা মন।'

মিস্ মেরী বনার্জির কথাও মনে পড়ে। অল্পদিনই তাঁর ক্লাস করতে পেরেছিলাম আমরা। খুব হাসতেন। সুন্দর সাবলীল ইংরাজী বলতেন আর যখন পড়াতেন তখন মনে হত তিনি যেন অন্য জগতের মানুষ। হঠাৎ কি যে হয়ে গেল। একদিন ভোরবেলায় এসে বকুল খবর দিল মিস বনার্জি আর নেই। সবাই মিলে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম ওঁকে। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

মজা হোত, যখন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা বিভিন্ন ব্যায়াম শেখাতেন। শাড়িতে পিন করে বা মালকোঁচা মেরে নিতে হোত। খুব বিরক্ত হতেন তিনি। শাড়ীর দিকে তাকাতেন আর বলতেন, 'Most unscientific dress for Physical exercise'. হতাশ হয়ে বলতেন — 'নাঃ, তোমাদের কিছুই শেখানো যাবে না।' কিন্তু আবার যখন শাড়ী পরেই আমরা বাস্কেটবল খেলতাম আর ম্যাচের পর ম্যাচ জিততাম, খুব আনন্দ পেতেন তিনি। হাত তালি দিয়ে সুরেলা গলায় বলতেন, 'Wonderful'।

১২ আগস্ট বেথুন সাহেবের মৃত্যুদিনে সবাই আমরা যেতাম তাঁর সমাধিতে মালা দিতে। দুপুরে বেথুন হলে স্মৃতিসভা বসত। ঘর সাজানো হোত ফুল আর খৈ এর মালা দিয়ে। গান গাওয়া হোত —

**'শিক্ষা আমার দীক্ষা আমার
জীবনে আমার সুখের মূল
পেয়েছি যেখানে জগৎ মাঝারে
কোথাও তাহার নাইকো তুল।'**

একদিন যা চোখে দেখেছিলাম, ভোলা যায় না। দুর্গাপূজার পর সেদিনই প্রথম কলেজ খুলবে। ছুটিতে যারা বাড়ী গিয়েছিলাম তারাও একে একে আবার ফিরে এসেছি কলেজ হস্টেলে। সকাল বেলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম দলে দলে ছেলেমেয়েরা এসে কলেজের গেটের সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে। অধ্যাপকেরা ঢুকতে পারছেন না — ছুটে এলেন অধ্যক্ষা রাজকুমারী দাস। পুলিশ এল, এল মস্ত গাড়ী — জাল ঘেরা। শুরু হল মারধোর, অত্যাচার। যখন কিছুতেই সত্যাগ্রহীদের সরানো গেল না তখন জোর করে তুলে নিয়ে গেল গাড়ী ভর্ত্তি করে। আমারই বয়সী সব। বারবার মনে হতে লাগল, আমিও যদি থাকতে পারতাম ওদের মধ্যে।

একদিন আলাপ হল সতীর সাথে, সতী ঘোষ। কি সুন্দর প্রাণোচ্ছল মেয়ে ও। ভরাট গম্ভীর গলা। গলা ছেড়ে যখন গান গাইত 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' কি চমৎকারই না লাগত। প্রায়ই ওকে ধরে নিয়ে আসতাম আমার হোস্টেলে। একটার পর একটা গান গাইত ও — তন্ময় হয়ে শুনতাম আমরা।

রাত তখন অনেক। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাক্স থেকে একটা বই বের করে রাণী। আজই পেয়েছে। ছাত্রী সংঘের দিদিরা বইটা দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'খুব সাবধানে পড়বে, কেউ যেন জানতে না পারে।' বইটার প্রচ্ছদে ছিন্ন শৃঙ্খল হাতে লালপেড়ে শাড়ি পরা এক নারীর ছবি। তার দু'পায়েও ছিন্ন শৃঙ্খল। নীচে লেখা, 'ভাঙ্গনের পালা শুরু হল আজি, ভাঙ্গ ভাঙ্গ শৃঙ্খল।' ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের, 'চলার পথে'।

বইটার মধ্যে ডুবে যায় রাণী। রেখা বিপ্লবী দলের সদস্যা। বিপ্লবীদের অনেক গোপন দলিল ও নথিপত্র তার কাছে। বর্মায় যাওয়ার পথে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে তাকে ঘিরে ফেলল ইংরাজ পুলিশ। রেখা ভাবল, ধরা পড়লে অনেক নথিপত্র ওদের হাতে চলে যাবে, ফলে সংগ্রামের ক্ষতি হবে। এখন কি করবে সে? উত্তেজনায় রাণীর দমবন্ধ হয়ে আসে। সে পড়তে থাকে —

''অনেক ভাবনার পর রেখা যেন একটা উপায় পাইল, তাহার মনটা খুশীতে ভরিয়া উঠিল। সাহেবকে একটু আব্দারের স্বরেই সে বলিল — 'Well Mr. Robertson, would you Go the Upper deck? I can speak my mind to you if You Come alone.'

সাহেব যেন হাতে স্বর্গ পাইল। রেখাকে সঙ্গে লইয়া উপরের ডেকে চলিয়া গেল।......

উপরে উঠিয়া রেলিং এর পাশে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইল। বিশাল সাগরবক্ষে সবুজ ঢেউগুলি তখনও নৃত্য রসে চঞ্চল, আর রেখাও যেন সেই চঞ্চলের সঙ্গে নিজের প্রাণের ছন্দ জাগাইয়া চপল হইয়া উঠিতেছিল। রেখার ওষ্ঠে একটু মধুর হাসি খেলিয়া গেল — সাহেব সেই হাসির মোহে অভিভূত হইয়া পড়িল......।

এমনি সময় রেখা একটু পিছু হটিল, তারপর আচম্বিতে সমুদ্রের অগাধ জলে ঝাঁপ

দিয়া পড়িল — সাহেবের কানে শুধু ভাসিয়া আসিল অতি মধুর কণ্ঠধ্বনি — 'good bye'. বিমূঢ়ের মত সাহেব অনেকটা শূন্য দৃষ্টিতে সুমুখের দিকে তাকাইয়া রহিল — তারপর কত খোঁজ — কত ডুবুরি জলে ডুবিয়া সন্ধান করিল। কিন্তু বৃথা।

অনন্ত সমুদ্রের বুকে যে অর্ঘ্য লইয়া এই তরুণী আজ ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহার সন্ধান করিতে পারে শুধু ভগবান, আর পারে সে, যে সত্যকে ঠিক এমনি করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে।"

সত্যিই তাই, সত্যকে আপন করে নিতে না পারলে এমনভাবে নিজেকে উৎসর্গ করা যায় না। রেখার উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম জানায় রাণী। বইটা বন্ধ করে বাক্সে রেখে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাতিগুলো একে একে নিভতে শুরু করেছে। ট্রাম একটু পরেই চলতে শুরু করবে। আপন মনেই রাণী ভাবে — 'রেখার মত সে-ও পারবে তো?'

রবিবার বিকালে দেখা করতে এসেছিলেন মনোরঞ্জনদা। মনোরঞ্জন রায়[৫]। থাকেন শাঁখারীটোলার পিসীমার বাড়ীতে। সেদিন বড় আনন্দ হয় তার। মাষ্টারদার কথা হয়, জানতে পারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নানা কথা। কিন্তু যাওয়া হয় নি কখনও পিসীমার কাছে। কত কথা শুনেছে তাঁর সম্পর্কে। সবাইকে আপন করে নেন। জীবন তুচ্ছ করে কতবার কত বিপ্লবী কর্মীকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন — বিপদের পরোয়া করেন নি। এই রকম আরও কত কথা। সেদিন মনোরঞ্জনবাবু আসতেই রাণী বলল,

'আজ কোনমতেই ছাড়ছি না দাদা, পিসীমার কাছে নিয়ে যেতেই হবে।'

মনোরঞ্জনবাবু হেসে বললেন — 'সে জন্যই তো এসেছি রাণী। হস্টেল ছেড়ে সেখানে কয়েকদিন থাকতে পারবে তো?'

তারপর কয়েকদিন দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ। মাষ্টারদা ইস্তাহার পাঠিয়েছেন। বিষয় — 'চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের সাথে যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়'। দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে বিপ্লবী বাহিনীর এই অতুলনীয় কীর্তির কথা, মাষ্টারদা এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন। গুটিকতক বিপ্লবী ভাইদের হাতে ব্রিটিশ সিংহের এই পরাজয়ের কথা যখন সবাই জানতে পারবে কি অপূর্ব প্রভাব পড়বে তার — ভাবতেই রাণী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। কিন্তু সাইক্লোস্টাইল মেশিনের কতটুকুই বা ক্ষমতা। মাত্র এক হাজারের বেশী ইস্তাহার তারা তৈরী করতে পারে নি। এতে কতটুকুইবা প্রচার হবে? রাণী ভাবে, কোন মন্ত্রবলে যদি লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার তৈরী করতে পারতো সে কি ভালই না হোত! দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া যেত মাষ্টারদার আদর্শকে। কিন্তু কিই বা করতে পারে সে, কতটুকুইবা তার ক্ষমতা!

'দু-একটা ইংরাজ মেরে স্বাধীনতা সংগ্রামের কি উপকার হবে আমি তো ভেবে

পাই না ভাই। তার চেয়ে আমার অহিংস পথ অনেক বেশী কার্যকর বলে মনে হয়,' — নলিনীর এই কথায় অবাক হয় না রাণী। কত লোকেই তো এরকম ভাবে। নলিনীর দিকে তাকিয়ে সব্যসাচীর সেই কথাগুলো মনে পড়ে যায়। ''দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল — সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করার অধিকার, আর রইল না আমার? এ ধর্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে'' নলিনী? কিন্তু এসব কিছুই বলে না। অনেকক্ষণ নলিনীর মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে — 'দয়াপরবশ হয়ে একদিন ইংরাজ এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে এই কি তোমার বিশ্বাস? এত বড় একটা দেশের মুক্তিযজ্ঞে রক্ত ঝরবে না! আত্মাহুতির প্রয়োজন নেই বলে তুমি মনে কর?'

আজ সবে ভোর বেলায় সে পথের দাবী শেষ করেছে। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি। গ্রামের পর্ণকুটীরে প্রদীপের আলোয় বসে কোন্ বিপ্লবী ভাই তার জন্য এটা তৈরী করেছে কে জানে! সমস্ত অন্তর জুড়ে একটা শিহরণ খেলে যায়। বইটা শেষ করে মনে মনে প্রণাম জানায় শরৎবাবুকে। এই অনুভূতি সে সারাদিন ধরে উপভোগ করতে চায়।

নলিনী তর্ক করতে চেয়েছিল, কিন্তু আরও কথা বাড়িয়ে এই সুর সে কেটে দিতে চায় না।

পূজোর ছুটিতে বাড়ীতে এসেছে রাণী। এসেই মায়ের হাতে গঙ্গাজলের পাত্র দিয়ে বলল 'বাব্বাঃ, কি তাগাদা!' মা হেসে বললেন, 'যদি ভুলে যেতিস্। আর কদিন পরেই মায়ের পুজো সে খেয়াল আছে?' তারপর বললেন, 'হাত মুখ ধুয়ে দুটো মুখে দিয়ে নে খুকী, দেরী করিস না।'

ক'টা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যায় টের পায় না রাণী। সন্ধ্যা হলেই ঘোষালদের বাড়ীতে সবাই দল বেধে যায়, পাড়ায় ঐ একটাই পুজো। অষ্টমীর দিন আনন্দ হয় সব চেয়ে বেশী। সেদিন যেন মণ্ডপের সামনে মানুষের ঢল নামে। নতুন জামা পরে সন্তোষের আনন্দই সবচেয়ে বেশী। বাক্স থেকে একটা নতুন কাপড় বের করে সেদিন মা বলেছিলেন, 'এটা পরে নে খুকী, তোকে বেশ লাগবে।'

কল্পনাকে সাথে নিয়ে সেদিন মনোরঞ্জনদা এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। সেদিন বিজয়া। মা একথালা নাড়ু এগিয়ে দিতেই মনোরঞ্জনদা যেভাবে একটার পর একটা মুখে পুরতে লাগলেন — আমি আর কল্পনা হেসেই বাঁচি না। খেয়েদেয়ে হাসিমুখে দাদা বললেন, 'জানতো জীবনের সব থেকে বড় আনন্দ হল ভোজনানন্দ।' কল্পনা বলল, 'সে আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।'

কথায় কথায় উঠে পড়ল সাহসের প্রশ্ন। বাড়ীর একটা পাঁঠা দেখিয়ে দাদা হেসে

বললেন, 'খুব তো সাহসের কথা বলছ —পারবে এই পাঁঠাটা বলি দিতে।' অবলীলাক্রমে কল্পনা বলল —'নিশ্চয়ই, আমার একটুও হাত কাঁপবে না।' দাদা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — 'তুমি?' বললাম, 'আমি পারব না, দাদা।'

দাদা হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর আমারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাণী তুমি কি অহিংসপন্থী হয়ে পড়লে? স্বাধীনতার জন্য কি তুমি অহিংসপন্থায় সংগ্রাম করতে চাও? আমাদের যে পথ তাতে তো হেলায় জীবন দিতেও হবে নিতেও হবে। আর তুমি সামান্য একটা পাঁঠার প্রাণ নিতে পারবে না?'

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

দাদা বললেন — 'কিছু বললে না তো?'

বললাম, 'দাদা, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও পারব, নিতেও মোটে মায়া হবে না। কিন্তু একটা নিরীহ জীবকে হত্যা করতে সত্যিই মায়া হয়। ও আমি পারব না।'

---

* পঞ্চম পরিচ্ছেদ *

নিয়মিত খবরের কাগজ দেখার অভ্যাস ছিল রাণীর। সেদিন কাগজ খুলেই তার চোখে পড়ল বড় বড় হরফে লেখা—

"গুলীর আঘাতে ইন্সপেক্টর নিহত
চাঁদপুর ষ্টেশনে বিষম ব্যাপার

চাঁদপুর, ১লা ডিসেম্বর। অদ্য খুব সকালে চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু তারিণী মুখোপাধ্যায় গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। ২নং ডাউন সুর্মা মেলের সম্মুখে বাংলা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ক্রেগকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়াই তারিণীবাবু নিহত হইয়াছেন। তিনি পুলিশের ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন এবং ঘটনার অব্যবহিত পরে আহত অবস্থায় হাসপাতালের দিকে নেওয়া হইলে পথিমধ্যেই তিনি মারা যান।

স্থানীয় পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। অপরাধীদের সন্ধানের জন্য সমস্ত স্থানে খানাতল্লাস হইতেছে। কিন্তু এপর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা ২.১২. ১৯৩০)

খবরটা পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাণী। 'যাক কেউ ধরা পড়েনি তাহলে!' কিন্তু পরদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল —

"চাঁদপুর ষ্টেশনে ইন্সপেক্টর তারিনীনাথ মুখার্জী হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গতকল্য এক ঘটিকার সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় দুই জন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের নিকট তিনটি গুলিভরা রিভলবার, একটি আস্ত বোমা, কতকগুলি কার্তুজ এবং কয়েকটি বৈদ্যুতিক মশাল পাওয়া গিয়াছে।

তাহাদের গায়ে রঙিন চাদর ছিল এবং তাহারা চাঁদপুর হইতে লাকসামের দিকে আসিতেছিল।

যুবক দুইটির নাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালিপদ চক্রবর্ত্তী। তাহারা নাকি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার ফেরারী আসামী। তাহাদের কুমিল্লায় আনয়ন করা হইয়াছে।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা ৩. ১২.১৯৩০)

বুকটা কেঁপে ওঠে রাণীর। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার ফেরারী আসামী! কাগজটা নামিয়ে রাখে সে। সেদিন আর কলেজে যেতে ইচ্ছা করে না।

সেদিন মনোরঞ্জনদা প্রায় জোর করেই নিয়ে এলেন পিসীমার* কাছে। না এলে যে কি ভুল হত! সামনেই পরীক্ষা, তারই প্রস্তুতিতে সে ব্যস্ত ছিল। দাদা এসে বললেন—'চল তোমাকে যেতেই হবে, পিসীমা কি সব খাবার দাবার করেছেন; আমার উপর হুকুম, রাণীকে ধরে নিয়ে আয়।'

সে যখন গিয়ে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তাকে দেখে পিসীমা বললেন, 'সেই যে কবে গিয়েছ, আর দেখা নেই কেন মা,' তারপর পাশে বসিয়ে বললেন, 'জান রাণী, ওরা রামকৃষ্ণকে এখানে নিয়ে এসেছে। দীনেশের পাশের সেলে আজ দেখলাম ওকে।'

রাণীর সাথে রামকৃষ্ণের পরিচয় ছিল না। খবরের কাগজে তাঁর নাম দেখেছিল, খবরের কাগজেই জেনেছিল তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। কিন্তু যখন জানল বিপ্লবী এই যুবক ফাঁসির হুকুম মাথায় নিয়ে এই কলকাতায় আছেন তখন তার মনে হল 'দেখা করতেই হবে রামকৃষ্ণের সাথে। দেখা সে করবেই।'

কয়েদীর বেশে গারদের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন রামকৃষ্ণদা। প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ। একটা ছোট অপ্রশস্ত ঘর, জানালা নেই, ঘরের বাইরে ছোট উঠান, উঠানের এক কোণায় একটা বড় শিউলীগাছ। রামকৃষ্ণদার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাণী।

একজন জীবনের বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদন করে মৃত্যুর প্রহর গুনছে, আর একজন তিলতিল করে নিজেকে গড়ে তুলছে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য। রাণী মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে গান গেয়ে শোনায়, রামকৃষ্ণ সাধ্যমত গলা মেলায়। রাণী বিপ্লবী জীবনের নানা কথা জিজ্ঞাসা করে, সাধ্যমত রামকৃষ্ণ উত্তর দেয়। দু'জনার সাক্ষাৎ মানেই হাসি, গল্প, গান, আনন্দ, আলোচনা। রাণী এই প্রথম অনুভব করে, 'মৃত্যুঞ্জয়' কথাটার সত্যকার মানে কি।

কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করে রাণী, 'এই পথে কিভাবে এলেন দাদা?'

রামকৃষ্ণ উত্তর দেয়, 'তারকেশ্বরদা, তারকেশ্বরদা'। আমরা তাকে ফুটুদা বলেই ডাকতাম। ছিলাম বাবা মায়ের বাধ্য সন্তান, পড়াশুনা করতাম, ফুটবল খেলে বেড়াতাম — দাদাই হাত ধরে এই পথে নিয়ে এলেন। দাদা না থাকলে এই রামকৃষ্ণের জন্ম হতো না রাণী।'

আবদারের সুরে রাণী বলে — 'আপনার সেই সব দিনগুলোর কথা একটু বলুন না দাদা।'

'সব তো মনে নেই ভাই, তবে একদিনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারবো না। আমাদের স্কুল থেকে তিন সাড়ে তিন মাইল দূরে ছিল একটা পাহাড়, নাম করলডাঙ্গা। দাদা একদিন সেখানে দেখা করতে বললেন দুপুর বেলায়। পাহাড়ী পথ, কাঁটাগাছে ভর্তি, উঁচু-নীচু বন্ধুর। গিয়ে দেখি অনেকেই হাজির। ধলঘাট থেকে এসেছে অপূর্ব সেন আর অজিত বিশ্বাস, সাওড়াতালি থেকে এসেছে শচীন সেন, খোকা সেন, হরেন সেন, আর অর্দ্ধেন্দু দত্ত। দাদা বললেন, আজ এখানে বনভোজন। সবাই হৈ হৈ করে উঠলাম আনন্দে। খোকা সেন আবৃত্তি করল,

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
দেখিব না দিক।
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।

কথায় গানে আবৃত্তিতে যখন আমরা মশগুল তখন এল খাওয়ার ডাক। পদ্মপাতার আসনে বসে পদ্মপাতার থালায় সবাই মহানন্দে খেলাম ভাত আর আঁধপোড়া মাছের ঝোল। সেই দিনটাকে যেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই রাণী।'

নিয়মিত ডায়েরী লিখত রাণী। পূর্ণেন্দুদা একদিন বলেছিলেন, চরিত্র গঠন করার জন্য এই অভ্যাস দরকার। বলেছিলেন,' প্রতিদিন লিখবে, কোন মিথ্যা কথা বলেছ কিনা, কোন নৈতিক দুর্বলতা এসেছিল কিনা; তারপর মাঝে মাঝে ডায়েরী দেখে নিজের বর্তমান অবস্থার সাথে মেলাবে, দেখবে এতে অনেক কাজ হবে; নিজের প্রতি বিশ্বাস তোমার ক্রমশই বাড়তে থাকবে।'

সেই থেকেই নিয়মিত ডায়েরী লেখা শুরু। মাষ্টারদার নেতৃত্বে যুববিদ্রোহ, জালালাবাদে শহীদদের আত্মদান, কালারপোলের সংগ্রাম, ফেনীর সংঘর্ষ রাণীর জীবনের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। চোখ বুঝলেই সে শুনতে পায় অমরেন্দ্রর[৮] সেই অন্তিম কথা — 'Amarendra does not know, how to surrender'.

সব সময় রাণী ভাবে কেমন করে কিভাবে দেশের কাজে মাষ্টারদার পথে নিজেকে উৎসর্গ করবে, কি ভাবে সে গড়ে তুলবে নিজেকে।

মনের এই অবস্থায় একদিন জিজ্ঞাসা করে রামকৃষ্ণকে, 'দাদা বলতে পারেন, বিপ্লবী জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি? একজন বিপ্লবী কিভাবে গড়ে তুলবে নিজেকে?'

একটু হেসে রামকৃষ্ণ উত্তর দেয়, 'এই প্রশ্নের জবাব যিনি দিতে পারেন তাঁর দেখা হয়ত তুমি একদিন পাবে রাণী, আমি মাষ্টারদার কথা বলছি। একদিন তারকেশ্বরদার হাত ধরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলাম — বিপ্লবীদের সবচেয়ে বড় দরকার নৈতিক শক্তির। বলতেন —আমাদের হতে হবে উদারচিত্ত, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, আত্মত্যাগী। বারবার বলতেন —কারও মধ্যে এতটুকু গুণ দেখলে প্রশংসা করবে। গুণের মর্যাদা দিতে না পারলে আমরা বড় হব কি করে।'

রামকৃষ্ণ বলে যেতে থাকে—'একদিন বিকালবেলায় মাষ্টারদার পায়ের কাছে বসে আছি। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে অস্তায়মান সূর্যের ধূসর বর্ণের আলো তাঁর চোখের উপর পড়ছিল। মনে হচ্ছিল চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। চারদিকে একটা নীরব প্রশ্নময় নৈঃশব্দ। হাতের বইটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে থেমে থেমে তিনি বললেন — রামকৃষ্ণ, গোটা দেশটাকে আমি বিপ্লব ভাবনায় ডুবিয়ে

দিতে চাই, এ না পারলে বিপ্লব অসম্ভব। রাণী, আমাদের সবার তল পাবে, তল পাবে না এই মানুষটার। যদি কোনদিন দেখা হয়, দু'হাত ভরে গ্রহণ কোরো।'

সেদিন রামকৃষ্ণকে যেন কথায় পেয়ে বসেছিল। অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, 'আমার কি মনে হয় জান? মনে হয়, No revolutionary can die with satisfaction. কত কাজ যে জীবনের বাকী থেকে যায়! ওই যে কবিগুরু বলেছেন না, 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু'—চাই তো বটে, কিন্তু তার ব্যবস্থা কি করে যেতে পারে তাঁরা? পারে না, তাই অতৃপ্তি থেকেই যায়। মনে হয়, জীবনটা যদি আরও দীর্ঘ হোত, আরও কিছুটা সময় পাওয়া যেত, তবে অসমাপ্ত কাজগুলো হয়তো শেষ করে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতো হবার নয়, তাতো হতে পারে না।'

অশ্রু যে কখন কপোল বেয়ে নামতে শুরু করেছে খেয়াল করেনা রাণী। নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলে — 'আমরা মেয়েরা আপনাদের মত হতে পারিনা দাদা?'

রাণীর প্রশ্ন বিচলিত করে রামকৃষ্ণকে। সহসা জবাব দিতে পারে না। তারপর খানিক ভেবেচিন্তে বলে — 'রাণী, আমার ধারণা ছিল, সমাজের যা অবস্থা তাতে বাইরে বেরিয়ে এসে রক্তাক্ত এই পথ গ্রহণ মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব। তারচেয়ে ঘরের মধ্যে থেকে নানাভাবে তারা যতটা পারেন সাহায্য করুন — এই যথেষ্ট। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে, তোমাকে দেখার পর। এখন ভাবি কত ভুল ধারণাই না আমরা মনের মধ্যে পুষে রাখি। আজকাল কেবলই মনে হয়, যদি একবার এই গারদখানার বাইরে যেতে পারতাম, তবে চীৎকার করে বলতাম— দেশসেবায় নরনারীর ভেদ নেই, মায়ের সেবায় সবারই সমান অধিকার।'

দু'জনের দেখা হয় নি তারপর বেশ কয়েকদিন। এক বিকালে রাণী আবার হাজির হ'ল রামকৃষ্ণের কাছে। হেসে রামকৃষ্ণ বলল — 'কোথায় ছিলে এতদিন? আমি তো ভেবেই মরি। অসুখ বাধিয়ে বসেছিলে বুঝি? রোজ ভাবি এই বুঝি তুমি এলে।'

খানিকপরে রামকৃষ্ণ বলে — 'জান রাণী, গতকাল রাতে একজনকে স্বপ্নে দেখলাম। সেই থেকে মনটা কেমন ভার হয়ে আছে। ওর কথা তোমায় কখনও বলা হয়নি। আমাদের সাওড়াতালি স্কুলের সে ছিল উজ্জ্বল রত্ন। গম্ভীর গম্ভীর মুখ কিন্তু চোখদুটো যেন হাসিতে সবসময় চকচক করত। দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে সে বেরিয়ে এসেছিল। যুববিদ্রোহের পরেই তার সাথে আমার পরিচয়। আমরা তখন আত্মগোপন করে আছি। এক আস্তানা ছেড়ে প্রায় প্রতিদিনই অন্য আস্তানায় চলে যেতে হত। সেদিন গভীর রাতে অস্ত্রপ্রশিক্ষণ চলছে, হঠাৎ অসাবধানে পিস্তলের একটা গুলি ওর মাথায় গিয়ে লাগে।"

শিউরে উঠে রাণী বলে —'তারপর'!

'তারপর? তারপরও তিনদিন সে বেঁচে ছিল। ঐ অবস্থায় কোথায়ইবা ডাক্তার! যতটা পারি আমরাই সেবাশুশ্রুষা করলাম। কিন্তু আশ্চর্য কি জান — কোন কাতরোক্তি

তার মুখ থেকে আমরা শুনিনি। বোধহয় পাছে গোপন আস্তানার কথা জানাজানি হয়ে যায় এই আশংকায় শচীন মৃত্যু যন্ত্রণাকেও হজম করে ফেলেছিল। এই ধরণের ছেলেরা আজও এ দেশে জন্মায় রাণী। এদের দেখেই ভরসা পাই; ভাবি — যে জাতি এমন বীর সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে কোনমতেই চিরকাল ঘুমিয়ে থাকতে পারে না; একদিন সে জাগবেই.....।'

বলতে বলতে রামকৃষ্ণের গলা ধরে আসে। রাণীর চোখ থেকে দ্রুত চোখ সরিয়ে যেন সুদূরের কোন গাছের চূড়াকে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে এমনভাবে রামকৃষ্ণ শান্ত ভাবে চিন্তা করে প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে বলল —'হ্যাঁ, এই হল সার্থক জীবন।'

রাত পোহালেই ....। এই রাতই দাদার জীবনের শেষ রাত। দাদা এখন কি করছেন কে জানে! ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকে রাণী। নক্ষত্রখচিত চন্দ্রালোকিত আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখতেও ইচ্ছা করে না তার। মনে হয় এক দৌড়ে চলে যায় দাদার কাছে, তাঁর পাশে যেয়ে দাঁড়ায়। মনে মনে বলে, দাদা চিরবিদায়ের আগে আর একবার আশীর্বাদ করে যাও — রাণী যেন তোমার দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে পারে।

সারা রাত কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে যায় রাণীর। ভোরের দিকে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সে। রাস্তার বাতিগুলো এক এক করে নিভতে শুরু করেছে। কলকাতা জেগে উঠেছে। পায়ে হেটে অনেকেই চলেছেন গঙ্গার ঘাটের দিকে। দু-একটা ট্রামও চলছে। কোনক্রমে রাণী নিজের দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের দিকে।

সেদিন ছিল ১৯৩১ সালের ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবার। রাণী জেলখানায় হাজির হয়। এই কয়দিনের যাতায়াতে আইরিশ জেলারের সাথে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার। তাকে দেখলেই হেসে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলতেন 'So Late!' দুজনেই হেসে উঠত তারা । দু-একবার তার মুখে ডি-ভ্যালেরার কথাও শুনেছে। লক্ষ্য করেছে, সে যখন রামকৃষ্ণদার সঙ্গে কথা বলত মাঝে মাঝে এসে তিনি ঘুরে যেতেন। তাঁর সাহায্য না পেলে এ ভাবে রামকৃষ্ণদার সাথে সে কথা বলতে পারত! আরও কতভাবে যে তিনি সাহায্য করেছেন! আজ তাঁর মুখটা বিষন্ন গম্ভীর। তাকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। যেন তাঁর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন — 'Your brother is no more'.

দরজার চৌকাঠ ধরে নিজেকে সামলে নিল রাণী। ফেরার পথে কেবলই মনে পড়ে রামকৃষ্ণদার হাস্যোজ্জ্বল শান্ত মুখখানির কথা। একদিন ছেলেমানুষের মত সে প্রশ্ন করেছিল ,'আপনার ভয় করে না দাদা?' প্রশ্ন শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। তারপর হেসে বলেছিলেন, পড়নি কবিগুরুর সেই অমরবাণী —

'যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট-আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মত।'

শুনে মনে হয়েছিল, কোন ধ্যানমগ্ন ঋষি যেন তাঁর সবে পাওয়া অন্তরের সত্যোপলব্ধিকে পরম মমতায় প্রিয়জনকে দান করে যাচ্ছেন। দাদা বলেছিলেন, 'জীবনের প্রতি আমাদের ভীষণ লোভ রাণী,' তারপর খানিক থেমে শুরু করেছিলেন, 'আর ভয়ের কথা বলছ? তুমি তো পথের দাবী পড়েছ । ডাক্তারকে দেখনি। সুমিত্রার শংকার উত্তরে সেই যে তিনি বলেছিলেন—'এক টুকরো দড়িকে ভয় পেলে চলবে কেন?' আমাদেরও ঠিক তাই। মাষ্টারদা বারবার এই জায়গাটা দেখিয়ে বলতেন, ভাল করে বুঝে নিও । বলতেন, আর মাষ্টারদার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। এখনই তো আমার এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করার সময় ভাই। ভয় কিসের?'

শুনে তার মনে হয়েছিল — এমন ছেলেরা থাকতে ভারতের এ দুর্দশা কেন? যে দেশের সন্তান এমন করে মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ করতে পারে সেই দেশকে কতদিন পদানত করে রাখতে পারবে ইংরেজ?

সেদিন চোখের জল চাপতে পারেনি রাণী। দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ। নীরবতা ভেঙ্গে তারপর দাদা বলেছিলেন, 'আমার এই অনুরোধ রাণী, যে দিন শুনবে আমি নেই, সেদিন কিছুতেই চোখের জল ফেলতে পারবে না।'

রাণী ভাবে, সত্যিই তো, সে কাঁদবে কেন —

'বীরের রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা?'

সে কিছুতেই চোখের জল ফেলবে না। কিছুতেই না।

ঠিক ছ'দিন আগে গত বুধবার, দাদা চিঠিতে লিখেছিলেন — "আজ তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমাকে বলেছিলাম সর্দি হয়েছে কিন্তু তখনই ১০২° জ্বর ছিল। দুপুরের দিকে জ্বর বাড়তে লাগলো, প্রায় ১০৪° এর বেশী উঠল। বিছানা নিতে হ'ল কিন্তু তবুও ইচ্ছা হল তোমার চিঠির উত্তর লিখি। কাগজ তখনও পাইনি কাজেই লেখাও হয়নি। এখন রাত আটটা বেজেছে কিন্তু জ্বর এখনও একটুও কমল না। মাথাটা বুঝি এবার ভেঙ্গে যাবে। সারাদিন সকলে হুড়োহুড়ি করেছে, এখন চিঠি লিখতে আমাকে সবাই বারণ করছে। কিন্তু একদিন দেরী হওয়া যে আমার পক্ষে কি তাও বুঝতে পার।"

আর পড়তে পারে না রাণী, বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে, তারপর সামলে নিয়ে আবার শুরু করে, "বাম হাতে মাথায় ice bag চেপে ধরে লিখছি, কিছুতেই সুবিধা পাচ্ছি না। তবু লিখে যাচ্ছি — তোমার কথা না রাখলে যে রাগ

করবে।

.... ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। কত মধুর স্মৃতিই মনের কোণে জোট বেঁধেছে। সে দিন নেই কিন্তু সে সুখের রেশও তো যায়নি, আজ সুর গিয়েছে থেমে তবু — নীরবতায় বাজছে বীণা বিনা প্রয়োজনে।.........

........এখানে আমরা দু'জনে গান করতাম, কয়েকটি কোরাস আমাদের বাঁধা ছিল। বাইরে হলে এমন দুঃসাহস কখনো করতাম না। গানের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত পিঠে বিশ চড়ই পড়ত। কিন্তু এখানে বাধা দেয় না কেউ ....।

এখন তুমি কি করছ জানিনে। হয়ত বই নিয়ে বসেছ কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে তোমার দু'পাতাও পড়া হচ্ছে না। মনটা তোমার কোথায় উধাও হয়ে চলে গেছে, তুমি তাকে বইতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না।

.... আর ত পারছিনে, মাথাটা কেবল টনটন করছে, এবার আমাকে ছুটি দাও।''

এরও কয়েকদিন আগে। সেদিন দুপুর থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। বর্ষা মাথায় নিয়ে সে যখন গিয়ে হাজির হয়েছিল, দাদা খুব খুশী হয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন — 'কি করে এলে! ভেবেছিলাম তুমি আজ আর আসতে পারবে না, যা বৃষ্টি!' তারপর বললেন, 'গতকাল রাত্রে পুটুরাণীকে এই চিঠিটা লিখেছি, এখনও পাঠানো হয়নি, এসো তোমাকে শোনাই।' গম্ভীর ভরাট গলায় দাদা পড়েছিলেন — ''...... পা গুণে গুণে যারা পথ চলছে, সাবধানীর সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে পথের উঁচুনীচু দেখে দেখে তারা শুধু হয়রান হয় না, দৃষ্টি শক্তিও আসে তাদের কমে। আমি চলি শুধু সামনের দিকে চোখ রেখে। পথের ধারে অচেনা গাছের সারিতে, কাঁটাবনের ঝোপে ঝোপে সেকি একটা নেশা! ওপরের নীল আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকে আমাকে। পথের শিউলি ফুলের গন্ধ এসে লাগে নাকে, মনে কি এক সুরের আবেশ ওঠে..........।

বিশ্বাস আমি হারাইনে কখনও। ভোরের আলো দেখা দেবে আমার চোখে। সে সোনালি স্বপন জাগে, তার আশায় আমার পথের বাধা বড় করে দেখিনা, হ্যাঁ, এই চলে বেড়ানোয় বড় সুখ.......... আমি শুধু তারই তালে চলি.........।''

এইটুকু পড়ে দাদা থেমে গিয়েছিলেন। তারপর হেসে বলেছিলেন — 'থাক, এসব একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বোধ হয় তোমার ভাল লাগছে না।' প্রতিবাদ করেনি সে। শেষটুকু শোনার জন্য জোরাজুরিও করেনি। কি করে দাদাকে বোঝাবে, দাদা তার কতখানি। কি করে বোঝাবে, এতদিন যে জীবনে সে অভ্যস্ত ছিল তার ভিত্তিমূলে এই কদিনেই দাদা নাড়া দিয়ে দিয়েছেন। শুধু বলেছিল 'সময় ফুরিয়ে এল দাদা, আজ তবে আসি।' মনে আছে, অন্যদিনের মত দাদা বলেন নি, 'আবার এসো রাণী।'

শেষ দেখা হয়েছিল দু'দিন আগে। পাশে যেয়ে বসতেই হাসিমুখে বলেছিলেন, 'মুখটা এমন শুকনো কেন রাণী?' কোন উত্তর দিতে পারেনি সে। সেদিন সমস্ত সুর, সমস্ত হাসি-আনন্দ-গান-আলোচনা যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। শুধু ছিল নিঃসীম

নৈঃশব্দ। কিছুক্ষণ পরে দাদা বলেছিলেন — 'জেলার সাহেব তোমাকে সব বলেছেন তাহলে। পরশু আমাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু তাতে দুঃখ কি ভাই। এই তো স্বাভাবিক, এই তো আমাদের পাওনা।'

এক দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। লক্ষ্য করে দাদার সমস্ত মুখে যেন একটা আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ছে। মনে পড়ে কোথায় যেন পড়েছিল — 'সত্য যখন মানুষের হৃদয় হইতে উৎসারিত হয়, তখন মনে হয় সে যেন দেহধারণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।' এই প্রথম সে প্রণাম করে দাদাকে। মনে মনে বলে, 'আমি যেন তোমার মতই হতে পারি দাদা। এই আশীর্বাদ কর। আর কিছু চাই না।'

দাদা আর নেই। জ্বর গায়েই ওরা তাঁকে ফাঁসি দিয়েছে। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রাণী। সন্ধ্যা থেকেই প্রবল বর্ষা শুরু হয়েছে। রাণীর মনে হয় প্রকৃতিরাণী যেন তার সুসন্তানের বিয়োগ ব্যথায় অঝোরে অশ্রুপাত করে চলেছে। মনে পড়ে দাদা চোখের জল ফেলতে বারণ করেছিলেন — কিন্তু পোড়া চোখ যে নিষেধ মানে না। স্মৃতি যে কত বেদনার জীবনে এই প্রথম অনুভব করে সে। একদিনের কথা বারবার মনের দরজায় আঘাত করতে থাকে। হাসতে হাসতে সে বলেছিল — 'দাদা, আপনি বুঝি গান পছন্দ করেন না?'

দাদা বলেছিলেন, 'ইংরেজের মহাকবির সেই কথা শোননি? যে গান ভালবাসেনা, সে মানুষও খুন করতে পারে। আমাকে বুঝি এমন পাষণ্ড মনে কর?'

তারপর শিশুর মত আবদার করে বলেছিলেন — 'আর একবার ঐ গানটা শোনাও না রাণী, ঐ যে — অবনত ভারত চাহে তোমারে।'

রাত তখন গভীর। অনেকক্ষণ আগেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। হস্টেলের সবাই গভীর ঘুমে। সরোজিনীও একটু আগে বই বন্ধ করে ঘরে চলে গিয়েছে। বাঁশী হাতে রাণী আস্তে আস্তে ছাদে উঠে যায়। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদের আলো চারিদিক ভাসিয়ে দিচ্ছে। হিমেল হাওয়ার স্পর্শ এসে লাগছে সারা গায়ে। ছাদের কার্নিশের ধারে এসে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে রাণী। বারবার তার কানে বাজতে থাকে — 'ঐ গানটা আর একবার শোনাও না রাণী, ঐ যে ঐ গানটা —'। তারপর বাঁশীতে যে কখন ফুঁ দিয়েছে তা সে টের পায় না। হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা যেন সুরের মূর্ছনা হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে একমনে বাজিয়ে যেতে থাকে —

'অবনত ভারত চাহে তোমারে........'।

সুরের মায়াজাল বিস্তার করে বাঁশি একসময় নীরব হয়। সরোজিনী কখন পাশে এসে বসেছে টের পায় নি সে। তার হাতটা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে সরোজিনী বলে — 'রামকৃষ্ণদা গানটা খুব পছন্দ করত, নারে?' উত্তর দিতে পারে না রাণী, উত্তর দেওয়া যায় না। শুধু বুকের মধ্যে জমাট বাধা অশ্রু কপোল বেয়ে নামতে থাকে।

অনেক দূরের রাস্তার স্তিমিত আলো ব্যথাতুর এই দুই রমণীর মাথায় পড়ে যেন তাদের আশীর্বাদ জানাতে থাকে।

এরপর পড়াশুনায় আর মন বসাতে পারে না রাণী। জেলখানায় বসে দাদার সাথে ডিগ্রী অর্জনের অসারতা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। সে বলত — 'কেন ডিগ্রী অর্জন না করে কি দেশের কাজ করা যায় না? ক্ষুদিরামের কি ডিগ্রী ছিল?' তার উত্তেজনা দেখে দাদা হাসতেন আর বলতেন —

'এসব কথা তোমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নদের মুখেই শোভা পায়। আমরা বললেই লোকে বলবে — Grapes are sour, কি বলবে তো?'

আরও উত্তেজিত হয়ে দাদাকে সে স্বমতে আনবার চেষ্টা করত। দাদা মিটিমিটি হাসতেন। তর্ক করতেন না।

কিন্তু সে সব ছিল তর্ক। এখনকার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। দাদার আত্মদানের পর তার মনে হল — 'এইসব পড়াশুনা ডিগ্রী অর্জনের চেষ্টা, সব কিছু অর্থহীন। সময়ের অপব্যবহার। এই ডিগ্রী দেশের কাজে তাকে কি সাহায্য করবে?'

ঘরে বসে পড়াশুনা করা তার কাছে এখন আত্মপ্রতারণা বলে মনে হয়।

বেথুন কলেজে বেথুন সাহেবের মূর্ত্তি বসানো বড় লাইব্রেরী হলটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে সে বই দেখে আর এইসব চিন্তা করে। আশা নিয়ে অধ্যাপকেরা জিজ্ঞাসা করেন — 'রাণী, পড়াশুনা চলছে কেমন?'

ম্লান হেসে পাশ কাটিয়ে রাণী উত্তর দেয় — 'আপনি ভাল আছেন স্যার?'

---

* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ *

বাবা একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। ম্লান হেসে বলেছিলেন — 'অনার্সটা ছেড়ে দিলি মা।' মা রাগ করে বলেছিলেন — 'তুমি চুপ করো তো। তেতেপুড়ে এলো মেয়েটা, আগে জলটল খেয়ে একটু জিরোক।' সন্তোষ এসে বলল — 'দিদি, আমার লাট্টু।' আদর করে ভাইকে কোলে তুলে নিয়ে সে বলল — 'সব এনেছি তোর জন্য।' ন'মাস পরে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরল রাণী।

রাণীর দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না। একটা স্কুলের এখন প্রধান শিক্ষিকা সে। সেই স্কুলে যাওয়া, প্রাইভেট পড়ানো, মায়ের কাজে সাহায্য করা, ভাই-বোনেদের সাথে কলকাতার গল্প, বাবার সাথে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা, রবিবার বিকালে দীঘির পাড়ে বটতলায় গিয়ে বসা —এই ভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিনগুলো কাটতে থাকে।

মাঝে মাঝে বাড়ীর পিছনের সেই ঢিবিতে গিয়ে বসে রাণী। আজকাল অযত্নে জায়গাটা আবার জঙ্গলে পরিণত হতে শুরু করেছে।

রামকৃষ্ণদার সেই কথাগুলো সব সময় মনে পড়ে —'রাণী আমাদের সবার তল পাবে, তল পাবে না এই মানুষটার, যদি দেখা হয় দু'হাত ভরে গ্রহণ কোরো।' সেদিন কল্পনার মুখে শুনেছিল তার প্রথম দর্শনের অনুভূতির বিবরণ। ''মাষ্টারদার সাথে সাক্ষাতের সেই অনুভূতির কথা বর্ণনা করা আমার সাধ্যের বাইরে। শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভয়, আনন্দ সব কিছু এক সাথে। মনে হ'ল, তাঁর এক মুহূর্তের নির্দেশে বাবা-মা-ভাই-বোন সব কিছু ছেড়ে অনায়াসে চলে আসতে পারি। প্রথম দেখার পর সবাইকে গলা ছেড়ে বলতে ইচ্ছা করত তাঁকে দেখেছি, তাঁর সাথে কথা বলেছি, তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি।'' তার কবে এই সৌভাগ্য হবে? আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে? এই সব ভাবে আর নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয় — 'চিন্তা কোর না রাণী, মাষ্টারদার দেখা তুমি একদিন পাবেই।'

১৯৩২ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে সেই দিন এল রাণীর জীবনে। গভীর নিশীথে পল্লীর কোন এক অন্ধকার জীর্ণশীর্ণ কুটীরে নির্মলদার সাথে দেখা হয়েছিল তার। বিপ্লবীর কি মনোহর রূপই না সেদিন সে দেখেছিল। অন্ধকারে দাদার চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন বিদ্রোহীর মনের আগুন দুই চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বড় বড় চোখ, পিঠে মেশিনের ব্যাগটা ঝুলছে। মুখের কথার চাইতে ঐ তেজোময় কথার ভঙ্গিই সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। তাঁর দুটো চোখ দেখে মনে হচ্ছিল বিদ্রোহীর দৃষ্টি বোধ হয় এরকমই হয়।

অন্ধকার কুটীরের মধ্যে যখন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম একটা অপূর্ব শিহরণ দেহমনে খেলে গেল। আমাকে দেখেও তিনি চুপ করে বসে রইলেন। প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাশের বাঁশবাগানে তখন ঝিঁ ঝিঁ পোকা একনাগাড়ে ডেকে চলেছে।

নীরবতা ভেঙ্গে নির্মলদা বললেন — 'কল্পনার কাছে তোমার অনেক কথা শুনেছি। এবার তো পরীক্ষা দিয়েছ, তা কেমন হয়েছে?'

হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। গভীর নিশীথের অন্ধকার যেন এতক্ষণ বুকের উপর পাষাণভার হয়ে চেপে বসেছিল। নির্মলদার কথায় তা কেটে গেল এক লহমায়। বললাম, 'পাশ করব বলেই তো মনে হচ্ছে'।

হেসে ফেললেন নির্মলদা। তারপর বললেন, 'শুধু পাশ করলে চলবে কেন। তোমার কাছ থেকে তো আমরা আরও অনেক কিছু আশা করি।' তারপর থেমে বেশ খানিকটা চিন্তা করেই যেন বললেন, "আগামী Convocation-এ একটা attempt নিতে পারবে তো?"

হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। মনটা কেমন যেন একটা দুর্জয় অভিমানে ভরে উঠল। কোনমতে নিজেকে সংযত করে বললাম — 'পারব দাদা। কিন্তু আপনারা কি বোনেদের সে সুযোগ দেবেন?'

আমার মনের অবস্থা হয়ত দাদা বুঝতে পেরেছিলেন। সহসা কোন উত্তর দিলেন না। তারপর দৃঢ় কিন্তু ধীর কণ্ঠেই বললেন — 'পাশ করবার পর যে কোন একটা জেলায় কাজ নেবার চেষ্টা করবে। ধরো, ঢাকা, ময়মনসিং, বাঁকুড়া — এইরকম আর কি, কেমন? সেখানকার Magistrate, Comissioner — সবার নাম একেবারে মুখস্থ করে ফেলবে। কখন কোথায় meeting হয় খোঁজ নেবে। সুযোগ খুঁজবে।"

এইটুকু বলে থেমে গেলেন। হঠাৎ যেন বাঁশঝাড়ের মাথার উপর দিয়ে একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। পাশে রাখা গ্লাস থেকে একটু জল খেয়ে দাদা আবার বলতে শুরু করলেন — 'মাষ্টারদার ইচ্ছা, এবার একটা বুদ্ধির লড়াই হোক।" তারপর দৃঢ়প্রত্যয়ের সুরে বললেন — "যাবার আগে আর একটা কিছু আমাদের করে যেতে হবে।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্মলদার কথাগুলো শুনছিলাম। বোকার মত প্রশ্ন করলাম, "দাদা আমি তো কিছুই জানিনা, কাজ করব কি করে?"

স্নেহের দৃষ্টিতে দাদা আমার দিকে তাকালেন। আধো আলো আধো অন্ধকারে দাদার মুখে দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল — 'আমি পেয়েছি, আমি দাদার আশীর্বাদ পেয়েছি।'

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন — "প্রয়োজন মত এখানে আসতে পারবে তো?"

বললাম, 'পারব'।

দাদা বললেন, 'বাড়ী'?

বলতে ইচ্ছা হল, আপনারা ডাকলে কোন বাধাই আমাকে আটকাতে পারবে না। কিন্তু কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দাদা বললেন, 'রামকৃষ্ণ কিছু বলেনি আমাদের সম্পর্কে?' অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। কত কথা বলেছেন। নির্মলদা সম্পর্কে কত কথা! প্রায়ই বলতেন — নির্মলদা খুব বুদ্ধিমান। He is the

last man to be captured কিন্তু কোন কথাই গুছিয়ে বলতে পারে না সে। শুধু বলে, 'রামকৃষ্ণদা বলতেন, আপনি খুব বুদ্ধিমান।'

শুনে হেসে ওঠেন নির্মলদা। তারপর মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে সংবরণ করে বলেন — 'এই সব বলেছে তোমাকে? একদম বিশ্বাস করবে না। আমাদের যত বুদ্ধি সব হল মাষ্টারদার মাথায়। বুদ্ধি বল, শক্তি বল, সাহস বল — সব হল মাষ্টারদা।'

সাহস করে বললাম, 'মাষ্টারদার দেখা কবে পাব দাদা?'

উত্তর না দিয়ে দাদা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আর দেরী করা ঠিক হবেনা রাণী। তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে।'

এরপর কেটে যায় বেশ কয়েকদিন। সেদিনের নৈশ অভিযান তার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। নির্মলদার কথাগুলোই বার বার ভেবেছে সে। বলেছিলেন, তিন সপ্তাহ পরেই আবার ডেকে পাঠাবেন। কিন্তু যদি ভুলে যান। যদি আর দেখা না হয়! আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয় — 'তা কি হয়? এসব মানুষের এমন ভুল হতে পারে?' সময় হলে দাদা নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাবেন।

কিন্তু দিন যেন আর কাটতে চায় না। প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমী তাকে পাগল করে তোলে। মনে হয় সে যেন এখনই ছুটে যায় মাষ্টারদার কাছে। তাঁব পাশে যেয়ে দাঁড়ায়। আবার নিজেকেই বোঝায়, অত উতলা হোয় না, ধৈর্য ধর। মাঝে মাঝে মার চোখে সে ধরা পড়ে যায়। মা হেসে বলেন, 'অত কি আজকাল ভাবিস খুকী?' রাণী হেসে পাশ কাটিয়ে উত্তর দেয়, 'তোমার হাতের খিচুড়ী অনেকদিন খাইনি মা।' মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন প্রতিভাদেবী। তারপর প্রবেশ করেন রান্নাঘরে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হোল। আবার ডাক পড়ল তার। চাঁদের আলোতে যখন নৌকা স্রোতের উপর ভেসে চলছিল, মনে পড়ছিল রামকৃষ্ণদার কথা। নৌকা ভেসে চলেছে। চারদিকের গাছপালা মাঠঘাট চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল আমার জীবন এবার সার্থক হতে চলেছে। আমি জেগে স্বপ্ন দেখছি।

অনেক রাতে একটা কুটীরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নির্মলদা উঠানে পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন। বললেন, 'খুব ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? এত দেরী দেখে আমরা তো চিন্তায় পড়েছিলাম।' তারপর তাকে সিঁড়ির কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন — 'আমরা বলেছি তুমি আমার বোন। মাসীর কাছে সেই পরিচয় দিও।'

তারপর শিশুর মত সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, 'তোমার হাতে শাঁখা নেই, কপালে সিন্দুর নেই, মাসী যদি সন্দেহ করেন?'

পুকুর থেকে জল এনে দিয়ে দাদা বললেন, 'হাত মুখ ধুয়ে ঘরে যাও। মাষ্টারদা আজ এখানেই আছেন।'

বুকের ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায় তার। মাষ্টারদা আজ এখানে আছেন! সে তাঁর দেখা পাবে! নিজেকে আর সংবরণ করতে পারে না রাণী। আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে — 'মাষ্টারদার দেখা আজ পাবতো দাদা?' তার আবেগ মথিত কণ্ঠস্বর স্পর্শ করে যায় দাদাকে। মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'হ্যাঁ', তারপর অতি দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে যান।

সেই রাতের কথা ভোলা যায় না। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তার জীবনে। ঘরে ঢুকে দেখলাম, মাষ্টারদা দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের এক কোণায় জ্বলতে থাকা প্রদীপের স্তিমিত আলো একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নির্মলদা বললেন, 'প্রণাম কর।'

প্রণাম করে পাশে যেয়ে দাঁড়াতেই হাত ধরে কাছে এনে বসালেন। তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল -- এই সেই মানুষ, যাঁর কাছে মনের সব কথা উজাড় করে দেওয়া যায়। মনে পড়ল প্রথম দেখার দিন কল্পনার অনুভূতির কথা। 'তাঁর এক কথায় সব তুচ্ছ করে ঘর ছেড়ে চলে আসতে পারি'। মনে হচ্ছিল আমি যেন জেগে স্বপ্ন দেখছি। একটা অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি আমার সমগ্র সত্ত্বাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি তাঁর এক কথায় কত যুবক ঘর বাড়ী বাবা-মা — সব ছেড়ে সংগ্রাম সমুদ্রে অবহেলায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। তাকিয়ে দেখলাম — ক্ষীণদেহ, শ্যামবর্ণ, উন্নত ললাট, গাম্ভীর্য মিশ্রিত প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ; শান্ত সমাহিত মুখে মৃদু হাসি, চোখ দুটি উজ্জ্বল। সব সময় যেন ভরসা দিচ্ছেন, আশা যোগাচ্ছেন। মনে হল এইবার আমার জীবন সার্থক হবে। আমি ধন্য হব।

কথা শুরু করলেন মাষ্টারদা।

'শুনেছি, তুমি অনেকবার রামকৃষ্ণর সাথে দেখা করেছ। আজ তোমার মুখ থেকে ওর কথা শুনব।'

চোখ বুঝলে এখনও রামকৃষ্ণদাকে দেখতে পাই আমি। তাঁর শিশুসুলভ সারল্য, তাঁর অনন্ত দেশপ্রেম আমাকে অন্য জগতের সন্ধান দিয়েছে। সেই রামকৃষ্ণদা সম্পর্কে মাষ্টারদা জানতে চাইছেন। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব ভেবে পাই না। মাষ্টারদা মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। নির্মলদা মাদুরের উপর বসে মাথা নীচু করে আছেন। শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে শুরু করলাম —

'যেদিন জানতে পারলাম রামকৃষ্ণদা আলিপুর জেলে আছেন; সেদিন থেকে তাঁর সাথে দেখা করার কথা আমি ভেবেছিলাম। প্রথম দিন দেখা করতে গিয়েছিলাম বিকালে। আমাকে দেখে দাদা অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার তো কোন বোন

নেই কলকাতায়। যখন খবর পেলাম বোন দেখা করতে এসেছে, আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। তারপর হেসে বলেছিলেন — আমাদের মত ভয়ঙ্কর লোকের সাথে দেখা করতে এসেছ, তোমার সাহস তো কম নয়! ধীরে ধীরে জানতে চাইলেন, কোথায় থাকি, কি পড়ি, কেন এসেছি — এইসব। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া বিশেষ কিছু বলতে পারি নি। বিদায় নিয়ে যখন চলে আসি, বলেছিলেন, আবার আসছ তো? এইভাবেই শুরু। বলতে বলতে গলা ধরে আসে। তার দিক থেকে মুখ সরিয়ে জানালা দিয়ে দূরের জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন মাষ্টারদা। নির্মলদা হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছেন। নিভু নিভু প্রদীপের সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে শুরু করলাম —

'দাদা বই পড়তে বড় ভালবাসতেন। প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীতে এত জানবার আছে, আগে জানতাম না। একদিন আমি প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, যদি একবার এই গারদখানার বাইরে যেতে পারতাম, তবে I shall declare equal right to brothers and sisters প্রায়ই বলতেন, No revolutionary can die with satisfaction জীবনের প্রতি তাদের বড় লোভ।' নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না সে। চোখের জল অঝোর ধারায় ঝরতেই থাকে। এসব অগ্রাহ্য করেই আবার শুরু করে, 'ছোট বয়সে ক্ষুদিরাম, কানাইলালের জীবনী পড়েছিলাম; কিন্তু এই প্রথম চোখে দেখলাম মৃত্যুভয়হীন মানুষ কি রকম। আমরা সবাই জানতাম, একটা দিন যাচ্ছে, তাঁর বিদায়বেলাও এগিয়ে আসছে, কিন্তু এসব নিয়ে তাঁর কোন চিন্তা ছিল না। দিব্যি হাসছেন, খেলছেন, গল্প করছেন, গান গাইছেন, বই পড়ছেন। একদিন তাঁর সামনে কেঁদে ফেলেছিলাম। সেদিন তাঁর খুব জ্বর। কথা কইতেও কষ্ট হচ্ছিল। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন — কতদিন বেঁচে থাকলাম এটা বড় কথা নয় রাণী। কেন বাঁচলাম, কাদের জন্য বাঁচলাম — এটাই আসল। এটাই বড় কথা। দুঃখ কিসের বোন!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়েন মাষ্টারদা। ম্লান হেসে বলেন — 'সত্যিই তাই। মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকাই তো আসল কাজ।' খানিকপরে বললেন — 'লক্ষ্য করতাম, ও যখন কাউকে প্রণাম করত, মাথা নত করত না। মাথা নীচু করাকে ঘৃণা করত রামকৃষ্ণ।'

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় রাণী। রাত তখন শেষের দিকে। সাবিত্রী মাসী অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। নিস্তব্ধ রাতের জ্যোৎস্নাময় প্রকৃতি একটা রহস্যময় পরিবেশ রচনা করেছে। বাগানের গাছগুলির পাতা ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁপছে। তার পেলব স্পর্শ এসে লাগছে চোখে মুখে। রাণী ভাবতে থাকে জীবনের পূর্ণতার পথে এই তার চলা শুরু। সে মাষ্টারদার দেখা পেয়েছে। তাঁর আশীর্বাদের স্পর্শ সারা মন জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কি শান্ত, কি কোমল, কি দৃঢ় এই মানুষটা!

কত কথাই না শুনেছে তার সম্পর্কে। বুড়ো মালি সেজে পুলিশের বেড়াজাল ভেদ

করে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সন্ন্যাসী সেজে গ্রামের লোকের সাথে কথা বলেছিলেন, পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গ্রামের পর গ্রাম পাড়ি দিয়েছিলেন — এমনি কত সব কথা। ঠিক যেন পথের দাবীর গিরীশ মহাপাত্র। অনেকে গল্প করত সূর্য সেন মন্ত্র জানে, ধরা পড়বে না কোনওদিন। ধরতে এলেই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

তার ও কল্পনার কথা মনে পড়ে যায়। তারা তখন সবে পথের দাবী পড়েছে। বিপ্লবী জীবনের স্বপ্ন, কল্পনা, বীরত্ব, ত্যাগ তাদের প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চিত করছে। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটা। যেখানে সব্যসাচী প্রবল দুর্যোগের মধ্যেও পথ ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁটাবন ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। 'সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পথহীন পথে বিপুল বোঝার ভারে একজন আনতদেহে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছে, এবং অপরে বিরাট পাগড়ীর নীচে প্রচণ্ড বারিপাত হইতে যথাসম্ভব নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে।' অনেক কষ্টে গড়ে তোলা সংগঠন ছিন্নভিন্ন। দুর্দিনের সাথীরা কেউ বিশ্বাসঘাতক, কেউবা নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনের সন্ধানে ব্যস্ত। এরই মাঝে সব্যসাচী পথ চলছেন যেন 'চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন, শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন।' মনে পড়ে মাঝে মাঝে কল্পনা বলত — 'আমাদের মাষ্টারদা ডাক্তারদার চেয়েও বড়।' সেও সায় দিত এই কথায়।

ভোরের আলো এসে মুখের উপর পড়তেই ঘুম ভেঙে যায় রাণীর। তাকিয়ে দেখে মাসী বিছানায় নেই। ধড়মড় করে সে উঠে বসে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে, মাসী উঠানে গোবর জলের ছড়া দিচ্ছেন। রাণীর মনে হল, সব বাড়ীর মায়েরাই একই রকম।

একটু পরে নির্মলদা এলেন। বললেন, 'দোতলায় চল, একটু গল্প করিগে।' দোতলায় এসে দেখল, নির্মলদা অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। রাণী হেসে বলল, 'এই আপনার গল্প!' নির্মলদা বললেন, 'এই দিয়েই তো আমরা গল্প তৈরী করি।'

একটু বেলায় ডাক পড়ল মাষ্টারদার ঘরে। তিনি তখন একটা বই উল্টে পাল্টে দেখছিলেন। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বইটা পাশে সরিয়ে রাখলেন। পূবের খোলা জানালা দিয়ে সকালের মিঠে রোদ মাষ্টারদার কপালে এসে পড়ছিল। ঘরময় ইতস্তত বই ছড়ানো। টেবিলের উপর ফুলদানীতে ফুলগুলি অনেকটা ম্লান। দূরের পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কাঁটাঝোপ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। তাকে পাশে ডেকে নিয়ে বইটা দেখিয়ে বললেন, 'পড়েছ?'

হাতে নিয়ে রাণী দেখে ডান ব্রেনের 'My fight for Irish freedom'. বইটা নামিয়ে রেখে মাথা নাড়ে রাণী।

বইটার উপর হাত বুলাতে বুলাতে মাষ্টারদা বললেন, 'পড়ে দেখো। মহান মানুষ এই ডান ব্রেন। অন্ধকার রাতে সমুদ্রতীরে বসে একদিন সহযোদ্ধাদের বলেছিলেন, Life of a revolutionary is full of dream, কি চমৎকার কথা, না? বিপ্লব ও বিপ্লবী যেন মিলেমিশে একাকার। এই রকম না হলে কি মানুষকে বিপ্লব ভাবনায় পাগল করে দেওয়া যায়?'

তারপর খানিকটা ভেবে বললেন — 'আমার কি মনে হয় জান? দেশপ্রেমে, ত্যাগের ক্ষমতায়, চিত্তের ঔদার্যে, হৃদয়ের প্রশস্ততায় এঁদের সমকক্ষ পাওয়া ভার। আমাদের সাধনা হবে এদের মত জীবন গড়ে তোলার।' মাষ্টারদা যখন এইসব বলছিলেন তখন একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন নির্মলদা। হাসতে হাসতে বললেন — 'দেখেছেন কি প্রচণ্ড উদ্যমে এক অহিংসপন্থী নেতা আমাদের গালি দিয়েছেন। এর হাজার ভাগের এক ভাগ উদ্যম যদি ওরা ইংরাজের বিরুদ্ধে দেখাতেন।'

নির্মলদার কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেললেন মাষ্টারদা। বললেন, 'এই তো স্বাভাবিক নির্মলবাবু। আমাদের ওরা গালি তো দেবেই। শোনেননি অহিংসা ওদের creed. আর এই creed রক্ষা করতে গিয়ে যদি দেশকে হাজার বছরও ইংরাজের পায়ের তলায় থাকতে হয় তাতেও ওদের আপত্তি নেই।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন মাষ্টারদা। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, 'যুগে যুগে রক্ত রাঙ্গা পথেই বিপ্লবকে আবাহন করতে হয়। এই তার বর, এই তার অভিশাপ। এ দেশের ক্ষেত্রে এর অন্যথা হবে তার উপায় কি।' তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'শুধুই বকে চলেছি।' নির্মলদাকে বললেন, 'রাতের কর্ম্মসূচী ঠিক আছে তো নির্মলবাবু।'

সেদিন দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি এল। টিনের চালে বৃষ্টির একটানা ঝমঝম আওয়াজ রাণীর বেশ ভাল লাগছিল। সকালবেলায় নির্মলদা যেন কোথায় বেরিয়েছিলেন, বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে ফিরে এলেন। একেবারে কাকভেজা ভিজে গেছেন। গামছা নিয়ে সামনে দাঁড়াতেই হেসে বললেন, 'দেখেছ, কি অবস্থা।' বর্ষা একটু কমলে দাদা এলেন তার ঘরে। বললেন, 'তৈরী হয়ে থেকো, সন্ধ্যার পর বেরোতে হবে।'

তারপর মেশিনটা বের করলেন। বললেন, 'কোনদিন দেখেছ?' বললাম, 'দেখেছি, খুব ছোট একটা।' দাদা এক এক করে বলে যেতে লাগলেন, মেশিনের কোন পার্টকে কি বলে, কি করে গুলি ভরতে হয় — এইসব। তারপর সব বন্ধ করে মেশিনটা পাশে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

বর্ষা থেমে একটু রোদ উঠেছে। আকাশে অল্প অল্প মেঘের আনাগোনা তখনও চলছে। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল। একটা চাদর বের করে নির্মলদা বললেন, 'গায়ে দিয়ে নাও।' দাদার হাত থেকে চাদর নিয়ে বললাম, 'একটু গল্প বলুন না দাদা।' দাদা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'গল্প? এই চট্টলার বুকে কত বীরের কত গল্পই না তৈরী হয়ে আছে।' লক্ষ্য করলাম, ব্যথায় দাদার মুখটা অন্যরকম হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম, দাদা নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করছেন। তারপর বললেন, 'আজ তোমাকে বীরেনের গল্প শোনাব।'

'তখন টাকার চিন্তায় মাষ্টারদার ঘুম হয় না। যুব বিদ্রোহকে সফল করতে গেলে

কমবেশী পনেরো হাজার টাকা দরকার। কিন্তু টাকা কোথায়? মাষ্টারদা ঠিক করেছিলেন, এই টাকা জোগাড় করার জন্য ডাকাতি করা হবে না, কারণ তাতে মূল কাজ ব্যাহত হতে পারে। বরং কর্মীরা সবাই বাড়ী থেকে অর্থ বা অলংকার সংগ্রহের চেষ্টা করুক। অনেকেই নানাভাবে অর্থ ও অলংকার এনে দিতে লাগল।

একদিন দুপুর বেলায় বীরেন এসে হাজির। উস্কোখুস্কো চুল, মনে হয় বেশ কয়েকদিন স্নান খাওয়া দাওয়া হয়নি। মাষ্টারদা তখন সবে বাইরে থেকে ফিরেছেন। বীরেনের চোখে জল দেখে মাষ্টারদা তাকে কাছে টেনে বসালেন। একটু একটু করে তার সব কথা জেনে নিলেন। বীরেন বলল — বহু চেষ্টা করেও সে কিছু জোগাড় করতে পারেনি। কাল রাতে বাক্স ভেঙ্গে পেয়েছে এই রূপোর বালা। মা-র আর কিছু নেই। এতে তো দু-চার টাকার বেশী পাওয়া যাবে না। তাহলে আমি কি কাজে যেতে পারব না, মাষ্টারদা? মাষ্টারদার চোখেও তখন জল। বীরনের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, — 'কেন পারবে না ভাই। কাজে যোগ দেওয়ার অধিকার কারও চেয়ে তোমার কম নয়।'

দাদা চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, 'এই রকম কত গল্পই না সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন।' অনেকক্ষণ পরে বললেন — 'এই জীবনে কত মানুষের ভালবাসাই না আমরা পেয়েছি। একজন মুসলিম মায়ের কথা শুনেছি অম্বিকাবাবুর মুখে। বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠত। তোমাকে তো বলেছি, মৃত ভেবে অম্বিকাবাবুকে আমরা জালালাবাদ পাহাড়ে রেখে এসেছিলাম। পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরলে অতি কষ্টে একজন মুসলিম গ্রামবাসীর সহায়তায় তিনি শেষপর্যন্ত এসে ওঠেন বৃদ্ধা ফয়জুন্নেসার বাসায়। পুত্রস্নেহে যে সেবা তিনি করেছিলেন তা ভোলার নয়। মাষ্টারদা শুনে বলেছিলেন, এই তো বাংলার মায়েদের আসল পরিচয়। এখানে জাত নেই, ধর্ম নেই।

মাষ্টারদা তারপর বলেছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলিম ভায়েরা পিছিয়ে আছে একথা ঠিক। কিন্তু একদিন ওরা এই সংগ্রামে হাজারে হাজারে অংশগ্রহণ করবে, এই আমার বিশ্বাস। দলের কর্মী আবদুস সাত্তার, মীর মহম্মদ এদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, আর এই জাগরণের কাজে তোমাদেরই কিন্তু ভগীরথের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।'

সন্ধ্যার পরপরই হ'ল না। কি কারণে যেন নির্মলদার ফিরতে রাত হয়েছিল। খাওয়া দাওয়ার পর বেশী রাত করেই বের হলাম Targetting-এ। আমি যখন পুরুষের পোষাক পরে দাদার সামনে হাজির হলাম, সে কি হাসি! হাসতে হাসতে বললেন, 'রাণী তোমাকে তো মেয়ে বলে মনেই হচ্ছে না। একটা ছোট ছেলের মত লাগছে।' বললাম, 'তাহলে আমি আপনার ছোট ভাই।' দলে ছিলাম আমরা পাঁচজন। কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল, 'আমরা তাহলে পঞ্চপাণ্ডব।'

যখন মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল জ্যোৎস্নাদেবী যেন অতি সন্তর্পণে তাঁর রূপালী আঁচল পৃথিবীর বুকে পেতে রেখেছেন। ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়া বইছিল। কি ভালই যে লাগছিল।

নির্মলদা বললেন, 'Absconding life এ এরকম অভিযান আর হয়নি'।

ফিরবার পথে সবাই বসলাম মাঠের মধ্যে। দাদা বললেন, 'এস. সোনার বরণী রাণী. এই গানটা জান?' মাথা নাড়লাম আমি। 'তাহলে অন্য একটা গান শোনাও'। সেদিন কি যে হয়েছিল আমার। দাদা কত অনুরোধ করলেন, কিন্তু অদৃশ্য একটা হাত যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল, কিছুতেই গাইতে পারলাম না। দাদা হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, আর একদিন হবে।'

তারপর বললেন, 'দেখি তুমি কেমন দৌড়াতে পার। একটা দৌড় দাও তো।' অনেকদূর দৌড়ে গিয়ে যখন ফিরে এলাম, দাদা বললেন, 'বাঃ! বেশ দৌড়তে পার তো, action এর সময় কিন্তু এইভাবে দৌড়তে হবে।'

যখন প্রায় গ্রামের কাছে চলে এসেছি দাদা বললেন, 'সবাইকে ছেড়ে চলে এসেছ, খারাপ লাগছে না?' কোন উত্তর দিতে পারলাম না। নীরবে পথ চলে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন ভোর হয়ে এসেছে। দেখলাম, জানালা দিয়ে মাষ্টারদা তাকিয়ে আছেন। আমাদের দেখে ধীরে ধীরে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলাম, রাত জেগে তিনি আমাদের আসার অপেক্ষায় বসে ছিলেন।

পরদিন সকাল বেলায় আবার ডাক পড়ল মাষ্টারদার ঘরে। দেখলাম, তিনি পুরানো একটা খবরের কাগজ মেলে ধরে একমনে কি দেখছেন। আমাকে দেখে হাসলেন। কাগজটা পাশে সরিয়ে রেখে আদর করে কাছে ডেকে বসালেন, বললেন, 'আমি কি রকম স্বার্থপর দেখেছ! শুধু নিজের কথাই ভাবছি। তোমার কথা তো কিছুই শোনা হয়নি।' তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ীতে কি বলে এলে?' বললাম, 'সীতাকুণ্ডে যাচ্ছি, বন্ধুর বাড়ীতে।' দাদা এক এক করে জেনে নিলেন বাবার কথা, মার কথা, ভাই-বোনেদের কথা। বললেন, 'সেদিন তোমার আসতে দেরী হওয়ায় খুব চিন্তা হচ্ছিল। ভাবছিলাম, আসতে বললেই তো তুমি আসতে পারবে না, মেয়েদের যে কত বাধা!' অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এই বাধা তোমাদের অতিক্রম করতেই হবে, কি পারবে না?' বলতে ইচ্ছা হল, — 'পারব, পারব, খুব পারব দাদা', কিন্তু কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম। আসার সময় পুরানো কাগজটা হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার কাছে রেখে দাও।'

ঘরে এসে দেখলাম, একটা খবরের নীচে লাল কালির দাগ দেওয়া।

"ফাঁসি কাষ্ঠে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

কালীঘাট অঞ্চল হইতে টেলিফোনযোগে খবর পাওয়া গেল যে, গতকল্য রাত্রি ১ ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।"

খবরের পাশে রামকৃষ্ণদার ছোট একটা ছবি।

মাষ্টারদার দেওয়া এই সম্পদ বাক্সের মধ্যে রেখে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, নির্মলদা দ্রুতপায়ে বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'তৈরী হয়ে থেকো রাণী, আজ বিকেলেই রওনা হতে হবে।'

ওঁদের আশীর্বাদ মাথায় করে, ওঁদের দেওয়া শক্তি বুকে ধরে সেদিন ফিরে এসেছিলাম। এই দুটো দিন আমার জীবনটাকে যেন একেবারে পাল্টে দিল। বারবার নিজেকে বলতে থাকলাম, 'তুমি পারবে, তুমি পারবে রাণী।'

---

* সপ্তম পরিচ্ছেদ *

কিছুদিন পর আবার ডাক পেলাম। যেদিন যাওয়ার কথা, সকাল থেকে কি বৃষ্টি! বাড়ীর টিনের চালের একটানা ঝমঝম আওয়াজ সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে দিচ্ছিল। এই বৃষ্টি দেখে মাষ্টারদা যদি লোক না পাঠান! যদি মনে করেন, আজ থাক্। তাহলে?

কাল রাতেই মাকে বলে রেখেছিলাম, সীতাকুণ্ড যাব। সকাল থেকেই মা বন্ধুদের জন্য খাবারের আয়োজন করতে লেগে গিয়েছিলেন। বললাম, 'নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমন কিছু কোর না।'

কাপড়চোপড় সব ঠিক করে রাখলাম। তারপর ঘর বার করতে লাগলাম। কিন্তু লোক আর আসে না। শেষ পর্যন্ত এল বিকাল ৫টার সময়। মাকে প্রণাম করে যখন রওনা হলাম তখন অপূর্ব একটা অনুভূতিতে মন পূর্ণ হয়ে উঠল। আনন্দ অন্য বারেও হয়েছে, কিন্তু এবারের আনন্দ যেন একটু অন্যধরনের। কেন কে জানে!

সন্ধ্যা তখন ঘোর। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। চারিদিকে ব্যাঙের ডাক। এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে পথ চলতে হচ্ছে। কিন্তু এসব কোন কিছুর দিকেই লক্ষ্য দেওয়ার সময় নেই। একটাই শুধু চিন্তা — কখন গিয়ে পৌঁছব, কখন আবার দেখা পাব মাষ্টারদার।

যখন গিয়ে পৌঁছলাম, শুনতে পেলাম, একটা প্রাণমাতানো অফুরন্ত উচ্ছল হাসি। নির্মলদা বললেন, 'এই হল সেই অপূর্ব সেন, যার সাথে রামকৃষ্ণ তোমায় আলাপ করতে বলেছিল। এমন প্রাণোচ্ছল ছেলে তুমি দুটি পাবে না।' দেখলাম, একখানা সহাস্য কচিমুখ, অন্তরের সরলতা মুখখানাতে ফুটে উঠেছে।

নির্মলদা বললেন, 'ও হল মাষ্টারদার assistant, বেশ ইংরাজী জানে। যা কিছু লেখা হয়, মাষ্টারদা ওকে দেখিয়ে নেন।' তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'ও এমন কাণ্ড করে না, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। একদিন কি করেছে শোন। এর মধ্যে ও বাড়ী গিয়েছিল। বাড়ীতে ওর সাতজন বৌদি। সবাইকে ডেকে বলল — লাইন দিয়ে দাঁড়াও, প্রণাম করব। এতও মাথায় আসে ওর।'

খাবারের যে টিনটা নিয়ে গিয়েছিলাম, মুহূর্তের মধ্যেই সেটা শেষ হয়ে গেল। মাষ্টারদা একটা নারকেলের সন্দেশ বের করে খেলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন — 'খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। একটু বিশ্রাম কর, তারপর কথা হবে।'

সেদিন রাত্তিরে বিশেষ কোন কথা হয়নি। মাষ্টারদা নির্মলদা দু'জনেই বের হয়ে গেলেন। আমি নির্মলদাকে বললাম, 'আমাকে নিয়ে যাবেন না?' শুনে দাদা হাসলেন, তারপর বললেন, 'আর একদিন নিয়ে যাব।'

সেদিন সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম। কাদার মধ্যে এতটা পথ হেঁটে ক্লান্ত ছিলাম। সাবিত্রী মাসী অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। কিন্তু আমার চোখে ঘুম ছিল না। ছাদে

কেবলই মচমচ শব্দ হচ্ছিল আর থেকে থেকে ভেসে আসছিল 'হো হো' হাসির আওয়াজ। এ নিশ্চয়ই ভোলা। এত হাসতে পারে ছেলেটা! মাঝে মাঝে আবার 'ভাল্লাগে না' বলে একটা টান দেয়। ভোলার জ্বালায় কিছুতেই ঘুমতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দেখলাম আকাশটা কাল মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই হয়ত বৃষ্টি নামবে। আসার সময় মঞ্জুর জ্বর দেখে এসেছিলাম। এখন কেমন আছে কে জানে? পিঠে কার স্পর্শ পেয়ে তাকিয়ে দেখি, মাসী দাঁড়িয়ে আছেন, বললেন, 'এখন শুয়ে পড় খুকী, ভোরেই তো উঠতে হবে।'

সকালবেলায় ঘরে বসে আছি, ভোলা এসে ঢুকলো হৈ হৈ করে। হাতে গতকালের আনা একটা খাবারের টিন। মাতামাতি করে সবাই খেতে লাগলেন। কি আনন্দই যে হচ্ছিল! মানুষকে খাইয়ে যে এত আনন্দ তা কি আগে জানতাম? দাদাকে বললাম, 'কি সুন্দর ওর হাসি, দেখেছেন?' দাদাও হাসতে হাসতে বললেন, 'হাসিটা মারাত্মক ছোঁয়াচে ভাই, ও থাকলে আমরাও না হেসে পারি না'। তারপর বেশ গর্ব করে বললেন, 'এরকম ছেলে আরও দু'একটা থাকলে দেশ আলো করে রাখতে পারতো।'

সেদিন সারা দুপুর দাদা আমাকে মেশিন ট্রেনিং দিলেন। কি করে কাপড়ের মধ্যে লুকাব, তারপর হঠাৎ বের করব, কি করে aim করতে হয় — একে একে সব শিখিয়ে দিতে লাগলেন। দাদা আমাকে মধ্যমা দিয়ে practice করালেন। বললেন, 'এই আঙ্গুল দিয়েই তোমাকে action করাব। কিন্তু কাউকে এটা বলবে না। এটা secret। শুধু জানব আমি আর তুমি। তারপর action হয়ে গেলে সবাই জানবে।'

বললাম, 'আগেরবার তো এই আঙ্গুল দিয়ে practice করান নি?'

দাদা হাসতে হাসতে বললেন, 'তখন মাথায় আসেনি।'

বিকাল বেলায় শুরু হল গল্প। নির্মলদা আর আমি গিয়ে বসলাম দোতলার ঘরে। পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিতেই লালচে আলো এসে সারা ঘরটা ভরিয়ে দিল। একটা মাদুর পেতে দিতেই দাদা ধপ করে বসে পড়লেন। হাসতে হাসতে বললেন — 'আজ খুব খাটিয়েছ তুমি।' আবদারের সুরে বললাম, 'এবার আপনাদের কথা একটু বলুন না দাদা।' দেখলাম, ব্যথায় যেন দাদার মুখ ম্লান হয়ে গেল। আমার দিক থেকে মুখ সরিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। তারপর বললেন, 'জান রাণী, সেদিন জালালাবাদ পাহাড়ে লড়াইয়ের সময় মনে হয়েছিল, দেশের সমস্ত মানুষ যেন আমাদের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করছে। আনন্দকে আমরা টুলু বলে ডাকতাম। ও আর ট্যাগরা সব সময় এক সাথে থাকত। সদরঘাট আলো করে থাকত ওরা। জীবনেও ওরা একসাথে থাকত, মরণকেও ওরা বরণ করল একসাথে।' কথাগুলো দাদা অনেক কষ্টে শেষ করেন। ঘরের মধ্যে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই অন্ধকারেই দেখতে পেলাম দাদার চোখ দুটো চিকচিক করছে।

কতবার কত লোকের মুখে শুনেছি বিপ্লবীরা নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, তাদের দয়া নেই,

মায়া নেই, স্নেহ-প্রীতি নেই — কিন্তু এটা যে কতবড় ভুল তা তারা বুঝতেও পারে না। এঁদের ভিতর কি বিপুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে তার খবর পাওয়ার সৌভাগ্য কজনেরই বা হয়।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দাদা বললেন — 'এই সব মহাপ্রাণ মাষ্টারদার সৃষ্টি। তাই তাঁকে এত ভালবাসি।' ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে। মাসী তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরে ফিরছিলেন। দাদা বললেন, 'যাও রাণী, মাসীকে একটু সাহায্য কর।'

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে যখন ঘরে এসে ঢুকলাম, শুরু হল প্রবল বৃষ্টি। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে প্রবল শব্দে বাঁজ পড়ছিল। এরপর শুরু হোল ঝোড়ো হাওয়া। মনে হচ্ছিল, চারদিকের গাছপালা টিনের চালের উপর ভেঙ্গে পড়ে আমাদের চাপা দেবে। দেখলাম, মাষ্টারদা নির্মলদা এর মধ্যে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নীচে নেমে এসেছেন। দাদার হাতে একটা ছাতা, মাষ্টারদার হাতে কিছুই নেই। বললাম, 'এর মধ্যে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?' দাদা একটু হাসলেন। বললেন — 'বাইরে।'

রাতের অন্ধকারে দুর্যোগের মধ্যে ওঁরা রওনা হলেন।

সেদিন ছিল ১৩ই জুন, ১৯৩২। সকালবেলায় উঠে দেখি তখনও আকাশ ভার, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দেখলাম মাষ্টারদা নির্মলদা তখনও ঘুমচ্ছেন। হয়ত অনেক রাতে ফিরেছেন। আমি নির্মলদার ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। দাদা উঠলেন অনেকক্ষণ পরে। আমাকে দেখেই বললেন, 'কখন এসে বসে আছ, একদম টের পাই নি।'

আমাকে ভোলার জন্য সাগু জ্বাল দিতে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন সাগু জ্বাল দিচ্ছি, ভোলা তখন ঘরের ভিতর গুনগুন করে গান গাইছিল। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' সাগুটা ঠাণ্ডা করে লেবু আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম।

সারাদিনটা কেটে গেল মাষ্টারদার সাথে আলোচনায়। আলোচনার আনন্দে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে কখন যে রাত গভীর হয়েছে তা টেরই পাইনি। এমন সময় ডাক পড়ল ভাত খাওয়ার। নির্মলদা আগেই বলে দিয়েছিলেন, ভাত খাবেন না। আমি বরাবর নির্মলদার সঙ্গে খেতাম। মাষ্টারদার সঙ্গে ভাত দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে চলে গেলাম।

নির্মলদা একা চুপ করে শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে বললেন — 'কি ব্যাপার?' বললাম, 'মাষ্টারদার সাথে খেতে দিয়েছে দেখে লজ্জায় পালিয়ে এসেছি। পালিয়েছি বলে আরও লজ্জা করছে। মাষ্টারদা নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন।' নির্মলদা হাসতে হাসতে বললেন — 'ও, এই। তাতে কিছু হবে না।'

এমন সময় মাষ্টারদা ছুটে এসে বললেন — 'নির্মলবাবু, পুলিশ এসেছে।' আমার

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও, নীচে নেমে যাও'। কোনমতে নীচে নেমে এলাম। ভাবলাম, 'এখনই তো সব শেষ হয়ে যাবে।'

দুই দিক থেকে গুলি চালাচালি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। নির্মলদার আর্তনাদ। আমি উপরে উঠতে গেলাম। সবাই মিলে আমাকে চেপে ধরল। উপরে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। ছোট মেয়েটাকে একটা ঘুষি দিলাম। একবার মইয়ের প্রায় অর্ধেক যেতে পেরেছিলাম — টান দিয়ে আমাকে ফেলে দিল। নির্মলদার 'রাণী' 'রাণী' ডাক আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। নির্মলদার কাছে যদি একবার যেতে পারতাম, জানি না, আমায় কি বলতেন।

এমন সময় মাষ্টারদা ও ভোলা নীচে নেমে এলেন। কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে মনে হয়েছিল ওঁরাও আর নেই। মাষ্টারদা আমায় বললেন, 'তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব।' আমি বললাম, 'আপনাদের সাথেই যাব দাদা।' ভোলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কি ধীর স্থির, কি অচঞ্চল! মুখে এতটুকু চাঞ্চল্যের ভাব নেই। বীরের মত বুক ফুলিয়ে মাষ্টারদার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

তিনজনে রওনা হলাম। ভোলা ছিল আগে আগে। তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম, আর একটু পরেই ভোলাও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে!

মাষ্টারদা দুটি রত্ন হারিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন।

রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন, ভোলার সাথে আলাপ করতে। আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু'দিন ধরে কেবল ওর হাসিই শুনেছিলাম। সবশেষে আমারই চোখের সামনে সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করল।

প্রিয় সাথী নির্মল সেন ও ভোলাকে হারিয়ে মাষ্টারদা রাণীকে নিয়ে নেমে পড়লেন পানাভরা এক পুকুরের মধ্যে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। একসময় সব শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পুকুর থেকে উঠে ওঁরা রওনা দিলেন গ্রামেরই অপরপ্রান্তে দলের কর্মী মণিলাল দত্তর বাসার দিকে। মণিকে পেয়েই মাষ্টারদা বললেন, 'তাড়াতাড়ি ঠিক কর, কোথায় নিয়ে যাবি আমাদের।'

কয়েকদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। মাঠঘাট সব জলে ভর্তি। অনেক রাস্তাও জলের তলায়। জল ভেঙ্গেই ওঁরা রওনা হলেন জৈষ্ঠ্যপুরা গ্রামের দিকে। এই গ্রামের কাছেই পাহাড় আর জঙ্গল। কিছুদূরে নদী। পুলিশ পরদিন গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। প্রয়োজন হলে ঐ পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়া যাবে। জঙ্গলের ভিতর দিয়েই যেতে হল প্রায় তিনমাইল। কোথাও এক কোমর, কোথাওবা সাঁতার কাটার মত জল। কিছুদূরে যেতে না যেতেই শোনা গেল লুইসগানের আওয়াজ। ওরা শক্তিবৃদ্ধি করে ধলঘাটের বাড়ীর উপর আক্রমণ আবার শুরু করেছে। মনে মনে ভাবে রাণী।

ভোরবেলায় নতুন আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছলেন ওঁরা। সেখানে ছিলেন, সুশীল দে,

মহেন্দ্র চৌধুরী, কালীকিংকর দে। মাষ্টারদার দিকে চেয়ে সবাই শিউরে উঠলেন। চোখ কোটরে, মুখ চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ গম্ভীর। বুক ফেটে যেন কান্নার আওয়াজ বের হয়ে আসছে। ওঁরা এই প্রথম দেখলেন, মাষ্টারদার চোখের কোল বেয়ে অশ্রুমালা একটার পর একটা ঝরে পড়ছে।

মাষ্টারদা বললেন, 'আজ আমার বড় দুর্দিন, আমার ডান হাতখানা ভেঙ্গে গেল। যে সময় নির্মলবাবুকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ঠিক সেই সময় তাকে হারালাম।'

আর বলতে পারেন না। দুর্বহ বেদনাভারে তিনি ভাষাহীন হয়ে গেলেন। সবাই জানলেন, নির্মলদা নেই, অপূর্ব নেই।

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে ধলঘাট সংগ্রামের বিবরণ দিতে শুরু করলেন মাষ্টারদা।

'আমি আর রাণী তখন নীচের ঘরে খেতে বসেছি। এমন সময় দরজায় কে যেন আস্তে আস্তে টোকা দিল। দরজা একটু ফাঁক করে দেখলাম, পুলিশ। বাঁশের মই বেয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে যাই।

নির্মলবাবু ও ভোলা রিভলবার নিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। আমি উপরে কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেলছিলাম।'

এইটুকু বলে থেমে যান মাষ্টারদা। খানিকপরে নিজেকে সংবরণ করে আবার বলতে শুরু করেন, 'দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে একটা বুলেট এসে নির্মলবাবুর বুকে লাগে। দেখি বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরতেই হাত সরিয়ে বললেন, রাণী আর ভোলাকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। আমি বলি — 'আপনি? তীব্র বেদনাকে চেপে রেখে তিনি বললেন — আমার কথা ভাববেন না, আমি fatally wounded, বেশীক্ষণ আর নেই আমি। তাঁর কথা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল।'

বহুক্ষণ কথা বলতে পারেন না মাষ্টারদা। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত সংযত কণ্ঠে আবার বলতে শুরু করেন — 'নির্মলবাবুকে ঐ অবস্থায় রেখেই আগে ভোলা, মাঝে আমি, তারপর রাণীকে নিয়ে উত্তর দিকের আমবাগানের দিকে এগিয়ে যাই। কিছুই দেখা যায় না, ঘোর অন্ধকার। কয়েকপা এগিয়ে যেতেই আমগাছের আড়াল বা বেতগাছের ঝোপের মধ্য থেকে গুলি এসে লাগে ভোলার বুকে। কাছে গিয়ে দেখি সব শেষ।'

সময় বয়ে যায়। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধ বিষণ্ণতা। খানিকপরে মাষ্টারদা বলেন, 'রাণী, আর দেরী কোরো না। পুলিশ বোধহয় তোমাকে এখনও সন্দেহ করেনি। এখনই বাড়ী ফিরে যাও ভাই।'

রাণীর বুকটা হাহাকার করে ওঠে। দাদাকে ছেড়ে এখন সে কিছুতেই যেতে পারবে না, কিছুতেই না। কিন্তু কথাটা সে মুখ ফুটে বলতে পারে না। শুধু চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বসে থাকে। দাদা আবার বলেন, 'দেরী কোর না রাণী।'

রাণী শুধু বলতে পারে, 'আমি এখানে থাকব দাদা।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন মাষ্টারদা। তারপর তার চোখে চোখ রেখে বলেন —

'আবেগকে সংযত কর রাণী। তোমাকে এখনই যেতে হবে। পুলিশ হয়ত তোমাকে এখনও সন্দেহ করে নি। যাও দিদি, সময়মত তোমাকে আবার ডেকে নেব।'

মাষ্টারদার এই গম্ভীর শান্ত দৃঢ় কণ্ঠের সাথে রাণীর পরিচয় ছিল না। শক্তি সংগ্রহ করে রাণী উঠে দাঁড়ায়। মণির দিকে তাকিয়ে দাদা বলেন — 'যাও, রাণীকে খেয়াঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো।'

---

* অষ্টম পরিচ্ছেদ *

যখন বাড়ী ফিরে এল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পথে এক পশলা বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল তার। মেয়েকে দেখেই কাছে এসে মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে প্রতিভাদেবী বললেন — 'তোকে এরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে খুকী? অসুখ বিসুখ করে নি তো?' মায়ের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে রাণী বলে, 'বড্ড খিদে পেয়েছে মা।' একদৃষ্টে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন প্রতিভাদেবী।

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। বিদ্যুৎ চমক এবং থেমে থেমে বৃষ্টি শুরু হল তারপর। সকাল সকাল দুটো মুখে দিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিল রাণী। মা-বাবা-ভাই-বোনেদের সাথে এতক্ষণ জোর করে হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব করতে হয়েছে, বাবাকে শোনাতে হয়েছে সীতাকুণ্ডের নানা ঘটনা। সেখানে বন্ধুর বাড়ীতে এই দুদিন কত আনন্দে কেটেছে তা শুনে বাবা খুশী হয়েছেন। এখন বিছানায় এসে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। বৃষ্টির জলের সাথে পাল্লা দিয়ে নামতে থাকা চোখের জল নীরবে বালিশ ভিজিয়ে দিতে থাকে তাঁর। রামকৃষ্ণদা, নির্মলদা, ভোলা এদের মুখগুলো একের পর এক চোখের উপর ভাসতে থাকে।

সেদিন খিচুড়ী রান্নার পর ভোলাটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে বলেছিল, দিদি, I must take আলুভাজা। অল্প করে দিয়েছিলাম। আরো চাইলে বললাম, আর দেব না, খিচুড়ী খাওয়া হবে কি দিয়ে? আলুভাজা খাওয়ার পর পেঁয়াজ ভাজা খাওয়ার জন্য বসে রইল। আমাকে ডিমভাজার জন্য কাঁচালঙ্কা কেটে দিল। ভোলার হাসি হাসি মুখখানা যেন চোখের সামনে দেখতে পায় রাণী।

রান্না হবার পর সবাই মিলে খেতে বসলাম। কেউ বেশী খেতে পারল না। ভোলা মহোৎসাহে বলতে লাগল, আমি কাগজে বেঁধে সব রেখে দেব আর সকালবেলা খাব। Excellent হবে। সেই সকালবেলা আর ভোলার জীবনে এল না।

যেদিন চলে গেলেন তার আগের দিন রাতে নির্মলদা বলেছিলেন, তোর রান্না খেলাম, এবার একটা গান শোনা। অভ্যাসমত কিছুতেই গান করলাম না। যদি জানতাম, এ জীবনে দাদা আর অনুরোধ করবেন না তাহলে......। গান না গাওয়ার বেদনা যে কত কষ্টদায়ক জীবনে এই প্রথম অনুভব করে রাণী। আর একদিন দাদা বলেছিলেন, আমাদের অবস্থা কি জান রাণী? One foot in grave. হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমাদের তিনটি মেয়ে, তিনটি রাণী, of which you are the eldest. সেবার চলে আসার সময় প্রণাম করতে গেলে বলেছিলেন, আমাকে আর কোনদিন প্রণাম কোর না। তারপর কাগজে বেঁধে একটা আশীর্বাদী ফুল দিয়েছিলেন। দেখে মাষ্টারদা বললেন, যত্ন করে রেখে দিও। স্মৃতির পাহাড় মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে ভীড় জমাতে থাকে।

বিছানা থেকে ধীরে ধীরে উঠে আলোটা একটু বাড়িয়ে দেয় রাণী। ব্যাগ থেকে বের করে নির্মলদার সেই আশীর্বাদী ফুল। মনে হয়, দাদা এখনও তার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন। সযত্নে বাক্সের মধ্যে ফুলটা রেখে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। দেখে, বর্ষাস্নাত মেঘভরা রাতের আকাশে এক কোণায় একফালি চাঁদ তখনও অন্ধকার ঘোচানোর মরীযা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে রাণী দেখতে পায়, সামনে খবরের কাগজ নিয়ে বাবা উত্তেজিত হয়ে মাকে কি সব বোঝাচ্ছেন। মা নির্বাক বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে আছেন বাবার মুখের দিকে। তাকে দেখেই বাবা বলে উঠলেন, 'দেখে যা খুকী, কি সাংঘাতিক কাণ্ড!' কাগজটা সামনে মেলে ধরে বাবা উচ্চকণ্ঠে পড়তে শুরু করলেন —

"চট্টগ্রামে সৈন্য ও বিপ্লবীতে সংঘর্ষ

এই মাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে, গতরাত্রে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার নিকট বিপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে গুর্খা বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ ও ২ জন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবীদের নিকট ২টি রিভলবার ও গুলী ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নিহত বিপ্লবীদের একজনকে নির্মল সেন বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫.৬.৩২)

'ভোলাকে কি তাহলে চিনতে পারে নি এখনও?' ভাবতে ভাবতে রাণী ঘরে প্রবেশ করে। জানালার পাশে খাটের উপর গা এলিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকে সে। নির্মলদার শেষ সময়ের ডাক সে এখনও শুনতে পায়। 'রাণী, রাণী'। ওরা কিছুতেই দাদার কাছে আমাকে যেতে দিল না। বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার।

যে রাতে দাদা চলে গেলেন, সেদিন সকালের একটা কথা মনে পড়ে যায়। দাদা বলেছিলেন, 'রমণের সাথে আমার হয়তো আর দেখা হবে না। ওকে বলো, আমার উপর যেন রাগ না করে।'

মনে পড়ে আবদারের সুরে বলেছিলাম — 'আমাদের দিয়ে কিছু করাবেন না দাদা?'

দাদা হেসে বলেছিলেন — 'সেটাই তো মাষ্টারদার স্বপ্ন। মাষ্টারদা চান মেয়েদের দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে। এদেশের মেয়েরাও যে মাতৃমুক্তি যজ্ঞে অনায়াসে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে জগতের সামনে মাষ্টারদা এটাই প্রমাণ করতে চান।'

বুকটা আনন্দে ভরে গিয়েছিল রাণীর। সে বলেছিল — 'আমার ভীষণ মরতে ইচ্ছা করছে দাদা। এখানে যদি পুলিশ আসে আমি আপনার কাছ থেকে নড়ব না।'

হাসতে হাসতে নির্মলদা বলেছিলেন — 'কিসের জন্য মরবে তুমি?'

কে জানত কয়েক ঘণ্টা পরে মৃত্যু এসে দাদার দরজায় হানা দিয়ে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আমাকে স্পর্শও করবে না।

সাত দিন হল সে এসেছে, তারপর আর কোন খবর পায় নি মাষ্টারদার। আজ দুপুরে কল্পনা এসেছে সাথে মনোরঞ্জনদা। ওরা কেমন বিষণ্ণ, গম্ভীর। মাষ্টারদার কিছু হয় নি তো? শেষ পর্যন্ত সব শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাণী। দাদা ৫০০ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন, বহু কষ্টে ৪৫০ টাকা যোগাড় হয়েছে। বাদবাকী ৫০ টাকার কি হবে তা নিয়েই ওদের উদ্বেগের অন্ত নেই। রাণী বাক্স খুলে ৫০ টাকা এনে দেয় কল্পনার হাতে। চমকে উঠে কল্পনা বলে — 'কোথায় পেলে এই টাকা?'

রাণী হাসতে হাসতে বলে — 'বাবার মাইনের টাকা। আমার কাছেই তো থাকে। তাই দিলাম।'

'কিন্তু এ নিয়ে যদি কোন হৈ চৈ হয়, তাহলে?' প্রশ্ন করেন মনোরঞ্জনদা।

'কিছুই হবে না দাদা। বাবা তার বড় মেয়েকে জানেন। তিনি বুঝবেন রাণী যখন খরচ করেছে নিশ্চয়ই ভাল কাজে করেছে। আপনারা চিন্তিত হবেন না।'

কল্পনা বলে, 'কিন্তু.............'।

'কোন কিন্তু নেই ভাই। আমরা গরীব বলে টাকাটা নিতে চাইছ না? একবার বীরেনদার কথাটা ভেবে দেখেছ? আমি যে একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হতে পারি তা প্রমাণ করার একটা সুযোগও কি তোমরা আমায় দেবেনা?'

বাড়ীতে সেদিন বড় আনন্দ। ডিস্টিংশনে পাশ করার খবর সবে এসেছে কলকাতা থেকে। হাসতে হাসতে বাবা বললেন, 'পাশ তো হল, এবার?' বাবার ইচ্ছার কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না রাণীর। উত্তর না দিয়ে, বাবা-মাকে প্রণাম করে ঘরে প্রবেশ করে সে।

মনে পড়ে যায় সাক্ষাতের প্রথম দিনে নির্মলদার কথা। পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি। 'পাশ করব বলেই তো মনে হচ্ছে' বলায় হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'শুধু পাশ করলে চলবে?' আজ কোথায় নির্মলদা! হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে একটা ব্যথার সুর বেজে ওঠে। চোখের জল আর চেপে রাখতে পারে না সে।

সেদিন রাতে হাতের কাজ গুছিয়ে মেয়ের কাছে এসে বসেন প্রতিভাদেবী। খোলা জানালা দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া ঢুকছিল ঘরের ভিতর। বালিশটা ঠিক করে মেয়ের মাথার তলায় গুঁজে দিয়ে হারিকেনটা একটু আড়াল করে রাখেন তিনি। মেয়ের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। তারপর নিজেকে খানিকটা প্রস্তুত করে বলতে শুরু করেন, — 'তোর বাবা বলছিলেন ....'।

বাবা কি বলেছেন, জানে রাণী। তাই কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মার মুখে হাত চাপা দিয়ে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে সে। মার আঙ্গুলগুলো তার চুলের মধ্যে খেলা করতে থাকে। আমার বিয়ে দিয়ে বাবা-মা নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন। কিন্তু এই

জীবনের আকাঙ্খা তো সে কবেই পিছনে ফেলে চলে এসেছে। নতুন জীবনের যে স্বপ্ন নিয়ে নিজেকে সংগোপনে তৈরী করছে, তার কথাই আজ মাকে বলবে সে। মনে মনে ভাবে রাণী।

'জান মা, কাল পূর্ণেন্দুদার একটা চিঠি পেয়েছি। জেল থেকে পাঠিয়েছেন। নিজের কষ্টের কথা প্রায় কিছুই নেই। আছে শুধু দেশ স্বাধীন হলে কেমন সমাজ আমরা গড়ে তুলব তারই একটা কল্পচিত্র। এঁদের মতই জীবন আমি গড়ে তুলতে চাই মা। তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর।'

অবাক হয়ে রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন প্রতিভাদেবী। ঘরের আবছা আলোর মধ্যেও তিনি স্পষ্ট দেখতে পান রাণীর চোখ দুটো চিকচিক করছে। বুকটা তাঁর ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হয়, ছোট বয়স থেকে যে রাণীকে তিনি দেখে এসেছেন, স্নেহে যত্নে মায়ায় আনন্দে এতবড় করেছেন, এ যেন সে রাণী নয়। এ যেন অন্য কেউ রাণীর দেহ ধারণ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সম্পূর্ণ অজানা, সম্পূর্ণ অপরিচিত।

হারিকেনের ম্লান আলোয় রাণী লক্ষ্য করে পূর্ণেন্দুদার কথায় মার দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। কিন্তু কোন কথা না বলে মা চুপ করে বসে থাকেন। রাণী অনুভব করে তার চুলের মধ্যে মার আঙ্গুলগুলো কেমন থরথর করে কাঁপছে। মা যে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তার নিজেরও গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কোন কিছু না করে মায়ের কোলে মাথা গুঁজে সে চুপ করে পড়ে থাকে। নিশুতি রাত যেন মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে থাকে।

৪ঠা জুলাই, ১৯৩২। রাত তখন অনেক। কিছুতেই ঘুম আসছে না। একটা গুমোট ভাব দমবন্ধ করা পরিবেশ তৈরী করেছে। ক'দিন বৃষ্টির পর আকাশটা আজ বেশ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় অনেক দূরের ছায়া ছায়া গাছগুলো বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় রাণী।

মাষ্টারদার ডাক এসেছে, কাল চলে যেতে হবে। এই বাড়ী, এই ঘরদোর, বাবা-মা-কনক-শান্তি-সন্তোষ, বুধী-শ্যামা — কারও সাথে আর দেখা হবে না এ জীবনে। কদিন ধরে মঞ্জুর খুব অসুখ। গাল ফুলে গেছে, খেতে পারে না, গায়েও খুব জ্বর। ও হয়তো আমাকে না দেখে কাঁদবে। রাত দুপুরে উঠে খোঁজ করবে আমার। বিছানার পাশে গিয়ে জ্বরতপ্ত মঞ্জুর গালে একটা চুম্বন এঁকে দেয় রাণী। বাবা হয়তো কেঁদে কেঁদে ক্ষান্ত হবেন, কিন্তু মা!

আর ভাবতে পারে না সে। কাপড়ের খুট দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। নির্মলদার সাথে প্রথমদিনের সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে যায় তার। দাদা বলেছিলেন — 'ছন্নছাড়া এ জীবন গ্রহণ করতে চাইছো, বাবা-মা-ভাই-বোন এদের কথা ভেবে মনস্থির করেছ? সেদিন কত সহজেই না সে বলেছিল, 'Duty to family-

কে Duty to Country'র কাছে বলি দিতে পারবো'। কিন্তু তা যে এমন দুঃসহ যন্ত্রণার তা কি আগে ভাবতে পেরেছিল সে। চোখের জল আবারও অঝোর ধারায় ঝরতে থাকে।

সযত্নে রাখা একটা পুরানো খবরের কাগজ বাক্স থেকে বের করে রাণী। ছোট করে রাখা হারিকেনটি বাড়িয়ে পড়তে শুরু করে — "I had been thinking – is life worth living in a miserable India, subject to wrong and groaning under the tyranny of a foreign government – or is it not better to make one Supreme Protest against it, by offering one's life away" ?

কি অপূর্ব! আদালতে বীণাদির[১০] বিবৃতি। তার জীবনেও আজ পূর্ণতার মহত্তম ক্ষণ উপস্থিত। মাষ্টারদা ডাক দিয়েছেন। দেশের কাজে সর্বস্ব সমর্পণ করতে হবে। এখন কি দুর্বলতা তার শোভা পায়? কাগজটা ভাজ করে সযত্নে বাক্সের মধ্যে রেখে দেয় সে, তারপর ডায়েরী নিয়ে বসে পড়ে।

সকাল থেকেই শুরু হল প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়। এদিকে মারও ধূম জ্বর। বাবা গিয়েছেন কবিরাজ বাড়ীতে। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছেন, 'এ দিকটা একটু দেখিস্ মা।' মার মাথায় জলপট্টি দিয়ে, ওষুধ খাইয়ে যখন সে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো তখন বেলা হয়েছে। হাওয়ার বেগ কমে এলেও তখনও বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকের মাঠ ঘাট সব জলে থৈ থৈ। মাকে বার্লি রান্না করে খাইয়ে, বাবাকে অফিসে আর ভাইবোনেদের স্কুলে পাঠিয়ে স্নান করে যখন সে ঘরে ঢুকলো তখন বেলা ১১টা। বাকসো থেকে চিরকুটটা বের করে দেখল, 'তৈরী হয়ে সদরঘাটে চলে এসো। বারোটায়।'

বারোটা! আর তো দেরী নেই। মার ঘরে একবার উঁকি দিল রাণী। মা নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছেন। জ্বর হয়তো এখন একটু কম। পা টিপে টিপে মার ঘরে গিয়ে ঢোকে রাণী। বড় লোভ হয় মার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে। কিন্তু যদি জেগে যান! দূর থেকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে নেয়, তারপর শব্দ না করে দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

বাড়ীর বাইরে এসে চিন্তা হয়, মার শিয়রের উত্তর দিকের জানালাটা বন্ধ আছে তো? ঠাণ্ডা লেগে জ্বরটা আবার বেড়ে না যায়। ত্রস্ত পায়ে আবার বাড়ীতে ফিরে আসে রাণী। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে দেখে জানালাটা বন্ধ। মা তখনও নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছেন। চোখে মুখে যেন এই ভাব — 'রাণী আছে তো।' শক্তিশালী চুম্বক লোহাকে যেমন সবলে আঁকড়ে ধরে, রাণীর মনে হয়, ঘরের মেঝে যেন দশগুণ বিশগুণ বলে তার পা দুটোকে তেমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে। চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে রাণী। তারপর শক্তিসঞ্চয় করে এক দৌড়ে রাস্তায় নেমে আসে। লক্ষ্যও করে না খোলা দরজা দিয়ে প্রবল বেগে হাওয়া ঢুকে ঘরের আসবাবপত্র সব তছনছ করে দিচ্ছে। জোর পায়ে রাণী

সদরঘাটের দিকে এগিয়ে চলে আর মনে মনে বলতে থাকে, 'মাগো, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমায় তুমি ক্ষমা কর মা।'

ঐ দিন রাতে হানা দিলেন গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টর যোগেন গুপ্ত। রাণীকে না পেয়ে হতাশ হয়ে বললেন — 'এত শান্তশিষ্ট মেয়ে, এত সুন্দর কথা বলতে পারে, ভাবতেও পারিনি তার ভিতর এত কিছু আছে। আমাদের খুব ফাঁকি দিয়ে গেল।'

পুলিশ গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। খবর দিতে পারলেই ৫০ টাকা পুরস্কার। আনন্দবাজার লিখল —

''চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার গত ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার, চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।''

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩.৭.৩২)

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফিরে কনককে বললেন জগদ্বন্ধুবাবু, 'চলতো মা, একটু দীঘির পাড়ে বেড়িয়ে আসি।' দিদির পছন্দের সেই বটগাছতলাটায় যেয়ে বসলেন বাবা। তার মনে পড়ে, আগে হলে বাবা কত গল্প করতেন, কিন্তু আজ! একদৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'ঐ গানটা একবার গা তো মা।' কোন গানটার কথা বাবা বলছেন, জানে কনক। দিদির মুখে এই গানটা বাবা প্রায়ই শুনতে চাইতেন। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' শুরু করে আর টানতে পারে না সে। একরাশ কান্না এসে গলাটা আটকে ধরে। লক্ষ্য করে বাবার সমস্ত দেহও যেন থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিস্তব্ধ দীঘির পাড়ের ঘন অন্ধকার ক্রমশ জমাট বাঁধতে থাকে। নিঃশব্দে উঠে পড়েন বাবা। তার হাতে চাপ দিয়ে বলেন, 'চল মা বাড়ী যাই।'

বাড়ীর কাছাকাছি এসে ক্লান্ত গলায় বলেন — 'দিদির জামাকাপড়গুলো সব গুছিয়ে রেখেছিস তো মা?'

রাণী চলে গিয়েছে বেশ কয়েকদিন। জগদ্বন্ধুবাবু অফিসে, ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে। সেদিন দুপুরের অবসরে প্রতিভাদেবী গিয়ে ঢুকলেন রাণীর ঘরে। সব আগের মত। সেই খাট, সেই বিছানা, সেই বইপত্র। এস্রাজটাও আগের জায়গায়। শুধু নেই............।

রাণীর বইপত্রগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখতে থাকেন প্রতিভাদেবী। বইয়ের মধ্যে দেখতে পান পূর্ণেন্দুকে লেখা একটা চিঠি। নানা জায়গায় কাটাকুটি। শেষের দিকে এসে চোখ আটকে যায়। রাণীর লেখা কবিতার কয় লাইন —

'আঁধার পথে দিলাম পাড়ি
মরণ-স্বপন দেখে।'

আর ভাবতে পারেন না তিনি। চিঠিখানা হাতে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তারপর জায়গামতো রেখে, ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন —

'তোর স্বপ্ন সফল হোক খুকী।'

---

* নবম পরিচ্ছেদ *

কয়েকদিন কেটে গেল চট্টগ্রাম শহরের গোপন আস্তানায়। তারপর এলাম পঁড়েকড়া গ্রামের রমণী চক্রবর্তীর বাড়ী। গোপন এই আস্তানার সাংকেতিক নাম ছিল 'কুন্তলা'। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে যাওয়ার পর যখন শহর থেকে রওনা দিয়েছিলাম তখন আকাশে অল্প অল্প মেঘ। কিন্তু তারপর পথে মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হল। ভিজে নেয়ে একশা হয়ে যখন কুন্তলায় পৌঁছলাম, দেখলাম, ঘরে মাদুরের উপর বসে প্রদীপের আলোয় মাষ্টারদা কি যেন লিখছেন। আমাকে দেখেই কলম রেখে উঠে এলেন। বললেন, 'তাড়াতাড়ি সব পাল্টে নাও।' রমণীবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'সব ঠিক আছে তো?'

ধলঘাটের পর এই প্রথম মাষ্টারদাকে দেখলাম। রোগা হয়ে গিয়েছেন, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ, শুধু চোখ দুটো যেন আরও উজ্জ্বল আরও চকচকে। মাষ্টারদা বললেন, 'আর দাঁড়িয়ে থেকো না দিদি।' দাদাকে প্রণাম করে ঢুকলাম অন্দর মহলে।

পরদিন ডাক পড়ল বিকালবেলায়। প্রণাম করে দাঁড়াতেই হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, 'কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে হবে দিদি। একটা বিষয় লক্ষ্য রেখো। তোমার পছন্দ অপছন্দের জন্য যেন আশ্রয়দাতার কোন অসুবিধা না হয়। নিশ্চিত নিরুপদ্রব জীবনতো আমাদের জন্য নয়। অভ্যাসকে বশ মানাতে হবে আমাদের। এ না হলে আমরা এই কাজের যোগ্য হব কি করে?

দাদাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি নাকি বুড়ো মালি সেজে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন? আর একদিন নাকি সন্ন্যাসী সেজে পুলিশের সাথে কথা বলতে বলতে মাইলের পর মাইল হেঁটে ছিলেন — এসব কি সত্যি?'

শুনে দাদার সে কি হাসি। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি বিশ্বাস কর নাকি এসব?' তারপর গম্ভীর গলায় বলেছিলেন — 'এর সবটা সত্য নয় দিদি, অনেকটাই বাড়িয়ে বলা। দেশের মানুষ আমাদের ভালবাসে। তারা চায় আমরা যেন পুলিশের হাতে ধরা না পড়ি। তাদের কল্পনায় আমরা অতিমানব। এসব হল দেশের মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ। এসব কখনও বিনাবিচারে বিশ্বাস কোর না।'

তারপর যেন আপনমনেই বললেন, 'আমরা কি দেশের মানুষের এত ভালবাসার যোগ্য হতে পেরেছি? কে জানে!'

এই প্রথম দেখলাম তারকেশ্বরদাকে। তাঁকে দেখেই রামকৃষ্ণদার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। 'তারকেশ্বরদা না থাকলে এই রামকৃষ্ণের জন্ম হোত না রাণী।' নির্মলদাও একদিন বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ যখন খুব গম্ভীর হয়ে থাকত আমরা ওকে পাঠিয়ে দিতাম তারকেশ্বরের কাছে। তারকেশ্বরকে ও খুব ভালবাসতো, Respect কোরত।'

এই সেই তারকেশ্বরদা। প্রশস্ত ললাট, হাসি হাসি মুখ। মাষ্টারদাকে প্রণাম করে পাশে এসে বসলেন। তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গিয়েছে। একটা প্রদীপ জ্বেলে পিলসুজের উপর রাখলাম। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেখলাম মাষ্টারদার চোখ দুটো যেন ব্যথায় মলিন হয়ে গিয়েছে। খানিক পরে বললেন, 'এই তো স্বাভাবিক তারকেশ্বরবাবু। কৃতঘ্নতাই যদি সহ্য করতে না পারি আমরা, তবে বৃথাই এ জীবনের শিক্ষা।'

তারকেশ্বরদা যেন কি বলতে গেলেন। থামিয়ে দিয়ে মাষ্টারদা বললেন, 'এখন থাক্। আর এক সময় হবে।'

'রামকৃষ্ণ তখন বি.এস.সি'র ছাত্র। বিস্ফোরক তৈরীর কাজে বিজ্ঞানের ছাত্রদেরই প্রধানত নিয়োগ করা হত। একদিন শহরের এক গোপন কেন্দ্রে বিস্ফোরক তৈরীর সময় দুর্ঘটনায় ও ভীষণ ভাবে পুড়ে যায়।

সেদিন দেখেছিলাম রামকৃষ্ণের সহ্যশক্তি। গোপন ঐ কেন্দ্রে একজন ডাক্তার এলেন। কিন্তু তিনি কতটুকুইবা করতে পেরেছেন। নিজের জোরেই রামকৃষ্ণ জীবন ফিরে পেল।' তারপর বললেন, 'জান রাণী, নিরামিশ খেতে ও একদম পছন্দ করত না। একদিন গিয়েছে আমাদের বাড়ীতে। মা অনেক রকম রান্না করে ওকে খাইয়েছিলেন। দিনগুলো কত দ্রুত চলে যায় — তাই না?'

মুহূর্তের মধ্যে রামকৃষ্ণের মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাণীর। নিজের কথা রামকৃষ্ণদা কিছুতেই বলতে চাইতেন না। জিজ্ঞেস করলেই মিটিমিটি হাসতেন আর বলতেন, 'আমার আবার কথা।'

'যা বলছিলাম', তারকেশ্বরের কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে আসে রাণীর। 'কর্ণফুলীর তীরে আমবাগানে বসে আছি আমরা। মাষ্টারদা, নির্মলদা, রামকৃষ্ণ, বিনোদ[১১], কালী[১২] ও আমি। আলোচনা শেষ হল সন্ধ্যার একটু আগে। বিদায় নেওয়ার সময় রামকৃষ্ণ এসে বলল, চলি ফুইট্যাদা। কি বলেছিলাম তা আজ আর মনে নেই। কিন্তু সেই শেষ দেখা। চোখ বুঝলেই সেই মুখটা এখনও দেখতে পাই রাণী।'

মাষ্টারদা প্রায়ই গান শুনতে চাইতেন। সেদিন বিকালবেলায় ডেকে বললেন, 'ঐ গানটা একবার শোনাও তো দিদি।' গান শেষ হলে অনেকক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। তারপর তার দিকে চেয়ে বললেন, 'বাড়ীর কথা মনে পড়ে না? বাবা-মা-ভাই-বোন এদের কথা?' কি বলবে রাণী ভেবে পায় না। মনে পড়ে সেদিন সোনাদা এসেছিলেন। মা নাকি এখনও কান্নাকাটি করেন। বাবা চুপচাপ, অফিসে যান বাড়ী ফিরে আসেন। সংসার থেকে হাসি আনন্দ সব উবে গিয়েছে। চলে আসার কয়েকদিন আগে শান্তি বলেছিল — দিদি আমার জন্য চুলের ফিতে এনো। তা আর ওকে দেওয়া হয় নি। সন্তোষের জন্য কেনা লাট্টুটা এখনও ব্যাগের মধ্যে পড়ে আছে। 'কি ভাবছ রাণী?' মাষ্টারদার কথায় হুশ ফেরে। সোনাদা আসার পর থেকেই মনটা ভাল ছিল না তার। কেবলই মার জ্বরতপ্ত ঘুমন্ত শান্ত মুখখানার কথা মনে পড়ছিল।

'দাদা, আমি এই পৃথিবীতে কি সবাইকে কেবল দুঃখ দিতেই এসেছি?' রাণীর ব্যথাতুর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন মাষ্টারদা। রাণীর এই প্রশ্ন তাঁকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। 'কত জননীর বুক খালি করেছি, কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, কত ঘরে হাহাকার সৃষ্টি করেছি' — এইসব ভাবতে থাকেন তিনি। তারপর নিজের আবেগকে সংযত করে বলতে থাকেন — 'এই তো আমাদের জীবনের পুরস্কার রাণী। ভালবাসার জনদের দুঃখ না দিয়ে যে আমাদের কোন উপায় নেই।' তারপর ম্লান হেসে নিজেই যেন নিজের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এমন ভঙ্গীতে বলেন, 'দুঃখ দিই, কিন্তু হাজার গুণ দুঃখ কি আমরাও পাই না!'

এইমাত্র খবর এল শৈলেশ্বরদা[১৩] আত্মহত্যা করেছেন। এক টুকরো কাগজে মাষ্টারদাকে লিখে গিয়েছেন, 'মায়ের ডাক শুনে সাড়া দিয়েছিলাম, কিন্তু আত্মবলিদানে ব্যর্থ হলাম।' সাথীরা তাঁর মরদেহ সমুদ্র সৈকতে সমাহিত করেছে। কয়েকদিন আগে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা হয়েছিল। শৈলেশ্বরদা ছিলেন দলনেতা। সেদিন সন্ধ্যায় যখন সবাই একে একে রওনা হচ্ছিলেন, শৈলেশ্বরদা এগিয়ে এসে বলেছিলেন, 'কতকাল যে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে আছি! আজ আমার জীবন ধন্য হবে রাণী।' সেই শৈলেশ্বরদা ব্যর্থতার জ্বালা সহ্য করতে পারলেন না, চলে গেলেন। লক্ষ্য করলাম শৈলেশ্বরদার চিঠি পড়তে পড়তে মাষ্টারদার চোখে মুখে একটা ক্লান্ত বেদনার ছাপ ফুটে উঠছে। আপন মনেই তিনি বলে উঠলেন, 'এইবারও আমরা পারলাম না, শৈলেশ্বরকেও হারালাম তারকেশ্বরবাবু!'

একটানা কয়েকদিন বৃষ্টির পর সেদিন ঝলমলে রোদ উঠেছে। নীলাকাশে হালকা মেঘের আনাগোনার বিরাম নেই। গতকাল গভীর রাতে মাষ্টারদা ফিরে এসেছেন। সকাল বেলায় ডাক পড়ল তাঁর ঘরে। ঢুকতেই হাসিমুখে বললেন, 'এস রাণী।' পুবের জানালাগুলো এক এক করে খুলে দিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম।

'বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে, না? এই ক'দিনের ঝড়বৃষ্টিতে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম', তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

মাথা নেড়ে দাদার দিকে তাকাতেই দেখলাম একদৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন। যেন দৃষ্টি দিয়ে আমায় পরিমাপ করছেন। তারপর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমাকে যে একটা গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে দিদি।' কিছু না বলে আমি চুপ করে রইলাম। বুকের মধ্যে তখন ঝড় বইছিল, 'কি দায়িত্ব আমাকে দিতে চান দাদা! আমি কি তার যোগ্য! দাদা বলে যেতে লাগলেন, 'যেদিন ওরা জালিয়ানওয়ালাবাগে অসহায় নরনারীর রক্ত ঝরিয়েছিল সেদিনই প্রতিজ্ঞা

করেছিলাম এই রক্তঋণ ওদের রক্ত দিয়েই শোধ করতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা পূরণের দায়িত্ব তোমার। আগামী অভিযানে তুমিই হবে দলনেত্রী।'

কতদিন যে এই শুভক্ষণের অপেক্ষা করেছি! আনন্দে সমস্ত মনটা নেচে উঠল। এতদিনে বুঝি আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কিন্তু সাথে সাথে একটা ভয়ও এসে সমস্ত মনটা দখল করে নিল। আমি পারবো তো?

দাদার দিকে চোখ তুলে দেখলাম, আমার দিকে তাকিয়ে তিনি মিটিমিটি হাসছেন। ভরাট গলায় বললেন, 'কি ভাবছ রাণী?'

'দাদা, এত যোগ্য ভাইয়েরা থাকতে.........'

'তোমায় কেন দায়িত্ব দিতে চাইছি, এই তো?' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দাদা বললেন, তারপর আমার আনত চিবুক ডানহাতে তুলে ধরে চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়ে বললেন, 'বাংলার ঘরে ঘরে আজ বিপ্লবী যুবকের অভাব নেই। তাদের দৃপ্ত অভিযানে বাংলার মাটি সিক্ত হয়েছে বারবার। কিন্তু মায়ের জাতিও যে আর পিছিয়ে থাকবে না, এই ইতিহাস তোমাকেই সৃষ্টি করতে হবে দিদি। দুনিয়া দেখুক, এদেশের মেয়েরাও আর পিছিয়ে নেই।'

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে মাষ্টারদা নীরব হলেন। তাঁকে প্রণাম করে, তাঁর দেওয়া আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

আনন্দের এই দিনে নির্মলদার কথা বারবার মনে পড়ছে। একদিন বলেছিলাম, 'আমাদের দিয়ে আপনারা কিছু করিয়ে যাবেন না দাদা?' হাসতে হাসতে দাদা বলেছিলেন, 'চাটগাঁ শহরের উপর একদিন আগুন জ্বালিয়ে দেব। হঠাৎ শুনতে পাবে, কয়েকজন বিপ্লবী দুনিয়া থেকে হারিয়ে গিয়েছে।' যখন এসব বলতেন, ভাবতাম এমন সব ছেলে থাকতে ভারতের এ দুর্দশা কেন? যে দেশের সন্তান এমন করে মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ করতে পারে সেই দেশের দৈন্য কিসের?

'কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী
ওগো আমার ভারতরাণী!'

হঠাৎ চমকে উঠলাম, দেখি মাষ্টারদা দাঁড়িয়ে আছেন। কখন এসেছেন টেরই পাই নি। এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তৈরী হয়ে থেক, আজ রাতেই চলে যেতে হবে অন্য আস্তানায়।'

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।"

গান শেষ করে যখন দাদার মুখের দিকে তাকালাম, দেখলাম তিনি একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। কয়েকদিন আগে তারা এসেছে শহরের উপকণ্ঠে কাট্টলিগ্রামের এই নতুন আস্তানায়। সারাদিন নতুন কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা আর রাতের বেলায় সমুদ্রতীরে যেয়ে ট্রেনিং নেওয়া — এইভাবেই দিনগুলো কাটছিল। সেই যে দাদা বলেছিলেন, 'তোমাকেই এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে', তারপর এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলেন নি। কবে তার জীবনে সেই শুভক্ষণ আসবে, এই চিন্তা তাকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে। আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয় — 'ধৈর্য ধর রাণী, সময় হলে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন।'

'আজ কত তারিখ, তারকেশ্বরবাবু?' মাষ্টারদার কথায় চমকে উঠল সে।

'৪ঠা আগস্ট'। উত্তর দেন তারকেশ্বরদা।

'ঠিক একবছর পূর্ণ হল।' কথাগুলো বলার সময় দাদার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে থাকে, দৃষ্টি এড়ায় না রাণীর। তারকেশ্বরদা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে আসতে থাকে। উঠে যেয়ে প্রদীপটা জ্বেলে দিয়ে আসার শক্তি সে ভিতর থেকে সংগ্রহ করতে পারে না। ব্যথাভরা অবসন্নতা সমগ্র দেহমনকে গ্রাস করে ফেলতে থাকে। অন্ধকারে দু'জনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে বহুক্ষণ। একটা দমকা হাওয়া এসে ঘরের সব কিছু ওলট পালট করে দিয়ে যায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে মাষ্টারদা বলেন, 'ঝড় উঠবে বোধহয়, একটু তারকেশ্বরবাবুকে ডেকে দাও তো দিদি।'

হ্যাঁ, ঠিক একবছর পূর্ণ হল আজ। রামকৃষ্ণদা এক বছর আগেই বিদায় নিয়েছেন। মাষ্টারদার দেওয়া খবরের কাগজটা মেলে ধরে রামকৃষ্ণদার ছবির দিকে চেয়ে থাকে রাণী। শেষ চিঠিতে দাদা তাকে লিখেছিলেন, "ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। কত মধুর স্মৃতিই মনের কোণে জোট বেঁধেছে। সে দিন নেই কিন্তু সে সুখের রেশও তো যায়নি। আজ সুর গিয়েছে থেমে তবু নীরবতায় বাজছে বীণা বিনা প্রয়োজনে।" দাদা আজ সুখ দুঃখের অতীত, রেখে গিয়েছেন একরাশ স্মৃতি। দুঃখের, আনন্দের, গৌরবের স্মৃতি। কাগজটা ভাঁজ করে বাক্সের মধ্যে রাখতে রাখতে রাণী আপনমনেই বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'তোমার স্নেহের মর্যাদা যেন রাখতে পারি দাদা, এই আশীর্বাদ কোরো।'

---

* দশম পরিচ্ছেদ *

শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। শহরের উপকণ্ঠে সামান্য দূরে উত্তর পশ্চিমের পাহাড়ের কোলে ইউরোপিয়ান ক্লাব। ক্লাব থেকে বেশ খানিকটা দূরে রেলের বড় কারখানা। এরপরই চওড়া রাস্তা, তারপর গ্রাম, আরও কিছুটা গেলে বঙ্গোপসাগর।

'সমস্ত এলাকা চক্কর দিয়ে বেড়ায় একদল পুলিশ, চক্কর পুরো করতে তাদের সময় লাগে মিনিট কুড়ি', পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর দাগ টানতে টানতে মাষ্টারদা বলতে থাকেন। 'তোমাদের পরণে থাকবে লুঙ্গী ও শার্ট — কারণ এ হল চাঁটগায়ের সাধারণ মুসলমানদের পোষাক। রাণীর পরণে থাকবে মালকোঁচা করা ধুতি, মাথায় পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ী, বুকে একটা লাল রঙের নিশান বা ব্যাজ। আর সকলে পকেটে রাখবে একটা জবানবন্দী। কেন এই লড়াইতে আমরা নেমেছি তা বিস্তারিত লিখবে এই জবানবন্দীতে।'

ইউরোপিয়ান ক্লাবের ম্যাপটা মাদুরের উপর মেলে ধরে আক্রমণের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিতে থাকেন মাষ্টারদা।' 'বিলিয়ার্ড হলের দিকে থাকবে বীরেশ্বর, প্রফুল্ল আর পান্না। ক্লাব বাড়ীর হলঘর আক্রমণে থাকবে রাণী, কালীকিঙ্কর ও শান্তি। সামনের দিকের দরজা আটকে থাকবে সুশীল ও মহেন্দ্র। সুশীল ও মহেন্দ্রর হাতে থাকবে রাইফেল ও হাতবোমা, রাণীদের সাথে থাকবে রিভলবার ও হাতবোমা, শান্তির সঙ্গে থাকবে তরবারী ও বোমা। সবার পরণে থাকবে রবার সোলের কাপড়ের জুতো।'

পকেট থেকে একটা ইস্তাহার বের করে তারকেশ্বরদার দিকে বাড়িয়ে দেন মাষ্টারদা। একটু দেখে নিয়ে তারকেশ্বরদা ভরাট গলায় পড়তে শুরু করেন, "**ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী আজ এক রক্তাক্ত প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে এসেছে এবং বৃটিশ শাসকবর্গকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ভারতের জনগণ আজ যতই দুর্বল ও অসহায় হোক না কেন তারা এইরূপ যথেচ্ছ বর্বরতা নির্বিকার চিত্তে এবং নীরবে আর কখনও মেনে নেবে না। এবং আজ তারা এই কথাও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র সরকারী মহলের দিকে লক্ষ্য রাখলেও এখন থেকে ভারতে অবস্থিত ইউরোপীয়ানগণের বিরুদ্ধেই তাদের সাধারণ অভিযান আরম্ভ করবে এবং নির্বিচারে সকল ইউরোপীয়কে হত্যা করবার জন্য ও তাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি অধিকার করে নেবার জন্য ঢালাওভাবে আদেশ জারী করছে।**"

অনেকক্ষণ সবাই চুপ করে বসে রইলেন। নীরবতা ভঙ্গ করে মাষ্টারদা বললেন, 'আজ তবে এখানেই শেষ হোক। আমাদের অভিযান হবে আগামী পরশু, ২৪শে সেপ্টেম্বর। সবাই প্রস্তুত থেক।' তারপর তারকেশ্বরদার দিকে তাকিয়ে বললেন — 'সব ঠিক আছে তো?'

'........Had not my revolutionary ideal been thoroughly

consistent with my devotion to the Almighty I would never have been a revolutionary With an invocation to Him, I launch to discharge my today's responsibility and pray to Him to purge me clean so that I may be worthy offering to Him.' জবানবন্দীটা শেষ করে বেশ কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নেয় রাণী। তারপর খামের মধ্যে পুরে বাক্সের মধ্যে রেখে বাইরে এসে দাঁড়ায়। নিশুতি রাতের নিস্তব্ধ প্রকৃতির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে বাঁশগাছের ফাঁকে জোনাকীর আলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। রাত পোহালেই শুরু হবে তার জীবনের শুভ লগ্নের অন্তিম প্রস্তুতি। মা এখন কি করছেন কে জানে! হয়ত কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছেন, হয়ত এখনও ভাবছেন — রাণী কালই বাড়ী ফিরে আসবে, হয়ত ভাবছেন........। সে আর ভাবতে পারে না। দুচোখ বেয়ে নামতে থাকা জল সামলে সে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে।

চমক ভাঙ্গল পাশের ঘরের বাচ্চাটার কান্নায়। দেখে সে দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশে। কতক্ষণ কে জানে! হারিকেনের স্তিমিত আলোয় দেখতে পায় পেনটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, পাশেই কাগজ। এগিয়ে যেয়ে পেনটা হাতে নেয়। কাগজ ভাঁজ করে হারিকেনটা বাড়িয়ে নিয়ে শুরু করে —

"মাগো তুমি আমায় ডাকছিলে..........."

সকালবেলায় যখন মাষ্টারদার ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম দাদা পুবের জানালা খুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা বই সামনে নিয়ে বসে আছেন। খোলা জানালা দিয়ে দূরের নারকেল সুপারীর বাগান দেখা যাচ্ছে। আমাকে দেখেই হাসলেন। বললেন, 'এসো তোমাকে কবিতার কয়টা লাইন শোনাই।' দাদার মুখে কবিতা শোনা এই প্রথম। কোমল গলায় তিনি শুরু করলেন,

"ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কুল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'দেখতো কি পাগলামী শুরু করেছি। তুমি যাচ্ছো ইতিহাস সৃষ্টি করতে, আর আমি বিষাদের পরিবেশ রচনা করছি।'

কোন কথা না বলে কাল রাতে লেখা জবানবন্দীটা দাদার হাতে তুলে দিলাম। অনেকক্ষণ তিনি লেখাটার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'I may be worthy offering to Him — এই তো আমাদের সবার মনের একান্ত কামনা দিদি। যত্ন করে এটা তোমার কাছে রেখে দিও। একদিন আমরা কেউ থাকব না, কিন্তু আমাদের মনের এই কথা মানুষ সহজে ভুলবে না, ভুলতে পারবে না।'

দুপুর বেলায় সবাইকে একসাথে বসিয়ে খাওয়ালেন মাষ্টারদা। তারপর আমরা

সবাই গিয়ে বসলাম ভিতরের ঘরে। দাদা আর একবার ক্লাবের ম্যাপটা খুলে নিয়ে বসলেন। কে কোথায় থাকবে, কেমন করে আক্রমণে যাবে এক এক করে সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। তারকেশ্বরদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়দ্রথকে সব বুঝিয়ে বলা হয়েছে তো?' তারপর ম্যাপটা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'যাও সব, বিশ্রাম করো, সন্ধ্যার পর পরই তো তোমাদের রওনা হতে হবে।'

আমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন দাদা। পাগড়ীটা কিছুতেই বাঁধতে পারছিলাম না, দাদা এসে কায়দাটা দেখিয়ে দিলেন। প্রস্তুত হয়ে একে একে ঘরে এসে ঢুকলেন — কালীদা, প্রফুল্ল, সুশীলদা, মহেন্দ্রদা, শান্তি, বীরেশ্বর, পান্না। সবাইকে এক এক করে দেখে নিলেন মাষ্টারদা। সন্ধ্যা তখন ঘোর হয়ে গিয়েছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার। আমরা সবাই মাষ্টারদা, তারকেশ্বরদাকে প্রণাম করে মাদুরের উপর গিয়ে বসলাম। দাদা কোমলকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন — 'জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তঋণ ওদের রক্ত দিয়েই আজ শোধ করতে হবে। এই দায়িত্ব তোমাদের। সবাই দেখবে অপমানের জবাব দিতে আমরা আর পিছিয়ে থাকব না।'

শেষবারের মত মাষ্টারদাকে প্রণাম করে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। শেষ সময়ে মাথায় হাত দিয়ে দাদা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেন আশীর্বাদ করে বলছিলেন, 'যাও, জীবনের স্বপ্ন মরণেই সফল করে এসো।'

পাহাড়ের গোড়ায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে অপেক্ষা করতে হল অনেকক্ষণ। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। ক্লাবের মধ্য থেকে ওদের হুল্লোড় চ্যাঁচামেচির আওয়াজ মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই আর ধৈর্য রাখতে পারছেন না। অথচ 'সংকেত' পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবছি, তাহলে কি আমাদেরও শৈলেশ্বরদার মত ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে? এইসব চিন্তায় যখন অস্থির হয়ে আছি, সংকেত পাওয়া গেল। একবার রামকৃষ্ণদা, নির্মলদা, মাষ্টারদার মুখটা স্মরণ করে নিলাম। মনে পড়ল বিদায়বেলায় মাষ্টারদার শেষ কথা, 'Act, act in the living present, heart within and God overhead'. নিজের সমস্ত শক্তি সংহত করে নির্দেশ দিলাম, 'চার্জ।' তিনদিক থেকে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের উপর।

মাষ্টাবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

হিমশীতল নীরবতা নেমে এল যেন। সবাই ফিরে এসেছে তারা। শুধু.........। কাট্টলীর সমুদ্রতীরের সেই রাতের কথা মনে পড়ে যায় কালীকিংকরের। ট্রেনিং নেওয়ার পর সবে তারা বিশ্রামের জন্য বসেছে। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে

পড়ছে তাদের পায়ের কাছে। উঠতে যেয়ে হঠাৎ পাথরে লেগে পা কেটে গিয়েছিল তার। রাণী দৌড়ে এসে জায়গাটা চেপে ধরেছিল। রাণীর সেদিনের দরদভরা মুখ এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

'তারপর কি হল কালীকিংকর ?' মাষ্টারদার কথায় চমকে উঠল সে। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল।

'রাণী চার্জ বলতেই আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সাহেবরা তখন নাচে গানে মত্ত। পিকরিক এ্যাসিডে পূর্ণ একটা বোমা বজ্রের মত ভয়ঙ্কর শব্দে হলঘরে ফেটে পড়ল। রাণী ছিল সবার আগে। দেখে মনেই হচ্ছিল না এই তার প্রথম অভিযান। আমার ডান দিকে ছিল সে। রিভলবার হাতে আমরা হলঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বিলিয়ার্ড ঘর অবরোধ করল বীরেশ্বর, প্রফুল্ল ও পান্না। মহেন্দ্র ও সুশীল আর একটা ঘরের দিকে গুলী চালাতে লাগল। জয়দ্রথ খালি হাতেই সাহেবদের আক্রমণ করলেন। বোমার বিস্ফোরণে, গুলীর শব্দে, সাহেবদের মরণ চীৎকারে এলাকাটা দক্ষযজ্ঞে পরিণত হল।'

এটুকু বলেই থেমে যায় কালীকিংকর। প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রদীপের ম্লান আলোয় লক্ষ্য করে মাষ্টারদা নিশ্চল পাষাণের মত মুখ করে বসে আছেন। সে ভাবে, তার কথা কি মাষ্টারদা শুনেছেন! তারপর একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে। কাজ শেষ করার পর আমরা সবাই নিরাপদে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে রাণী ....' আর বলতে পারে না কালীকিংকর। একরাশ কান্না এসে তাঁর কণ্ঠরোধ করে।

যেখানে কালীকিংকর শেষ করেছেন সেখান থেকেই শুরু করেন বীরেশ্বর। 'রাণীর দেহ ক্লাব গেটের বাইরেই পড়ে রইল। সে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করেছে। আমরা সবাই জড় হয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছি, তারপর ....।' বলতে বলতে বীরেশ্বরের গলা ধরে আসে। সে লক্ষ্য করে মাষ্টারদা নিজেকে সংবরণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তাঁর চোখের পাতা দ্রুত ওঠানামা করছে। অভিযানের সাফল্যের আনন্দ যেন রাণীর বিয়োগ ব্যথার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে।

একটা দমকা হাওয়া এসে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে সবাই নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। শুধু মাষ্টারদা বলতে পারেন, 'জানালাগুলো বন্ধ করে দাও মহেন্দ্র।'

অভিযানের আগের দিনের কথা বারবার মনে পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় রাণী এসে পাশে বসেছিল। বলেছিলাম, একটা কবিতা শোনাও তো দিদি। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর শুরু করল,

"কেবল তব মুখপানে চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণী খানি বাহিয়া।"

কবিতা শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বুঝলাম আমাকে বিশেষ কিছু বলবে বলে সে বসে আছে। তারকেশ্বরবাবু বাইরে বেরিয়েছেন। ছেলেরা অন্য ঘরে বসে কথা বলছে। মাঝে মাঝে ওদের উচ্ছল হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। আমরা দু'জনে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে বসে আছি। পিলসুজের উপর প্রদীপটা জ্বালিয়ে রাণী আবার পাশে এসে বসল।

বললাম, 'আমায় কিছু বলবি দিদি?'

তবুও রাণী চুপ করে রইল। পিলসুজের ম্লান আলো এসে ওর চোখে মুখে পড়ছিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম ওর মুখের দিকে। কত বিচিত্র ভাবের খেলা যে চলছিল রাণীর সমগ্র মুখ জুড়ে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে রাণী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'দাদা আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারি নি। আমি জানি এ প্রগলভ মনের হঠাৎ উচ্ছ্বাসের কথা নয়। ওর ভেতরটা যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ও আমার আনন্দের উৎস — নির্দোষ, নিষ্পাপ। রাণীর মধ্যে যত গুণ দেখেছি, আর কোন মানুষের মধ্যে আমি তত গুণ দেখিনি। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে বললাম, 'এমন ইচ্ছা কেন দিদি?'

রাণীও তখন যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। জবাব না দিয়ে একদৃষ্টে পিলসুজের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কোনমতে উঠে গিয়ে নিভন্ত প্রদীপের পলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার মুখোমুখি এসে বসল। বুঝলাম, রাণী এবার তার অন্তরের কথাটা বলতে চায়।

'কাউকে তো জীবন দিয়েই শুরু করতে হবে দাদা', রাণী বলে যেতে থাকে। 'দেশের লোকের ধারণা মেয়েরা দুর্বল, ঘরেই তাদের ভাল মানায়। কিন্তু এই সংস্কার ছিন্ন করার সময় এসেছে। আজ দেশের সামনে প্রমাণ করতে হবে আত্মোৎসর্গের ক্ষেত্রেও আমরা ভায়েদের থেকে পিছিয়ে নেই। তাহলেই আমার বিশ্বাস, বাংলার বোনেরা দুর্বলতা ত্যাগ করে হাজারে হাজারে এসে বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দেবে।'

তারপর যেন অনুনয়ের সুরেই বলল, 'জীবন দিয়ে আমি এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই দাদা। চন্দননগরে সুহাসিনীদি miss করেছেন। আমি যখন সুযোগ পেয়েছি তখন হারাতে চাই না। আপনি অনুমতি দিন।'

বুকটা কেমন গর্বে, আনন্দে ভরে উঠল। ওর মনের জোর, সংকল্পের দৃঢ়তা, সাহস, বীরত্ব, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর মমতাভরা ব্যবহারের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। কিন্তু ও যে.........।

'কি ভাবছেন দাদা?'

চমকে উঠলাম রাণীর কথায়। তাকিয়ে দেখলাম আগ্রহভরে চেয়ে আছে ও আমার মুখের দিকে। প্রদীপের ম্লান আলোয় ওর মুখে সেদিন যে অপূর্ব সুষমা দেখেছিলাম, তা

কখনও ভুলতে পারব না। আমার স্মৃতিপটে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

'আমি তা হলে কি করব দাদা?'

ওর মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর বললাম — 'আমাকে একটু ভাবতে দাও রাণী।'

বিছানায় এসে যখন আশ্রয় নিলেন মাষ্টারদা রাত তখন দশটা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। টিনের চালের উপর বৃষ্টির সেই আওয়াজ শুনতে মন্দ লাগছিল না। শিয়রের কাছে জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বর্ষায় প্রকৃতি যেন তার সমস্ত মলিনতা ধুয়ে মুছে সাফ করে নিজেকে আরও শুদ্ধ আরও সুন্দর করে সাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। দূরের গাছগুলোর নিকশ কালো আকৃতি যেন তাতে থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য ছাপিয়ে একটা চিন্তা বারবার মাষ্টারদার মনের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। 'কাল কি বলব রাণীকে? মরণ বরণের যে অনুমতি সে চেয়েছে তাই কি ....।' কিছুতেই মনস্থির করতে পারেন না তিনি। শুধু ভাবতে থাকেন — 'কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য, সব তুচ্ছ করে মাতৃমুক্তি যজ্ঞে জীবন উৎসর্গ করেছে; কত স্নেহময়ী জননী বুক শূন্য করে তাঁর সোনার সন্তানদের স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছে — কে তার খবর রাখে? ঝর ঝর করে চোখের জল ঝরতে থাকে মাষ্টারদার। চোখের উপর বালিশটা চেপে ধরে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকেন তিনি। একটা বিচ্ছেদ বেদনা যেন তার বুকটা খান খান করে দিতে থাকে। নরেশ, বিধু, টেগরা, রামকৃষ্ণ, ভোলা ....। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না মাষ্টারদা। 'চাপিতে গেলে উঠে দু'কূল ছাপিয়া।'

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেল মাষ্টারদার। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আকাশ পরিষ্কার, নির্মল, পূবদিক রাঙিয়ে সূর্য উঠবে একটু পরেই। মনে মনে ভাবলেন, আজ ২৪শে সেপ্টেম্বর, ইতিহাস সৃষ্টি করবে রাণী। রাণীর শেষ ইচ্ছাপত্রে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে থাকেন তিনি। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে ইংরাজীতে তিনপাতার এই বিবৃতির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন, তারপর পড়তে শুরু করেন — "....... We are fighting freedom's battle. Todays action is one of the items of that continued fight. British people have snatched away our independence, have bled India white and have played havoc with the lives of millions of Indian both male and female. ....In a fight for freedom we must be ready to remove, by any means whatsoever, every obstacle that stand in our way.

......Unfortunately there are still many among my countrymen

who may be shocked to learn how a woman brought up in the best tradition of womanhood has taken up such a horrible deed as to massacre human lives.

....If sisters can stand side by side with the brothers in satyagraha movement why are they not so entitled in a revolutionary movement ? It is because the method is different or because females are not fit to take part in it ? As regards the method, i e., armed rebellion it is not a novel method. It has been successfully adopted in many countries and the female have joined it in hundreds. Then why should India alone regard this method as an abominable one ?"

পড়তে পড়তে গর্বে বুক ভরে ওঠে মাষ্টারদার। সংকল্পের দৃঢ়তা, যুক্তির প্রখরতা তাকে মোহিত করে। আবার পড়তে শুরু করেন তিনি, "Females are determined that they will no more lag behind and stand side by side with their brothers in any activities however dangerous and difficult. I earnestly hope that my sisters will no more think themselves weaker and will set themselves ready to face all dangers and difficulties and join the revolutionary movement in their thousands".

'এটাই হল আসল কথা', মনে মনে ভাবেন মাষ্টারদা। রাণী আত্মাহুতি দিয়ে দেশের মা-বোনেদের মনে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চায়। রাণীর হাসি হাসি মুখটা চোখের সামনে দেখতে পান মাষ্টারদা। আপন মনেই বলতে থাকেন, 'ফুলের মত পবিত্র এই নিষ্পাপ প্রাণকেই তো দেশমাতৃকার চরণে নিবেদন করতে হবে। তার দুঃখ কিসের ?'

বোমা রিভলবার ও রাইফেল

প্রীতি সম্মেলনে ইউরোপীয়ানদিগকে আক্রমণ

পুরুষের বেশে বিপ্লবী নারী নিহত

কুমারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বলিয়া সনাক্ত

চট্টগ্রাম, ২৫শে সেপ্টেম্বর, গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় বিপ্লবী বলিয়া বর্ণিত একদল লোক, পাহাড়তলী ইনস্টিটিউট নামক আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাবে অতিশয় দুঃসাহসিকভাবে ইউরোপীয়ানদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণকারীর দলে পুরুষের বেশে সজ্জিত একজন নারীও ছিল। এপর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ৭/৮ জন লোক বোমা, রিভলবার এবং রাইফেল লইয়া ক্লাবটি আক্রমণ করিয়াছিল। কারণ ঘটনাস্থলে রাইফেলে ব্যবহৃত কয়েকটি কার্তুজ পাওয়া

গিয়াছে। ফাটে নাই — এমন কয়েকটি বোমাও নাকি পুলিশ পাইয়াছে। প্রকাশ যে ক্লাবের উপর কতকগুলি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

আরও প্রকাশ যে রিভলবার ও রাইফেল সহ দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ চলিয়াছিল।

....

একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আক্রমণকারী দলের আর সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। পুরুষের পোযাকে সজ্জিত এই নারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ ক্লাব হইতে 'কিছু দূরে' পড়িয়াছিল।.............

প্রকাশ যে, এই স্ত্রীলোকটিকে কুমারী প্রীতি ওয়াদ্দেদার বি. এ. বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। সে নাকি চট্টগ্রাম শহরের শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু ওয়াদ্দেদারের কন্যা। তাহার পকেটে রিভলভার ও রাইফেলের কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬. ৯. ১৯৩২)

কাগজটা ধীরে ধীরে পাশে সরিয়ে রাখেন মাষ্টারদা। সন্ধ্যাবেলায় এসেই তারকেশ্বরবাবু যেন আবার কোথায় বেরিয়েছেন। দুদিন ধরে সমানে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তবুও গুমোট ভাবটা কাটছে না। দরজাটা খুলে মাষ্টারদা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। একটা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল তার চোখেমুখে। সামনের পাতাবাহার গাছটার উপর বৃষ্টির জল পড়ে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। ঐ গাছটাকে রাণী খুব পছন্দ করত। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন রাণী বাগানের পিছনের দিকের ঐ গাছটার পাশে যেয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়াত। বুক চিরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে মাষ্টারদার।

'দাদা দেখেছেন?' একটা খবরের দিকে মাষ্টারদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারকেশ্বর।

"প্রকাশ যে, আগামী বুধবার বিশিষ্ট শহরবাসিগণ একটা সভা করিয়া এই ঘটনার ও বিপ্লবী দলের তীব্র নিন্দাবাদ করিবেন।"

খবরটা পড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন মাষ্টারদা। তারপর তারকেশ্বরবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হায়রে! নিন্দাবাদ! ওরা জানতেও পারলো না, কতবড় মহাপ্রাণ নিঃশেষে সর্বস্ব দিয়ে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। এই তো স্বাভাবিক তারকেশ্বরবাবু। নিন্দাবাদই তো আমাদের প্রাপ্য। দুঃখ কিসের।'

প্রথম যেদিন দেখা হয় সেদিনের কথা মনে পড়ে যায় মাষ্টারদার। কয়েকদিন আগে লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, ও আসতে পারবে কিনা। বলেছিল, পারবে, কোন বাধাই আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। রাত তখন দশটারও বেশী। আমি আর নির্মলবাবু উঠোনে বসে আছি, আর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। বুঝতে পারছি নির্মলবাবু ক্রমশই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এমন সময় রাণী এল। দেখলাম, এতদূর

হেঁটে এসেছে, কিন্তু চেহারায় কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। চোখেমুখে একটা আনন্দের আভাস খেলে যাচ্ছে।

আমাকে প্রণাম করে সে দাঁড়িয়ে রইল। মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাকে আশীর্বাদ করেছিলাম। কি আশীর্বাদ করেছিলাম কে জানে! মনে হয়, তাকে আশীর্বাদ করেছিলাম — 'রাণী আত্মহুতি দিয়ে তুমি অমর হও।''

পরদিন সকালবেলায় রাণী একটা কবিতা শুনিয়েছিল। কবিতার সেই কয়লাইন যেন এখনও কানে বাজছে।

'যে খুশি টিটকারী দিক্
অন্তরে বুঝেছি ঠিক
এ কেবল নহেক হুজুগ
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এলো নবযুগ!'

আবৃত্তি শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'মেয়েদের আপনারা নিতে চাইতেন না কেন দাদা?'

বলেছিলাম এই সমাজে মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে রক্তাক্ত পথ গ্রহণ করবে এটা আমরা ভাবতেই পারতাম না। কিন্তু আমার সেই চিন্তা যে ঠিক নয় তা তোমরাই প্রমাণ করে দিলে। তোমাদের ঐকান্তিক আগ্রহই আমাকে পথ দেখিয়ে দিল রাণী।

পায়ে পায়ে কখন যে কাট্টলীর সমুদ্রতীরে এসে হাজির হয়েছেন তা নিজে৽ টের পান না মাষ্টারদা। গভীর রাতে গর্জনমুখর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপ তিনি বহুবার দেখেছেন। কিন্তু আজ সমুদ্র বড় শান্ত। ছোট ছোট ঢেউ যেন আজ নিতান্ত অনিচ্ছা ভরে পাড়ে এসে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন কোন তাড়াহুড়া নেই। কোন ব্যস্ততা নেই। সমুদ্রের বুকে আলোর ফুলকি মাঝে মাঝে জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। বাতাস বইছে মৃদু মন্দ গতিতে। দ্বিতীয়ার চাঁদ স্বল্পশক্তি নিয়ে অন্ধকার ঘোচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

'ঘরে চলুন দাদা' — চমক ভাঙ্গল তারকেশ্বরের কথায়।

'এখানেই তো ওরা ট্রেনিং নিতে আসত তারকেশ্বরবাবু?'

স্মৃতির বেদনাভারে মাষ্টারদার হৃদয় যে রক্তাক্ত হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না তার। দাদার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় সে আগেও পেয়েছে। কিন্তু রাতের শেষ প্রহরে বিশাল শান্ত সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হল এই মানুষটার হৃদয়ের গভীরতা সমুদ্রের চেয়েও অনেক অনেক বেশী। কত মণি মুক্তা হীরা মানিক যে সেখানে সবার অগোচরে রয়েছে কে তার খবর রাখে। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথাই সে বলতে পারে না। অনন্ত সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য দু-চোখ ভরে পান করতে থাকেন মাষ্টারদা। তাঁর কেবলই মনে হয়, 'স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা একটা পবিত্র ফুল তার মত দীন

পূজারীর কাছে এসেছিল দেশমাতৃকার চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল বাসনা নিয়ে।' সমস্ত শক্তি সংহত করে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করতে থাকেন মাষ্টারদা। তারকেশ্বর অনুভব করতে থাকে তার হাতের মধ্যে মাষ্টারদার হাত যেন থরথর করে কাঁপছে।

চিরবিদায়ের দিন সন্ধ্যাবেলায় রাণী চলে এসেছিল আমার ঘরে। মনের মত বীরসাজে তাকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম নিজের হাতে। সাজিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, 'তোকে এই শেষ সাজ সাজিয়ে দিলাম রাণী। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না।' যে হাসি সেদিন তার মুখে দেখেছিলাম তা কোনদিন ভুলতে পারব না। কত কথাই না ছিল তার মধ্যে! অভিমানভরা গৌরবের সেই হাসিটুকু স্মরণ করে আজ মনে হচ্ছে সে যেন আমাকে আরও ঐশ্বর্যময় করে রেখে গিয়েছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মাষ্টারদা। চারদিকে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। প্রকৃতি যেন মেনকা মায়ের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে — 'ফিরে আয়, ফিরে আয়।' আজ বিজয়া।

ঘরে রাখা হারিকেনটা একটু বাড়িয়ে মাষ্টারদা কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েন। চোখবুজে একমনে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুরু করেন —

"আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে। কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ — এবারকার বিজয়া যেন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান! ...."

এক মনে লিখে চলেন তিনি। বিপ্লবী ভায়েদের কথা, নিজের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা, সংকল্প দৃঢ়তার কথা। লিখতে থাকেন মাষ্টারদা —

"সে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে — আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।"

চিন্তা করে আবার শুরু করেন মাষ্টারদা।

"তার অপূর্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে — তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না ওঠে।"

চোখের জলে লেখা শেষ করে কলমটা রেখে বাইরে এসে দাঁড়ালেন মাষ্টারদা। কর্ণফুলীর দিক থেকে বয়ে আসা হাওয়া কাশফুলগুলোকে আন্দোলিত করে দূরে চলে যাচ্ছে। মাষ্টারদার মন যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল। তিনি দেখলেন, ভোর হয়ে এসেছে, অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, নতুন দিনের সূর্য দিগন্ত রাঙিয়ে এখনই উঠবে পূব আকাশে — আর দেরী নেই।

— ০ —

পরিশিষ্ট

বিজয়া

সূর্য সেন

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে। কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ — এবারকার বিজয়া যেন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান!

জীবনে যা দেখিনি, জীবনে যা পাইনি, জীবনে যা শিখিনি, এমন কত অভিনব জিনিষ নিয়েই বিজয়া এলো আজ আমার কাছে! কত নূতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এলো।

গত দু'মাস যেন আমার জীবনের অভিনব, অভূতপূর্ব্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল।

আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে। এই দু'মাসে সবকিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনেও পাইনি, বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুময় করে তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য — একান্ত দুর্ভাগ্য যে, এমন প্রাণমাতানো আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে।

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলো, এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কত আদরের ভাইবোনের জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম — আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম — আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে।

আজ মনে পড়ছে, কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করেনি, একটু সঙ্কোচ করেনি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আজ এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মত কঠিন হৃদয়ের চোখেও জল আসছে — তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে করে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে।

নরেশ, বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু,অর্দ্ধেন্দু, প্রভাস, নির্ম্মল, পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আন্দু, অমরেন্দ্র, মনা. রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ, ভোলা — সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম — কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি — কতজনকে অন্তরীণে,

কারাগারে, নির্ব্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি — দেশের উপর গভর্নমেন্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে?

মা, আনন্দময়ী মা আমার, আজ তোমার বিসর্জ্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি — আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি?

পনের বৎসর আগে অনেক ভেবেচিন্তে, ভালমন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম, আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি।

দুর্ব্বলতা কি আসতে চায়নি? কত রকমের দুর্ব্বলতা আসতে চেয়েছে, কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে তো ছাড়িনি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে, আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক।

এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশী — সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথে আমি চলেছি — এখনও কোন দ্বিধা আসেনি।

মা, তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আর যদি ঠিক পথেই আমি চলে থাকি, তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে শক্তিমান করে দাও — আমার মধ্যে যেন কোনরকমের দুর্ব্বলতা না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোনদিন এক চুলও না সরি।

আমি যেন বড় নিঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথচলা যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে; তাই অতি আদরের ছেলে, মেয়ে, ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে।

হয়ত তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন — সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, মর্ম্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কত স্নেহময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্ম্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন। কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠেছে — বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তাঁর কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে।

বাপ তাঁর আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন। ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে! কত বড় অভাববোধ তাঁদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে! এ সব ভেবে আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে।

আবাব তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? এত মায়ের

চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করছি?

যদি তাই হয়, তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি কান্নাটিকে বুকে চেপে ধরে আছি — এই আশায় যে, এ সকল পবিত্র শ্মশান-স্তূপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্ম্মিত হবে।

পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে।

যাকে নিজ হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, 'তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না,' তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল।

সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অফুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারব না — শেষ করতে চাইও না। তা যেন আমার জীবনে নিত্য নূতন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে, দিন দিন উন্মত্ত করে তোলে।

সে তো নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মরজগতে আমরা তার বিসর্জ্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আজ বিজয়ার দিনে, সে দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে মর্মে মর্মে কান্নার সুর তুলছে — চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না — 'চাপিতে গেলে উঠে দু'কূল ছাপিয়া।'

সে যে আমার আনন্দের উৎস — নির্দোষ, নিষ্পাপ ছিল — সুন্দর পবিত্র মহান্ ছিল। তার মধ্যে একাধারে যত গুণ দেখেছি, আর কোন মানুষের মধ্যে আমি তত গুণ দেখিনি।

তার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখিনি। তার সরলতা, বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না।

সর্বোপরি, কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যেভাবে বজায় রেখেছিল, তা দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়।

এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম — হৃদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়েছিলাম — প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে

পাইনি।

এত স্নেহের, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে এলাম। তাই সেদিনের কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছে, মনে পড়ছে সেই প্রতিমাটিকে।

যে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে — আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুরদলনী মা আমার! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, তুমি আমায় এই বর দাও — যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়,তার গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি।

তার অপূর্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে — তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না ওঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি — রাণী, তোকে আমি কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি; আজ বিজয়ার দিনে তোর দাদার সব দোষত্রুটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভিমান রাখিস্ না।

তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি — তোর ভগবৎ-ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি; তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি।

এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনোদিন ইতস্ততঃ করিনি, মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোনদিন রাগ করিস্‌ও নাই।

শেষ মুহূর্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস্। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস্, সেখান থেকেই আমার সব দোষত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা।

শেষ মুহূর্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তো তুই দেখছিস্। তোর দাদা যেন শান্তি পায়, তার ব্যবস্থা তুই করে দে।

তোর কি মনে নাই, তুই তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস্ না? তাই আবার বলছি, আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষত্রুটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া সম্ভাষণ গ্রহণ কর্। আমার স্নেহের সম্ভাষণ — শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি।

আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ-বিসম্বাদ, দোষ-ত্রুটি

সবই ভুলে যাওয়ার দিন। আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম, দূর থেকেও সে আনন্দ তুই আজ আমাকে দে।

এমন সুন্দর দিনে মায়ের নামটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মত নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কাউকে আমি পাইনি। বাস্তবিক ফুলেরই মত তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান্ ছিলি। তোর অপূর্ব আত্মদান তোকে আরও সুন্দর, আরও মহনীয় করে তুলেছে।

বরদাত্রী মা আমার — আমায় আশীর্বাদ কর যেন আমার স্নেহের প্রতিমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ দেখেছি, তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে।

প্রীতিলতার উদ্দেশে সূর্য সেনের
"Female Organisation" প্রবন্ধের
উৎসর্গ পত্র

স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে এই দীন পূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল আকাঙক্ষা নিয়ে। পূজারীকে কত বড়ই সে মনে করেছিল। কত বড় শ্রদ্ধার আসন তাকে দিয়েছিল, মায়ের কাছে উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য। পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে। তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষে মায়েরই চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাঙক্ষা পূর্ণ করেছে। সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, মা তাকে কত যত্নে কত আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন।

পূজারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলের মহত্ত্বটুকু নষ্ট করে না ফেলে।

(প্রবাসী, ১৩৫৬, বৈশাখ সংখ্যা থেকে গৃহীত)

নারী সংগঠন

সূর্য সেন

(গ্রেপ্তার হওয়ার সময় মাষ্টারদার নিকট এই প্রবন্ধটি পাওয়া যায় — সম্পাদক)

Act, act in the living present,
Heart within and God overhead.

১৯২৯ সালে তার নাম আমি প্রথম শুনি, তখন আমরা female organisation-এর জন্য মনোযোগ দিই নাই, মেয়েদের সমিতির মধ্যে এনে বিপ্লবের কাজের জন্য তাদিগকে তৈয়ের করে তোলা সম্ভব হবে বলে মনে করি নি কারণ আমাদের সমাজের যেরূপ রীতিনীতি তার মধ্যে থেকে মেয়েদের পক্ষে পূর্ণভাবে সমিতির কাজে যোগ দেওয়া খুবই শক্ত, মেয়েদের সঙ্গে organiser-দের মেশার পক্ষেই যথেষ্ট বাধা, তাই আমরা মনে করতাম মেয়েরা ত খুব কমই বিপ্লব সমিতিতে আসতে পারবে আর এলেও তাদিগকে ছোটখাট কাজের helper হিসাবে রাখা চলবে — practical action-এ অর্থাৎ হত্যা, আক্রমণ প্রভৃতি কাজে পাঠান যাবে না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে এক দিন অসীম* আমায় বলল যে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দুই তিন জন মেয়ের সঙ্গে মিশে তাদিগকে ধীরে ধীরে বিপ্লব সমিতিতে আনবার চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হয়েছে। অসীম আমাদের সমিতির একজন সদস্য। সে আমায় খুব মেনে চলত এবং চট্টগ্রামে থাকলে এক দিনও আমার সঙ্গে না মিশে থাকতে পারত না, আমার অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সঙ্গেও মিশত কিন্তু আমার সঙ্গেই তার মেশাটা খুব বেশী ছিল। এজন্য অন্যের কাছে যা বলতে সাহস করত না, আমার কাছে তার সব প্রাণ খুলে বলত। আমার সহকর্ম্মী নির্ম্মল, অনন্তলাল, গণেশ প্রভৃতি female organisation-র কথা শুনলেই রেগে উঠত এবং কেউ মেয়েদের সমিতিতে আনবার চেষ্টা করছে শুনলে তাকে সমালোচনা করে নাস্তানাবুদ করত। তাই আর কাউকে কথাটা না বলে আমাকেই বলেছিল। আমি যদিও মেয়েদের সমিতিতে আনবার কোন চেষ্টা তখনও করি নি, এবং চেষ্টা করবার জন্য কাউকে বলিও নি তবু সে চেষ্টা করছে শুনে খুশীই হলাম। তাকে বললাম "চেষ্টা কর, অন্ততঃ নানা বিষয়ে সাহায্যও করতে পারবে", সে বলল, যাদের চেষ্টা করেছি তাদের মধ্যে আমার নিকট আত্মীয় জগৎবন্ধু ওয়াদ্দারের মেয়ে রাণীই সবচেয়ে ভাল। সে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়,

* বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদারের ছদ্মনাম

সম্পর্কে আমার বোন, তাই তার সঙ্গে মিশতে আমার কোন অসুবিধে নেই। সে আমার কথা খুব মেনে চলে, পড়াশুনায় ভাল। খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে এখন ঢাকা ইউনিভারসিটিতে আই-এ, পড়ছে।" তখনও মেয়েদের সমিতিতে আনবার বিশেষ আগ্রহ আমার হয় নি। তবু helper হিসাবে পাওয়া গেলে মন্দ কি, এই ভেবে তাকে উৎসাহ দিলাম। চেষ্টা করতে বললাম, কিন্তু মেয়েদের উপর তেমন কোন আশা তখনও করি নি।

অসীম রাণী নামই বলেছিল — স্কুলে অথবা কলেজে তার যে অন্য কোন নাম আছে তা বোধ হয় বলে নি। তাই সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে তার আসল নাম 'রাণী' বলেই আমার ধারণা ছিল। তিন বছর পরে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার কয়েক মাস আগে জানলাম যে তার নাম প্রীতি। তখন মনে করেছিলাম, ওর নাম বোধ হয় প্রীতিরাণী, তাই সংক্ষেপে করে বাড়ীতে রাণী ডাকে। কিন্তু রাণীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রাণীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তার স্কুলের নাম হচ্ছে প্রীতিলতা — আর বাড়ীর ডাকনাম রাণী, প্রীতির সঙ্গে রাণীর কোন সম্পর্ক নেই।

অসীম তখন কলকাতায় পড়ত। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে রাণীর কাছে চিঠি দিয়ে দেশের কাজের প্রতি তার মন আকৃষ্ট করত। রাণী অসীমের চিঠিগুলি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে পড়ত, আর দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গ করার জন্য নিজেকে তৈয়ের করছিল। অসীমের কাছে প্রথম বারেই শুনলাম খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে class X-এ পড়ার সময়ই রাণীকে সে প্রথম বিপ্লব সমিতির idea দিয়েছিল এবং আমার নাম করে আমাকে সমিতির চালক বলে প্রথম দিনেই তাকে বলেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কত প্রশংসা তার কাছে করেছিল। রাণীর কাছে শেষে শুনেছি যে সেইদিন থেকেই আমাকে তার হৃদয়ের মধ্যে খুব বড় শ্রদ্ধার আসন দিয়ে রেখেছিল এবং সুদীর্ঘ চার বৎসর আমার সঙ্গে দেখা করার উপযুক্ত করে নিজেকে তৈরি করেছিল।

অসীমের কাছ থেকে রাণীর কথা শুনে তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার মোটেই হয় নাই, কারণ আমার সঙ্গে দেখা করার মত উপযুক্ত সে তখনও হয় নি বলে আমার ধারণা ছিল; আর দরকারও মনে করি নি। অসীমেরও তখনও ধারণা হয় নি যে মেয়েদের helper হওয়া ছাড়া আর কোন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা যাবে। অসীম তাদিগকে sympathiser হিসাবে তৈয়েরী করছিল, তাই অসীমও রাণীর সঙ্গে দেখা করার কথা তখনও আমাকে বলেনি। দেখা করার মত উপযুক্ত হয়েছে বলেও মনে করেনি। রাণী ছাড়া আর দুটি মেয়েকে সে তখন সমিতির সদস্য করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বেশী আশা সে দিতে পারল না, আমি অসীমকে বললাম "কতদূর সহানুভূতি তাদের দু'জনের কাছ থেকে পাবে সেটা পরীক্ষা করে দেখ না।"

ওরা কলেজে পড়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা পায়, সমিতির জন্য মাসে মাসে কিছু অর্থসাহায্য ত অনায়াসে করতে পারে, এটা পারে কিনা দেখ না।

অসীম তাদের কাছ থেকে টাকা চাইতে খুব লজ্জা বোধ করত। তবুও আমার কথা মত সসঙ্কোচে দু'একবার চেষ্টা করে বিশেষ কৃতকার্য্য হতে পারে নি, তখন থেকেই ঐ দুই মেয়ের সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা হয় নি, কিন্তু অসীম ঐ দুই জনের মধ্যে ছোটটির উপর কিছু আশা করত।

ঐ গ্রীষ্মের ছুটিতে অসীমের কাছ থেকে রাণীর কথা আরও দু-তিন বার শুনলাম। ছুটির পর অসীম কলকাতায় চলে গেল, রাণীও ঢাকা চলে গেল। পূজার ছুটিতে অসীম বাড়ী এসে আমার সঙ্গে দেখা করল, এই কয় মাসের মধ্যে আমি মেয়েদের সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করিনি, কারণ আগেই বলেছি আমি মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশা করি নি, তবে এই মনে করেছিলাম যে sympathiser হিসাবে কয়েকজনকে পেলে মন্দ কি? এই ছুটিতেও অসীম রাণীর এবং অন্যান্য মেয়েদের কথা কয়েকবার বলেছিল, ওর কথায় বুঝলাম রাণী ক্রমে উন্নতি করছে। এই ছুটিতে শেষের দিনে সে আমায় বলল যে আর একটি মেয়েকে সে recruit করার চেষ্টা করছে, তার নাম অনীতা*, কলকাতায় 1st year class-এ পড়ে (রাণী তখন 2nd year-এ পড়ে)।

অসীম বলল অনীতা তার নিকট আত্মীয় নয়। তাই তার বাসায় ওর নিজের বেশী যেতে লজ্জা করে, তাই অনীতার একজন নিকট আত্মীয়কে (অসীমের বন্ধু) দিয়ে তার কাছে বই পাঠাতে হয়। আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত না হলেও অসীমকে উৎসাহ দিতে কৃপণতা করলাম না। আমার এই সামান্য উৎসাহটুকুও না পেলে সে female organisation ছেড়েই দিত।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমরা বিপ্লব সমিতির সদস্যেরা চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটি হাতে নিই এবং ইহার পুনর্গঠন করি। ১৯২২ সালের পর চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা ২৫/৩০ জনের বেশী থাকত না, কংগ্রেসের কোন কাজই ছিল না, ১৯২৮ সালের শেষ দিকে অন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কংগ্রেস পুনর্গঠন করে আমি তার সেক্রেটারীর পদে মনোনীত হই এবং আমাদের বিপ্লব সমিতির অনেক সদস্য কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হন।

কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনবার জন্য মে মাসে জিলা কন্‌ফারেন্স, ছাত্র কন্‌ফারেন্স, যুব কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির আয়োজন করি। মহিলা কন্‌ফারেন্স করবার জন্য কোন আয়োজন বা ইচ্ছা তখনও করি নি এমন সময় অসীম কলকাতা থেকে এল, সে এসে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে মহিলা কন্‌ফারেন্স করবার জন্য আমাদিগকে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি বললাম, "তোমরা যদি পার আয়োজন কর, আমার কোন আপত্তি নাই।" খুব উৎসাহের সহিত আয়োজন করতে লেগে গেল। এ বিষয় নিয়ে একদিন সে গণেশ, অনন্তলাল প্রভৃতির নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করতেই গণেশ তাকে মেয়েদের সঙ্গে মিশে বলে খুব একচোট তীব্র সমালোচনা

* বিপ্লবী কল্পনা দত্ত'র ছদ্মনাম

করলে। অনন্তলালও অসীমের উপর খুব চটে গেল। মোটের উপর আমাদের সহকর্ম্মীদের মধ্যে কারও কাছ থেকে সে সহানুভূতি পেল না। এতে তার মন খুব দমে গেল। আমি তাকে নিরুৎসাহ করলাম না, যদি পারে চেষ্টা করতে বললাম। তার কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে সে মহিলা কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করতে লাগল এবং কংগ্রেসের সভাপতি সম্পাদক এবং অন্যান্য নেতাদের মত করিয়ে নিল। কন্‌ফারেন্সগুলি খুব সফলতার সহিত শেষ হয়ে গেল। মহিলা কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হলেন মিসেস লতিকা বোস।

এই কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে মেয়েদের organise করা সম্বন্ধে যে তীব্র বিরুদ্ধ মন্তব্য অনন্তলাল-গণেশ প্রভৃতির কাছ থেকে শুনেছে তারপর আমার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে বলার সাহস সে কি করে পাবে। সে যে-সব মেয়ের সঙ্গে মিশত, তাদিগকে সব কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত থাকতে বলেছিল, তারাও তার কথামত কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়েছিল। তখনও রাণীকে চিন্‌তাম না কাজেই সে কন্‌ফারেন্সে গেলেও চিনি নাই, চিনবার চেষ্টাও করি নাই, খেয়ালও করিনি কারণ তখনও ভাবি নি যে রাণী একদিন মায়ের কাজে নিজেকে নিঃশেষে বলি দেওয়ার জন্য আমার শরণ নেবে, এবং আমার কাছে আপনাকে পূর্ণভাবে সঁপে দেবে।

এই পূজার ছুটির কয়েকদিন আগে চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। কমিটির কার্য্যকরী সমিতি দখল করা নিয়ে আমাদের মধ্যে এবং প্রবীণ দলের মহিমবাবুদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয়। মহিমবাবুদের দল অনেক গুণ্ডা ভাড়া করে সভা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে, ফলে আমি এবং আমাদের পক্ষের কয়েকজন আহত হই, এ সব গুণ্ডামি। আমরা সভার কার্য্যকরী সমিতি গঠন করে যখন বাসায় ফিরছিলাম তখন উক্ত গুণ্ডারা রাস্তায় আমাদের পক্ষের ছেলেদের আক্রমণ করে লাঠি, ছোরা ইত্যাদি দ্বারা প্রহার করে। ইহাতে আমাদের পক্ষের কয়েকজন বালক ও যুবক গুরুতর আহত হয়। সুখেন্দু দত্ত নামে একটি কলেজিয়েট স্কুলের Class X-এর ছাত্র ছোরার আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হয়। চট্টগ্রামে তার আরোগ্য হওয়ার আশা নাই দেখে তাকে কলিকাতা বেলগেছিয়া মেডিকেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। পূজার ছুটির মধ্যেই সে সেখানে সকলকে কাঁদিয়ে ইহলোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে। ছোট ছেলে হলেও সে আমাদের বিপ্লব সমিতির একজন খুব ভাল সদস্যই ছিল। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক— সব দিকেই সে একটি আদর্শ ছাত্র ছিল, এই বয়সের মধ্যেই সে তার জীবনের আদর্শটি খুব ভাল রূপেই বুঝেছিল এবং সেই আদর্শের জন্য নিজেকে খুব সুন্দর ভাবেই তৈরি করেছিল। তার অকাল-মৃত্যুতে আমরা কংগ্রেসের কাজে মেতে গিয়ে যে অন্যায় করেছি তা বুঝতে পারলাম। বাজে কর্ত্তৃত্বের জন্য দলাদলি করে এমন একটি সুন্দর পবিত্র মহৎ প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল এই ভেবে আমরা কংগ্রেসের অসার কাজে না মেতে বিপ্লবের কাজের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে কৃতসংকল্প হলাম। আমাদের সদস্যেরা অনেকেই গুণ্ডাদের উপর প্রতিশোধ

নেওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে গেল। আমরা ছেলেদের এই বলে থামালাম যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করা, আমরা যদি সাধারণ গুণ্ডাদের মেরে জেলে, ফাঁসিতে যাই তা হলে আমাদের আদর্শই নষ্ট হয়ে যাবে, সমিতিই ভেঙ্গে যাবে, মোটের উপর সুখেন্দুর মৃত্যু আমাদিগকে শীগগির বড় রকমের একটা action-এ নেমে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে তুলল।

এ অবস্থায় রাণীর কথা, female organisation-এর কথা আমার মনোযোগ বিশেষ আকর্ষণ করতে পারল না, তবু অসীমকে আমি উৎসাহ দিতে ত্রুটি করলাম না। আমরা শীগগির action-এ নামতে চাই, এ কথা অসীমকে জানালাম না। পূজার ছুটির পর সে কলকাতা চলে গেল। রাণীও ঢাকা চলে গেল। তার কয়েক মাস পরে রাণীর I.A পরীক্ষা, পূজার ছুটির পর আমি এবং আমার চট্টগ্রামের সহকর্ম্মীরা action-এর আয়োজনে যে ভাবে লেগে গেলাম তার মধ্যে কি রাণীর কথা কোথায় ডুবে গেল কে জানে? প্রায় ছয় মাস বিপুল আয়োজনের পর ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে, নেতারা সকলেই action-এ যোগ দেয়। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদের ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত প্রায় আড়াই ঘন্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে ব্রিটিশ সৈন্য পালিয়ে যায়। সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের ১২ জন নিহত হয়। জালালাবাদ যুদ্ধের পর পাহাড় থেকে সরে এসে আত্মগোপন করে থাকি।

প্রথম প্রথম মনে করেছিলাম এতগুলি সহকর্ম্মী নিয়ে আত্মগোপন করা অসম্ভব, কিন্তু ধীরে ধীরে একটু একটু করে সম্ভব করে তুলতে লাগলাম। ইতিমধ্যে কালার পোল সংঘর্ষ হয়ে গেল। বাকী যারা রইলাম তারা সংগোপনে থেকে নিয়মিতভাবে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করে সমিতির কাজ চালাতে লাগলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও action-এর বন্দোবস্ত করতে চেষ্টা করলাম, এভাবে কয়েক মাস থাকার পর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে অনীতার খবর এসে পৌছাল, সে আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যে আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে চায়। আর action করবার জন্য তার প্রাণ খুব ব্যাকুল হয়েছে, তখন সে পূজার ছুটিতে বাড়ী এসেছে, কয়েক দিন পর পর সে খুব তাগিদ দিয়ে পাঠাতে লাগল যে কোন রকমে আমার সঙ্গে তার দেখা না করলেই নয়। তখন আমরা চারদিকে সুন্দরভাবে communication established করে ফেলেছি। কাজেই খবর পাঠাতে বেশী অসুবিধা হচ্ছে না। তার কাছে কেউ যাওয়ার আগে সে নিজে তালাস করে link বের করেছে। বার বার খবর পেয়ে বুঝলাম অনীতা action করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে এবং সে জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করে action-এর permission নিতে চায়। তার ধারণা ছিল যে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে সে convince করাতে পারবেই। এত খবর পেয়েও দেখা করার বন্দোবস্ত করলাম না। মনে করলাম শহর থেকে একজন মেয়ে অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়ে কি করে গ্রামে এসে দেখা করবে, আর আসবার সময় যদি কোন spy টের পেয়ে অনুসরণ করে তা হলে নিজেরাও হয়ত ধরা পড়ে যাব। তা ছাড়া অভিভাবকদের

অনুমতি ছাড়া যদি আসে তা হলে মেয়ের খোঁজে শহরটা হয়ত তোলপাড় করবে। এসব নানা কথা ভেবে দেখা করার চেষ্টা করলাম না, তবে তাকে আশ্বাস দিয়ে খবর পাঠালাম যে সুযোগ পেলেই দেখা করব। সে যেন অস্থির হয়ে মাথা খারাপ না করে, ধীরে ধীরে action-এর জন্য নিজেকে তৈরি করে। শহরে তার সঙ্গে সমিতির নিয়মিত link যেন থাকে তার ব্যবস্থা করে দিলাম। সে কতকগুলি সোনার অলঙ্কার এবং টাকা সমিতির জন্য চাঁদা-স্বরূপ পাঠিয়ে দিল। আমার সঙ্গে তার দেখা করার প্রবল আকাঙ্খার কথা জেনে মুগ্ধ হলাম। মনে হ'ল মেয়েটি নিজের জোরেই নিজে অনেক এগিয়ে এসেছে। কারও সাহায্যের বিশেষ দরকার হয়নি। এ যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফল তা বুঝতে পারলাম। দেখা করতে খুবই ইচ্ছা হ'ল কিন্তু নানা অসুবিধার কথা ভেবে তখন করলাম না, শহরে তার সঙ্গে যাদের link করে দিলাম তাদের দিয়ে জেলের ভিতর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীদের কাছেও তার খবর গেল। তারা তার আগ্রহের কথা শুনে তার সাহায্য নিয়ে কলকাতা থেকে Dynamite Conspiracy-র জন্য অনেক জিনিষ আনাবার ব্যবস্থা করল। সে একটু ও দ্বিরুক্তি না করে সম্মত হয়ে গেল। জেলের ভিতরের সহকর্ম্মীরা অনীতার সাহায্য নেওয়া বিষয়ে আমার মত চাহিলে আমি ইতস্ততঃ না করেই মত দিলাম। অনীতা কলকাতা গিয়ে দরকারী জিনিষ সব কৃতকার্য্যতার সহিত নিয়ে এল, এদের তার ওপর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। জেলের ভিতর পাঠাবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র টাকা শহরে তার charge-তেই রাখলাম। ওর কাছ থেকে জিনিষ নিয়ে ভিতরে পাঠাবার বন্দোবস্ত হ'ল।

১৯৩১ সালে অনীতা ইন্‌টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী এল, আবার আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অনীতার আকুল আগ্রহ দেখে আমার রাণীর কথা মনে হ'ত, ভাবতাম অসীম আমাকে রাণীই যে তার Recruit-দের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বলে বলেছিল, অথচ তার সবচেয়ে পরের Recruit এত এগিয়ে এসেছে অথচ রাণী কোথায় গেল, রাণীর কোন খবর পাচ্ছি না। অবশ্য রাণীর কোন খবর নিজে একটুও নিই নি কারণ female-দের উপর তখনও বেশী আশা করি নি আর খবরই বা নেব কি করে?

গ্রীষ্মের ছুটির শেষ দিকে আমার খেয়াল হ'ল যে অনীতার সঙ্গে পরিচয় করে আমাদের (অর্থাৎ absconder-দের) সঙ্গে তার পরিষ্কার link করে রাখা দরকার। কারণ তার কাছে machine ও টাকা রয়েছে। link না থাকলে জিনিষগুলো আমাদের দরকারের সময় আনাব কি করে? বিশেষতঃ ইতিমধ্যে অনীতাকে I.B-রা খুব সন্দেহের চোখে দেখছে, তাকে চোখে চোখে রেখেছে, খুব সম্ভবতঃ তখন চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে রিভলবার, বোমা, ইলেকট্রিক তার, guncotton, ছোরা প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীরা বার থেকে নিয়ে স্তূপীকৃত করেছিল, Jail outbreak-এর উদ্দেশ্যে তা সব হঠাৎ জেল কর্ত্তৃপক্ষ আবিষ্কার করে ফেলেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট বাইরের যে সব ছেলের through-তে আমাদের সঙ্গে অনীতার

communication চলত তাদের সবকে ordinance-এ গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দী করেছে। এ অবস্থায় অনীতার সঙ্গে আমার দেখা করা খুবই দরকার বলে মনে হ'ল। তাই নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে খুব সাবধানে তার সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করলাম। সে ত খবর পাওয়া মাত্রই উড়ে আসতে রাজী, কিন্তু তার মত rash হলে ত আমাদের চলবে না, তাই যতদূর সম্ভব নিরাপদভাবে তার সঙ্গে দেখার বন্দোবস্ত করলাম। এই প্রথম মেয়ে সদস্যের সঙ্গে আমার দেখা করা।

বর্ষাকাল, সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। পথঘাট জলে কাদায় ভরা। রাত প্রায় ৯টার সময় দু'জন ছেলে অনীতাকে গ্রামের পথ দিয়ে প্রায় দুই মাইল পথ হাঁটিয়ে একটি বাড়ীতে নিয়ে এল। কি জল কাদার ভিতর দিয়েই না তাকে আসতে হয়েছে। আমি আর নির্ম্মলবাবু তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে যখন এল তখনও ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছিল। এসে আমাকে আর নির্ম্মলবাবুকে প্রণাম করে সে বসল। দেখলাম কাপড়চোপড় জলে ভিজে গেছে। কিন্তু মুখে একটুও ক্লান্তির চিহ্ন নাই। আমাদের সঙ্গে দেখা হবে সেই আনন্দেই সে বিভোর ছিল। আমি আর নির্ম্মলবাবু তার সঙ্গে সব দরকারী কথাগুলি বললাম। কিভাবে কার through-তে আমাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ থাকবে বললাম, machine কেমন handle করতে পারে পরীক্ষা করলাম ইত্যাদি। তাকে আবার শেষ রাত্রেই বিদায় দিতে হবে। কাজেই আমাদের যা বলার সব শেষ করে তাকে আবার ছেলেদের সঙ্গে করে শহরে পাঠিয়ে দিলাম যাতে সে ৯টা ১০টার ভিতরেই শহরে পৌঁছতে পারে। যাওয়ার সময় আরও জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। যাওয়া-আসার সময় এত কাদার মধ্যে সে একটা আছাড়ও খায়নি। এক দিনেই তার মনের জোর, শরীরের জোর, action করবার প্রবল ইচ্ছা ও ত্যাগ স্বীকার, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, অভিভাবক অগ্রাহ্য করে যখনই ডাক পড়বে তখনই চলে আসা ইত্যাদি গুণগুলি আমাদের চোখে ভেসে উঠল। অনীতার সঙ্গে কথায় কথায় রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল রাণীর সঙ্গে তার খুবই পরিচয় আছে। সে পড়াশুনায় খুব ভাল, পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে এবং মা বাপের খুব বাধ্য। সমিতির প্রতি রাণীর টান কি পর্য্যন্ত আছে তা সে জানে না, ওর কথা শুনে আমি রাণী সম্বন্ধে একটু নিরাশ হয়ে গেলাম। অনীতার এত উন্নতি দেখে এক একবার মনে হচ্ছিল রাণীর ত আরও এগিয়ে আসার কথা। কারণ অসীম তাকে সব মেয়ের চেয়ে ভাল বলে আমাকে বলেছিল। অনীতার কথায় মনে হয়, বোধ হয় guidance-এর অভাবে রাণী পেছিয়ে পড়েছে। অনীতারই যে রাণীকে বুঝতে ভুল হয়েছে একথা একবারও মনে হ'ল না। কিন্তু রাণীর সঙ্গে মিলে শেষে বুঝেছি যে অনীতা বাহিরের থেকে দেখে রাণীর ভিতরের ভাব মোটেই ধরতে পারেনি। সে সমিতির কাজ করার জন্য কত ব্যাকুল হয়েছিল মোটেই বুঝতে পারে নি। যখন অনীতা রাণী সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য দিচ্ছিল তার বহু আগে থেকে রাণী আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অতি ব্যগ্র হয়েছিল।

যাক্ অনীতা সেই ঝড়ের রাতে জলকাদা ভেঙে আবার বাড়ী ফিরে গেল। তার

পরে অন্য ছুটিতেও তার সঙ্গে আরও দু-এক বার দেখা হয়েছে। তখন অনীতা চট্টগ্রাম কলেজে পড়ছিল। রাণীর খবর আগের চেয়ে ভাল কিছুই বলল না। কাজেই রাণীর সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা হওয়ারও কোন কারণ ঘটল না। রাণী অনীতার প্রায় দু'বছর আগে বিপ্লব সমিতির idea পেয়েছে এবং নিজেকে ক্রমেই উপযুক্ত করে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। অনীতার সঙ্গে আমাদের যেবার প্রথম দেখা হয় তখন রাণীও চট্টগ্রামে ছিল। রাণীর সঙ্গে অনীতার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। রাণী বুঝতে পারছিল যে অনীতার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। বুঝে সে মরমে মরে যাচ্ছিল। তার ভিতরে দেখা করার তীব্র আকাঙ্খা অথচ তার সঙ্গে কারও proper link নেই সে কি করে আমাদের কাছে খবর পাঠাবে? তার আগে যখন অনীতা বিপ্লবের কাজের অনেক জিনিষ আনতে কলকাতা গিয়েছিল তখন রাণীর হোস্টেলে গিয়ে রাণীর একজন মেয়ে-বন্ধুর সাহায্য নিয়েছিল এবং একা এত জিনিষ নিয়ে আসা অসম্ভব বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম এসেছিল, এই মেয়েটিকেও অসীম দলভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটু-আধটু sympathise করা ছাড়া আর কোন কিছু করতে সে রাজী নয়। এত backward একটি মেয়েকে অনীতা সাহায্যকারিণী হিসাবে নিল অথচ রাণীকে বললই না দেখে রাণীর মনে খুব দুঃখ হ'ল। অনীতার সঙ্গে তার introduction-ও নেই, তাই মুখ বুজে দুঃখ সহ্য করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

১৯৩১ সালের ঁপূজার ছুটিতে রাণী বাড়ী এসে অনীতার সঙ্গে দেখা করে। এবার রাণী সঙ্কল্প করে এসেছিল যে অনীতাকে প্রাণ খুলে সব বলে আমার (মাষ্টারদার) সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবে। রামকৃষ্ণের ফাঁসির আগে তার সঙ্গে জেলে যে একবার দেখা করেছে, একথা এবার প্রথম অনীতাকে বলল। এবারও অনীতা ভুল করল, অনীতার ধারণা হ'ল রাণী মাষ্টারদা ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করবে না। ঁপূজার ছুটির সময় আমি নির্ম্মলবাবুকে একজায়গায় রেখে অন্য জায়গায় চলে গেলাম। সেই বন্ধে আমি অনীতার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে ওর দু'-তিনবার দেখা হ'ল। অনীতা নির্ম্মলবাবুকে বলল, 'প্রীতি রামকৃষ্ণদার সঙ্গে জেলে অনেক বার দেখা করেছে। সে ভালই আছে। তবে রামকৃষ্ণদা তাকে বলেছে মাষ্টারদা ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা না করার জন্য। তাই সে মাষ্টারদার সঙ্গেই দেখা করতে চায়। একথা শুনে নির্ম্মলবাবু আর রাণীর সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করল না। অনীতা বাস্তবিক রাণীর কথা ভুল বুঝেছিল। রাণী চার বৎসর আগে যে দিন প্রথম বিপ্লব সমিতির idea পায় সেদিনই আমার নাম শুনেছিল এবং আমাকেই সমিতির leader বলে জানত। তাই স্বভাবতঃই সে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিল। কিন্তু তাই বলে অন্য absconder-এর সঙ্গে সে যে দেখা করবে না এই ধারণা তার ছিল না। অনীতার ভুল representation-এর জন্য এবারও সে আমাদের কাহারও সঙ্গে দেখা করতে পারল না।

১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বর যখন চট্টগ্রামে প্রায় এক হাজার অতিরিক্ত সৈন্যের

আমদানী হ'ল, গ্রামে গ্রামে যখন সাঁজ-বাতির আদেশ দেওয়া হ'ল , গ্রামে গ্রামে যখন অতিরিক্ত সৈন্য আমদানী হতে লাগল তখন নির্ম্মলবাবু যেখানে ছিলেন সেই জায়গা ছেড়ে আমার সঙ্গে এসে একত্র হলেন। এসে আমাকে বললেন, রাণী বলেছে সে আপনার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করবে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি। আমি বললাম বোধ হয় সে কথা ঠিক নয়। রাণী হয়ত আমার কথাই অসীমের কাছ থেকে শুনে এসেছে সে জন্য আমার কথাটি বলেছে। তা বলে আপনার সঙ্গে যে সে দেখা করতে চাইবে না তা ত আমার মনে হয় না। আপনার দেখা করে নেওয়া উচিত ছিল, বিশেষতঃ সে যখন ফাঁসির আগে জেলে রামকৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করেছে তখন তার সমিতির কাজের প্রতি নিশ্চয়ই খুব টান বেড়েছে। নির্ম্মলবাবু বললেন, "সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বড়দিনের বন্ধে নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম আসবে। তখন আপনি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন।" আমি বললাম দেখা করবার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু চারদিকে পুলিস ও সৈন্যের যা তোড়জোড় এ অবস্থায় নড়াচড়াই ত অসম্ভব। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও দেখা হওয়ার সম্ভবনা নাই, বাস্তবিক তাই হ'ল, ১৯৩২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত না নড়েচড়ে এক জায়গায়ই থেকে যেতে হ'ল। রাণী এসেছে কি না এসেছে সে খবর পর্য্যন্ত পেলাম না। খবর পেলে এত অসুবিধার মধ্যে দেখা করতে পারতাম কিনা তা এখন ঠিক বলতে পারছি না। অথচ শেষে জানলাম test পরীক্ষার পর পুরোপুরি জানুয়ারী মাসটা সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য চট্টগ্রামেই কাটিয়ে গেছে। অনীতাকে কত অনুরোধ করেছে। কিন্তু অনীতাও তখন আর আমাদের কোন খোঁজ পায় নি। কাজেই রাণী ক্ষুণ্ণ মনে কলকাতা ফিরে গেছে। মার্চ্চ মাসে সাঁজ-বাতির আদেশ শিথিল হয়ে গেলে, সৈন্যের তোড়জোড় একটু কমে গেলে আমি আর নির্ম্মলবাবু একটু নড়তে চড়তে আরম্ভ করলাম, সমিতির খোঁজখবর নেওয়া, বিশৃঙ্খলা দূর করে আবার শৃঙ্খলা করা ইত্যাদি কাজের জন্য খুব দ্রুত একটা tour দিয়ে নির্ম্মলবাবুকে এক জায়গায় রেখে আমি অন্য জায়গায় চলে গেলাম। এপ্রিলের শেষের দিকে অথবা মে মাসের প্রথম দিকে রাণী বি. এ.পরীক্ষা শেষ করে চট্টগ্রামে নিজেদের বাসায় এল, এসেই অনীতাকে আরও পরিষ্কার করে বলল। যে কোন absconder-এর সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। এবার অনীতা রাণীর আগ্রহ বুঝতে পেরে তাকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ একদিন রাত্রে গ্রামে এসে উপস্থিত হয়ে link-এর through-তে তাদের আসার খবর জানিয়েছে। আমি কাছে ছিলাম না। নির্ম্মলবাবু রাত একটায় সে খবর পেয়ে অনেক পথ হেঁটে তাদের সঙ্গে শেষ রাত্রে আধ ঘন্টার জন্য দেখা করে। কারণ দেখা করে বুঝল যে, তারা বিশেষতঃ অনীতা বাসার situation খুব খারাপ করে চলে এসেছে। পরদিন সকালবেলা ফিরে না গেলে একটা ভীষণ গোলমাল হতে পারে। তাই নির্ম্মলবাবু আধ ঘন্টা মাত্র কথা বলে তাদের শহরে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল। রাণী আমার সঙ্গে দেখা করার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করাতে নির্ম্মলবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এক সপ্তাহের জন্য সে বাসা থেকে আসতে পারবে কি? তা হলে মাষ্টারদার সঙ্গে

দেখা করতে পারবে।'' যাক্ অল্পক্ষণ দেখা করার পর অনীতা ও রাণী চলে গেল।

অল্প কয়েকদিন পরেই নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হতেই নির্ম্মলবাবু আমায় বলল, ''আমি রাণীকে কথা দিয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা করাব, সে এক সপ্তাহের জন্য যে কোন জায়গায় আসতে রাজী আছে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সে ফাঁসির আগে দেখা করেছে শুনেই তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হয়েছিল। তার দেখা করার ব্যাকুলতা শুনে রাজী হলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যে (মে মাসের শেষের দিকে) তাকে আনবার ব্যবস্থা করলাম।

(প্রবাসী, ১৩৫৬ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে গৃহীত)।

প্রথম দর্শন

সূর্য সেন

(এই প্রবন্ধটি গ্রেপ্তার হওয়ার সময় মাষ্টারদার নিকট পাওয়া যায় — সম্পাদক)

একটি বাড়ীতে তাকে আনবার ঠিক হ'ল। আমরা ২/৩ দিন আগে Messenger পাঠিয়ে জানলাম সে আসতে পারবে কিনা এবং কখন আসতে পারবে। তার কাছ থেকে উত্তর এল "আপনি নেওয়ার জন্য লোক পাঠাবেন, সেই দিন আসতে পারব; কোন বাধাই আমাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।" Messenger একটি দিন ঠিক করে তাঁকে বলে এল। নির্দিষ্ট দিনে Messenger-কে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে তাঁকে আনতে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁদের আসতে প্রায় রাত ৯টার কম হবে না। Messenger-কে পাঠিয়ে ভাবলাম একটি মেয়ে তার মা বাপ প্রভৃতি অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে থাকে। এ অবস্থায় তার আসার পক্ষে কত বাধাই ত হতে পারে। বাপ মা যদি নিষেধ করে সে কি করে আসবে। সে ত আর স্বাধীন নয় যে তার নিজের ইচ্ছায় যেখানে সেখানে যেতে পারবে। অন্য জায়গায় যাচ্ছে বলে ফাঁকি দিয়ে ত তার আসতে হবে। যদি একা তাকে না যেতে দেয় তা হলে তার করবার কি আছে। সে ত ছেলে নয় যে স্বাধীনভাবে মা-বাপকে না মেনে হলেও চলে আসবে। আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়ে সমাজের চাপে নানা দিক দিয়েই অধীন। এ অবস্থায় আজ আনতে গেছে বলেই সে যে আসতে পারবে তার স্থিরতা কি? সন্ধ্যা হয়ে এল, ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হ'ল, ভাত খাওয়ার জন্য Shelter পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি আর নির্ম্মলবাবু সঙ্গে আছি। আরও দুই জনের ভাত রাঁধবার জন্য বাড়ীর মালিককে বলে দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম যে নির্ম্মলবাবুর বোন তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। গৃহস্থ তাই বিশ্বাস করেছিল। আমরা ভাত না খেয়ে ওদের আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমে ৯টা বেজে গেল তখনও আমরা খাইনে। ১০টার একটু পরে আমরা উঠানে বসে আছি তখন দেখলাম Messenger রাণীকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। নির্ম্মলবাবু উঠান থেকে উঠে তাদের কাছে গেল, আমি ত রাণীর সঙ্গে এখনও পরিচিত হই নাই তাই আমি ২/৪ মিনিট পরে ঘরের মধ্যে গেলাম, নির্ম্মলবাবু রাণীকে বলল — "মাষ্টারদা এসেছেন"। রাণী এসে আমায় প্রণাম করে পায়ের ধূলা মাথায় নিল, বাতির সামনে তার আপাদমস্তক দেখলাম। প্রথম দর্শনে সে আমার মনের মধ্যে কি impression create করল ঠিক ভাষা দিয়ে বুঝাতে পারব না। দেখেই তাকে বেশ smart, cheerful, intelligent এবং cultured বলে মনে হ'ল। তার চোখেমুখে একটা আনন্দের আভাস দেখলাম। এতদূর পথ হেঁটে এসেছে, তার জন্য তার চেহারায় ক্লান্তির কোন চিহ্নই লক্ষ্য করলাম না।

দেখেই বুঝলাম আমার দেখা পেয়ে সে খুব আনন্দই পাচ্ছে। যে আনন্দের আভা তার চোখে মুখে দেখলাম, তার মধ্যে আতিশয্য নেই, Fickleness নেই, Sincerity শ্রদ্ধার ভাবই তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। একজন উচ্চশিক্ষিত Cultured Lady একটি পর্ণকুটীরের মধ্যে আমার সামনে এসে আমাকে প্রণাম করে উঠে বিনীত ভাবে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাকে আশীর্ব্বাদ করলাম — কি আশীর্ব্বাদ করলাম জানি না, আজ মনে হচ্ছে বোধ হয় শীগ্‌গির মরতেই তাকে অজ্ঞাতসারে আশীর্ব্বাদ করেছিলাম। দেখলাম তাঁর মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। মনে হ'ল একজন ভক্তিমতী হিন্দুর মেয়ে হাতে প্রদীপ নিয়ে আরতি দেবার জন্য দেবতার মন্দিরে ভক্তি ভরে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে কোন দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই, মুখে একটু নির্ম্মল আনন্দের চিন্তা ফুটে উঠেছে। একটা পবিত্র নিঃসঙ্কোচ ভাব। আমার সঙ্গে এই প্রথম বার দেখা করার কথা লিখতে গিয়ে সে নিজেই লিখেছে, যখন গ্রামের পথে, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন দেবদর্শনে যাচ্ছি। পরে তার কাছেও সেদিন তার হৃদয়ে দেবতার আসন সে আমার কাছে এনেছিল। কিন্তু ওর কাছ থেকে শোনার আগেই প্রথম দর্শনেই মনে হ'ল পূজারিণী ভক্তি-অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবতার পূজা করতে এসেছে। চোখে মুখে পবিত্র আনন্দের ভাব। নীরবে আশীর্ব্বাদ করে ওকে বারান্দায় রেখে কাজের ছলে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। কিছুই বলতে পারলাম না। আমি সাধারণতঃ লাজুক। কোন নূতন ছেলের সঙ্গে দেখা হলে তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারি না। মেয়েদের সঙ্গে ত সে লজ্জা বেশী হওয়ারই কথা। আমি জীবনে বাড়ীর অথবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও খুব কম কথাই বলেছি। কাজেই একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেও প্রথম বাধ বাধ ঠেকবেই। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। রাণীকে নির্ম্মলবাবুর বোন বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। তাই সে তার সঙ্গে খেতে বসল। খেয়ে উঠে নির্ম্মলবাবু অল্পক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরিয়ে গেল। তখন আমি রাণীর কাছে গিয়ে বসে একটু সঙ্কোচ করে কথা আরম্ভ করলাম। মনে হ'ল নিঃসঙ্কোচে তার সঙ্গে কথা কইতেই পারব না। বাড়ীতে তার নাম বললাম খুকী। রাণী বলে সেখানে কেউ তাকে ডাকে নি। উদ্দেশ্য সেখানে তার নাম গোপন রাখা। কথার-প্রারম্ভেই তাকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা, কি ভাবে দেখা হয়, কি কথাবার্ত্তা হয় ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলাম। এই কথা তোলায় যেন ভালই হ'ল। সে নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে খুব fluently এবং Sweetly বলে যেতে লাগল।

তার নিঃসঙ্কোচ সহজ স্বচ্ছন্দভাব দেখে আমার সঙ্কোচ একেবারেই কেটে গেল। রাত্রে প্রায় দুই ঘণ্টা খুব freely তার সঙ্গে কথা বললাম। আমি ত বেশী কিছুই বললাম না। তাঁর কাছ থেকে কেবল শুনলামই। রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা, কথাবার্ত্তা, রামকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধা, রামকৃষ্ণের গুণগুলির সম্বন্ধে তার ধারণা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে

যেতে লাগল। তার একজন মানুষের গুণ গ্রহণ করবার, সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার এবং নিঃসঙ্কোচে (Fluently) কথা বলে যাওয়ার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম। কি সহজ সরল ভাবেই না সে কথা বলে যেতে লাগল। ঐ রাত্রের দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার কথায়ই তার উপর আমার খুব ভাল ধারণা হয়ে গেল। সে বাড়ী থেকে প্রায় এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছিল। মনে করেছিলাম তার বাড়ীর অবস্থাও খুব ভাল, তাছাড়া এত দিন স্কুল কলেজে পড়েছে, হোষ্টেলে রয়েছে, কত decently চলেছে, কত ভাল decently মেয়েও দেখেছে যে এই বাড়ীর খারাপ খাওয়া খেতে তার হয়ত খুব কষ্ট হবে, তা ছাড়া যে কয়দিন আমাদের ওখানে, সে কয়দিন ত তাকে পলাতকদের মত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে। এ সব কষ্ট তার মত একজন মেয়ের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে কিনা? দেখলাম এত decently brought up সত্ত্বেও সেভাবে একটুও কষ্ট বোধ করছে না। আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেছে এবং কাছে থেকে তার যা জানবার বলে নিচ্ছে — এতেই তার আনন্দ। তার action করার আগ্রহ সে পরিষ্কার ভাবেই জানাল। বসে বসে যে মেয়েদের organise করা, organisation চালান প্রভৃতি কাজের দিকে তার প্রবৃত্তি নেই, ইচ্ছাও নেই বলে।

(প্রবাসী, ১৩৫৬, ভাদ্র সংখ্যা থেকে গৃহীত)

LONG LIVE
REVOLUTION.

Sm. PRITI LATA OWADDADAR B. A.

I solemnly declare I belong to the Chittagong Branch of the Indian republican Army whose lofty, ideal is to liberate my mother country from the yoke of the tyrannical exploiting and imperialistic British Government and to establish a federated Indian Republic instead. This remarkable Chittagong party has captured imagination of the youths and has given a new impetus to the revolutionaries of India by its unprecidented display on the memorable *18th April* 1930 and its subsequent heroic achievement on the holy Jalalabad Hill, at Samirpore, at Feni, at Chandannagar, at Chandpore, at Dacca, at Comilla, at Dhalghat, I feel proud that I have been thought fit to be a member of such a glorious party.

We are fighting freedom's Battle. Today's action is one of the items of that continued fight. British people have snatched away our independence, have bled India white and played a havoc with the lives of millions of Indians They are the sole cause of our complete ruin, moral, physical, political and economic and thus have proved the worst enemy of our country—the greatest obstacle in the way of recovering our independence. So we have been compelled to take up arms against the lives of any and every member of the British community—official or non-official, though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being. In a fight for freedom we must be ready to remove by any means what soever every obstacle that stands on our way.

When I was summoned by great 'Masterda' the venerable leader of my party to join today's armed raid I felt

myself fortunate enough seeing my long felt hankering ful-filled at last and accepted the task with full sense of responsibility. But when I was asked by that exalted personality to lead the raid I felt diffident and protested by saying why a sister should take the lead when so many able and experienced brothers were present. 'Masterda' convinced me of its need and efficacy by his able argument and took my leaders command on my head and invoked the Almighty Father whom I have adored since my childhood to assist me in discharging my grave duty.

I think I owe an explanation to my country men. Unfortunatly there were still many among my countrymen who may be shocked to learn how a woman brought up in the best tradition of Indian womanhood has taken up such a horrible deed as to massacre human lives. I wonder why there should be any distinction between males and females in a fight for country's freedom. If brother can feel for their mother country and can fight for her cause why not the sisters? Instances are not rare that the Rajput ladies of hollowed memory fought bravely in the battle field and did not hesitate to kill their country's enemies The pages of history are replete with the records of the heroic ladies Then why should we, the modern Indian woman, be deprived of joining this noble fight to redeem one country from foreign domination? If sisters can stand side by side with the brothers in a Satyagraha movement why are not they so entitted in a revolutionary movement? Is it because the method is different or because the females are notfit to take part in it? As Regards the method, armed rebellion is not an ignoble method. It has been successfully adopted in many countr-

ies and the Females have joined it in hundreds, then why should India alone regard this method as an abominable one ? As regards fitness is it not sheer injustice to the females that they will always be thought les fit and weaker than the males in a fight for freedom ? Time is come when this false notion must go. If the females are yet less fit it is because they have been left behind Females are determined that they will no more lag behind and will stand side by side with their brothers in any activities however dangerous or difficult. I earnestly hope that my sisters will no longer think themselves weaker and will get themselves ready to face all dangers and difficulties and join the revolutionary movement in their thousands.

I shall now briefly relate how I was drawn in to the revolutionary organisation.

When I was studying in the matriculation class in Dr. Khastagir's Girl's School, Chittagang, I got an idea of a revolutionary organisation in Chittagang and was told that there was a very powerful man (Masterda) endowed with many qualities befitting a revolutionary leader at the helm of this organisation.

During my two year's stay at Dacca for my Intermediate course I was engaged to preparing myself as a fit comrade of the great 'Masterda'. However I did not neglect my studies and in the year 1930 I passed the Intermediate examination standing first among the girls and fifth in order of merit.

It was the morning of 19th April 1930 when I came home after the examination and heard of the glorious activities of previous night of the Chittagang heroes. My

heart was filled with deep admiration for these souls. But it pained me much that I could not take part in such heroic exploits and could not have a glimpse of 'Masterda' whom I have adored since I heard his name. The thought of Jalalabad martyrs touched my heart to its very depth. With such a state of mind I left for Calcutta for my B. A. degree, The thought of my country was ever predominant in mind and was kept ever fresh by the tears of mothers mourning the loss of their beloved sons who sacrificed their lives at the alter of freedom.

With all these, a new impetus came to me when I was asked by one of my revolutionary comrades to visit Ramkrisnada in the Alipore Central Jail where in a solitary cell he was awaiting extreme penalty meted out to him by the British Law for his love of country. I passed for a cousin sister of Ramkrisnada and any how managed to interview every day this flamy lively young hero. I had about 40 interviews with him before his execution His dignified look, free conversation calm surender to death, sincere devotion to God, child like simplicity loving heart and profound realisation impressed me very deeply and made me ten times more forward and determined than what I had been The association of this dying patriot made a great contribution to the advancement of my life towards perfection. After Ramkrisnada's execution my hankering after some practical revolutionary action grew more intense. However I had to pass 9 months more in Calcutta for my B. A. examination. In the meantime I tried several times to have an interview with 'Masterda' but I faild.

After my examination in 1932 I hurried towards home with a strong determination to interview 'Masterda' any how. In a few days my long cherished desire was fulfilled and I soon stood before 'Masterda' and Nirmalda the two great personallties then guiding the Chittagong Revolutionary organisation.

In one of my interviews with my leaders at Dhalghat I got the first opportunity in my life to join a fight against the British Soldiers that resulted in killing Captain Cameron.

In my short interviews with Nirmalda I recognised his noble and beautiful heart in which stauch revolutionary principles and strong religious temperament so nicely combined I am fortunate I got opportunity to come in contact with such a great soul that silently passed away from the world without giving the countrymen any opportunity to know how great, how pure, how rare it was.

Tragic end of Nirmalda and Bhola gave me a severe shock and I became more desperate, The result of my B. A. Examination was published by this time. I passed it with distinction. A few days after apprehending sure arrest in connection with Dhalghat fight I left for good my beloved home and plunged myself heart and soul in to revolutionary activities.

Firm faith in my Almighty Father and cordial devotion to him have been the most valuable treasure to me since my childhood I have carefully cherished this treasure in my bosom throughout my whole life and to day when I have come finally prepared to embrace. His feet that I have so earnestly hankered, my treasure seems to me more precious,

more pleasant and more illuminating. Had not my revolutionary ideal been thoroughly consistent with my devotion to the Almighty I would never have been a revolutionary.

With an invocation to God I launch to discharge my today's responsibilities and pray to Him to purge me clean so that I may be a worthy offering to Him.

BANDE MATARAM.

N. B. The above statement was found in the pocket of Sm. Priti Lata Owaddadar B. A, when she led the raid in the Pahartali European Club on the 24th of September 1932. and it was seized by the police after her death,

(Published by the Publicity Board Indian Republican Army, Chittagong Branch.)

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ঘোষণা করছি যে আমি ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার একজন সৈনিক। অত্যাচারী, শোষণকারী এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে আমার মাতৃভূমিকে মুক্ত করে তার জায়গায় এক স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করা, এই বাহিনীর মহান লক্ষ্য। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের অবিস্মরণীয় কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এই চট্টগ্রাম দলটি যুবশক্তির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের এক নতুন প্রাণে উজ্জিবীত করেছে। এই সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ প্রতিফলন পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি পবিত্র জালালাবাদ পাহাড়ে, সমিরপুরে, ফেণীতে, চন্দননগরে, চাঁদপুরে, ঢাকায় এবং কুমিল্লা ও ধলঘাটে। আমি গর্ব অনুভব করি এই ভেবে যে আমাকে ঐ মহান সংগঠনের একজন সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।

আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। আজকের কাজটি সেই ধারাবাহিক লড়াই এর অন্যতম অঙ্গ। ব্রিটিশরা আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে, ভারতবর্ষকে রক্তশূন্য করেছে এবং কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। আমাদের দৈহিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক অর্থাৎ এককথায় সার্বিক বিনাশের একমাত্র কারণ তারা। এটা প্রমাণিত, তারাই আমাদের মাতৃভূমির ঘৃণ্যতম শত্রু। আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লড়াই এর সামনেও তারা বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে হাজির। যদিও মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়, তথাপি শাসক বা সাধারণ সব রকম ইংরেজদের বিরুদ্ধেই আমরা অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছি। মাতৃভূমির স্বাধীনতার লড়াই এর সামনে যে বাধাই আসুক না কেন, যে কোন ভাবেই হোক তা দূর করার চেষ্টা আমরা করব।

আমাদের দলের শ্রদ্ধেয় নেতা মাস্টারদা যখন আজকের সশস্ত্র অভিযানে যোগদানের জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন তখন আমি আমার বহুদিনের সযত্ন লালিত আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম এবং সমস্ত রকম দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলাম। কিন্তু যখন সেই মহান ব্যক্তিত্ব ঐ অভিযানের নেতৃত্ব আমার উপর ন্যস্ত করলেন তখন আমি কিছুটা সংশয় বোধ করলাম এবং 'এতজন সক্ষম ও অভিজ্ঞ ভাই থাকা সত্বেও কেন ঐ কাজ একজন বোনের উপর সমর্পিত হল' এই প্রশ্ন তুলে আমার আপত্তি জানালাম। মাস্টারদা তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারীতা আমাকে বোঝালেন এবং আমি আমার আশৈশব আরাধ্য সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে মাস্টারদার আদেশ শিরোধার্য করলাম।

আমি মনে করি স্বদেশবাসীর কাছে আমার কিছু কৈফিয়ত দেবার আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন অনেকেই আছেন যারা এ কথা জেনে আঘাত পেতে পারেন যে ভারতীয় নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের মধ্যে লালিত পালিত একজন মহিলা কী করে নরহত্যার মত একটা বীভৎস কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। আমি ভেবে বিস্মিত হই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকবে কেন? যদি দেশমাতৃকার জন্য ভাইয়েরা ভাবতে পারে এবং লড়াইএ সামিল হতে পারে তবে বোনেরা নয় কেন? রাজপুত রমণীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়ে দেশের শত্রুদের বধ করতে দ্বিধা করেন নি, ইতিহাসে এর উদাহরণ একেবারে কম নয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঐ বীরাঙ্গনাদের কাহিনী লেখা আছে। তাহলে আমরা, আধুনিক ভারতের নারীরা, কেন বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার মহাসংগ্রাম থেকে বিরত থাকব? যদি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বোনেরা ভাইদের পাশে দাঁড়াতে পারে তাহলে বিপ্লবী আন্দোলনে নয় কেন? এটা কী এই জন্য যে পদ্ধতিটা ভিন্ন, না কী এই কাজে অংশগ্রহণের পক্ষে মহিলারা অনুপযুক্ত? পদ্ধতিগতভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ কখনই হীন নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই সাফল্যের সঙ্গে এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে এবং শত শত মহিলা তাতে অংশও নিয়েছে। তাহলে একমাত্র ভারতবর্ষে তা কেন নিন্দনীয় হবে? স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের প্রশ্নে নারীরা পুরুষের তুলনায় দুর্বল, এরকম মনে করা নারীদের প্রতি অবিচার নয় কি? এই ভ্রান্ত চিন্তা অবসানের সময় এসেছে। যদি মহিলারা সত্যই কম যোগ্য বলে বিবেচিত হন তাহলে সেটা ঘটেছে তাদেরকে সর্বদাই পেছনে ফেলে রাখার জন্যেই। যত কঠিন এবং বিপদসঙ্কুলই হোক না কেন মেয়েরা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারা আর পিছিয়ে না থেকে ভাইদের পাশে দাঁড়াবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আমার বোনেরা আর নিজেদের দুর্বল ভাববে না। সমস্তরকম বিপদের মোকাবিলার জন্য তারা নিজেদের তৈরী রাখবে এবং বিপ্লবী আন্দোলনে হাজারে হাজারে সামিল হবে।

কীভাবে আমি এই বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলাম সংক্ষেপে সে কথাই এখন বলব। যখন আমি চট্টগ্রামের ডাঃ খাস্তগীর গার্লস স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পড়ি তখন আমি চট্টগ্রামের এক বিপ্লবী সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। আমাকে বলা হয়েছিল ঐ সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন বহু গুণের অধিকারী এক শক্তিশালী মানুষ যাকে সবাই 'মাস্টারদা' বলে জানতেন।

আই. এ পড়ার জন্য ঢাকায় দু'বছর থাকার সময় আমি নিজেকে মহান মাস্টারদার একজন উপযুক্ত কমরেড হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছি। তাই বলে আমি পড়াশুনায় অবহেলা করি নি। ১৯৩০ সালে আমি মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সকলের মধ্যে পঞ্চম হয়ে আই. এ পাশ করি।

পরীক্ষার পর ঐ বছরেরই ১৯শে এপ্রিল সকালে বাড়ী ফিরে আমি এবং আগের রাতে চট্টগ্রামের বীর যোদ্ধাদের মহান কার্যকলাপের সংবাদ পাই। ঐ সব বীরদের জন্য

আমার হৃদয় গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হল। কিন্তু ঐ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে না পেরে এবং নাম শোনার পর থেকেই যে মাস্টারদাকে গভীর শ্রদ্ধা করেছি তাঁকে একটু দেখতে না পেয়ে আমি বেদনাহত হলাম। জালালাবাদের বীর শহীদদের ভাবনা আমার হৃদয়ের গভীরে ছুঁয়ে গেল। মনের ঐ অবস্থার মধ্যেই বি. এ পড়ার জন্য আমাকে কলকাতায় আসতে হল। কিন্তু মাতৃভূমির কথা আমার মনে সদা জাগ্রত ছিল এবং স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গকারী সন্তানদের মায়েদের চোখের জল সর্বদাই সেই চিন্তাকে উজ্জীবিত করত।

এর পাশাপাশি আমি এক নতুন প্রেরণা পেলাম যখন আমার এক সংগ্রামী সাথী আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে রামকৃষ্ণদার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। দেশের প্রতি ভালবাসার কারণে ব্রিটিশ আইনে চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পেয়ে রামকৃষ্ণদা তখন জেলের এক নির্জন কুঠুরিতে বন্দী। 'আমি তাঁর এক বোন' এই পরিচয় দিয়ে প্রতিদিন ঐ অগ্নিযুবকের সঙ্গে দেখা করা শুরু করি। তাঁর ফাঁসির আগে ঐভাবে আমি প্রায় চল্লিশবার তার সঙ্গে দেখা করি। তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ চাউনি, খোলামেলা কথাবার্তা, নিঃশঙ্ক চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা, ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি, শিশুসুলভ সারল্য, দরদীমন এবং প্রগাঢ় উপলব্ধিবোধ আমার উপর গভীর রেখাপাত করল। আগের তুলনায় আমি দশগুণ বেশী কর্মতৎপর হয়ে উঠলাম। আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত এই স্বদেশপ্রেমী যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ আমার জীবনের পরিপূর্ণতাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত হবার আকাঙ্খা আমার অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু বি.এ পাশ করার জন্য আমাকে আরও প্রায় নয় মাসের মত কলকাতায় থেকে যেতে হল। ইতিমধ্যে বার কয়েক মাষ্টারদাব সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও আমি সফল হতে পারিনি।

১৯৩২ সালে বি. এ পরীক্ষার পর মাস্টারদার সাথে দেখা করবই এই প্রত্যয় নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমার ইচ্ছাপূরণ ঘটল। একদিন আমি দাঁড়ালাম মাস্টারদা এবং নির্মলদার সামনে যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং সুদক্ষ নেতৃত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম বিপ্লবী সংগঠনকে পরিচালনা করেছিলেন।

ধলঘাটে একদিন নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ অবশেষে পেলাম। সে যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্যাপটেন ক্যামেরুন নিহত হয়েছিলেন।

নির্মলদার সঙ্গে আমার অল্পদিনের সাক্ষাতে আমি তাঁর মহৎ এবং সুন্দর মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম কঠোর বিপ্লবী শৃঙ্খলাবোধ এবং ধার্মিকমনের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। দেশবাসী জানতেও পারল না কী মহৎ, কী দুর্লভ, কী শুদ্ধ অন্তঃকরণের অধিকারী একজন মানুষ একান্ত নিঃশব্দেই চলে গেলেন। আমার পরম সৌভাগ্য আমি তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম।

নির্মলদা এবং ভোলার বেদনাদায়ক মৃত্যু আমাকে ভীষণভাবে আঘাত দিয়েছিল

এবং আমি আরও মরিয়া হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে আমার বি. এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। আমি ডিস্টিংশান পেয়ে পাশ করলাম। ধলঘাটের লড়াইতে আমি যুক্ত এই সন্দেহে যে কোন সময় গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারি এই আশংকায় আমি চিরদিনের জন্য আমার পরমপ্রিয় পরিবার পরিজন ত্যাগ করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে মনপ্রাণ সঁপে দিলাম।

আশৈশব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং অসীম ভক্তি আমার জীবনের প্রধান সম্পদ যা আমি সযত্নে এতদিন লালন করে এসেছি। আজ সেই সম্পদকে ব্যবহার করে তাঁর চরণে আশ্রয় নেবার সুযোগ আমার জীবনে এসেছে। যদি আমার বিপ্লবী আদর্শ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করার বিশ্বাসের সাথে সমার্থক না হত তাহলে আমি কখনই একজন বিপ্লবী হতে পারতাম না।

পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধায় অবিচল থেকে আজ আমি আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করছি এবং আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে নিষ্কলঙ্ক রাখেন যাতে তাঁর কাছে আমি নিজেকে উৎসর্গ করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

বন্দেমাতরম!

উপরোক্ত বিবৃতিটি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নিহত শহীদ প্রীতিলতার পুরুষবেশ পোষাকের পকেট থেকে এটি পাওয়া গিয়েছিল এবং পুলিশ পরে সেটি নিয়ে যায়। এটি ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক প্রকাশিত।

মায়ের নিকট প্রীতিলতার পত্র

(আত্মাহুতির আগের দিন রাত্রে মায়েব উদ্দেশে এই চিঠিটি প্রীতিলতা লিখেছিলেন। তাঁর শহীদের মৃত্যুবরণের পর দলের একজন কর্মীকে দিয়ে মাষ্টারদা এই চিঠিটি প্রীতিলতার মার হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। — সম্পাদক)

'মাগো,

তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার যেন মনে হলো তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছো, আর তোমার অশ্রু-জলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা, সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছো? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পাবলাম না — তুমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে চলে গেলে।

স্বপ্নে একবার তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম — তুমি তোমার আদরের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে! কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মোছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো — তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।

একটিবার তোমায় দেখে যেতে পারলাম না! সেজন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝোনা তুমি। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে, তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছো —"ওগো তোমরা আমার রাণীশূন্য রাজ্য দেখে যাও।"

তোমার সেই ছবি আমার চোখের ওপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলো আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার সুর তোলে।

মাগো, তুমি অমন করে কেঁদোনা! আমি যে সত্যের জন্য — স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?

কি করবে মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা!

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য

উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?

আর কেঁদোনা মা। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইবো।

আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি! তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছো,আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই না করেছো — আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি। তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত নিষ্ঠুর হতে পারলো কি করে? ক্ষমা করো মা; আমায় তুমি ক্ষমা করো!'

সূর্য সেনের উদ্দেশ্যে

প্রীতিলতার চিঠি

(এই চিঠি আত্মগোপনকালীন অবস্থায় লেখা — সম্পাদক।)

শ্রীচরণেষু —

দাদা, ভেবেছিলাম আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে আমার দাদার নিরালা জীবনে একটুখানি আনন্দ দেবার চেষ্টা করব কিন্তু ভগবান হঠাৎ যেন সব উল্টে দিলেন। ছুটাছুটি করে সবাইকে চলে আসতে হ'ল — তারপর যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করাটাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা একান্ত মনে যা চেয়েছি তার পথে এত বাধা আমার মনে যে বড়ই ব্যথা দিচ্ছে দাদা। অনেক কিছুই মনে হচ্ছে, যাক্ আপনার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবে না কখনও আমি জানি। আমার উদ্দেশ্য সফল হবেই, নইলে যে আমি একেবারে মরিয়া হয়ে যাব। যাক্, এসব লিখব তা তো ভাবিনি।

আজ আপনার কাছে চিঠি লিখতে বসে ভাবছি আমি কার কাছে চিঠি লিখব? আমি যে তাঁর উপযুক্ত বোন হতে পারলাম না, তাঁর অগাধ স্নেহের মর্য্যাদা আমি যে রক্ষা করতে পারলাম না। কত অবাধ্যতা করেছি, কত মনে কষ্ট দিয়েছি, বুঝি নি যে ভগবান্ আমাকে অমূল্য সম্পদই দিয়েছেন। যাক্।

সোনাদা ও মেজদা এসেছিল। খুব ভাল লাগল তাদের সঙ্গে কথা বলতে — তারা আমাকে দেখে খুব খুশী — একেবারে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। মা নাকি খুব কাঁদেন — কাঁদতে কাঁদতে হয়রান হয়ে যান্। রোজই কাঁদেন। বাবা কিছু ক্ষান্ত হয়ে গেছেন, তবে বাবার খুব লেগেছে। আমার কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে রেখে দেবার জন্য বলে দিয়েছেন, তা কেউ ব্যবহার করলে বকুনি দেন। মঞ্জুটির খুব অসুখ। গাল ফুলে গেছে কিছু খেতে পারে না। এবং জ্বরও হয়েছে — রাত দুপুরে উঠে নাকি আমাকে ডাকে।

দাদা! আমার মনে আজ বড়ই ব্যথা। আমি কি মানুষকে কষ্ট দিতেই শুধু সংসারে এসেছিলাম। আমি যে তা চাই না। লক্ষ্মীটি দাদা এ হতভাগা বোনটিকে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। জানি স্নেহের বোনটিকে ভুলবেন না কিন্তু আমার সে কথাই বলতে ইচ্ছা করছে — আমার স্মৃতি যে আপনাকে ব্যথা দিচ্ছে।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। শরীর ভাল আছে। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি — স্নেহের ফুলতার*

ফুলতার প্রীতিলতার ছদ্মনাম। (প্রবাসী, ১৩৫৬, ভাদ্র সংখ্যা থেকে গৃহীত)

অবিস্মরণীয় সান্নিধ্য

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

(প্রীতিলতা একটি প্রবন্ধে নির্মল সেনের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে ধলঘাটের সংঘর্ষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার একটা মর্মস্পর্শী বিবরণী লিখেছিলেন। পরে সূর্য সেন যখন ধরা পড়েন তখন ঐ প্রবন্ধ তাঁর কাছে পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকার ১৩৫৬ সালের আষাঢ় সংখ্যায়। -- সম্পাদক)

কন্টক-মুকুট শিরে পরেছিলে বলে
আজ কত কোহিনুর তব পদতলে!

সেই গভীর নিশীথে পল্লীর কোন এক অন্ধকার জীর্ণশীর্ণ কুটিরে বহু পূণ্যবলে নির্ম্মলদার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, জীবনের সে শুভ মুহূর্তটিকে শত ক্রন্দনেও আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কেননা আজও সেই সবই তেমনিভাবে আছে। আমিও আছি, আমার জীবনে আরও কত রজনীই এসে গেল; কিন্তু নাই কেবল সেই মহিমান্বিত তেজস্বী মানুষটি যাঁর উপস্থিতি সেইদিন সেই পর্ণকুটির আলো করে দিয়েছিল। বিপ্লবীর কি মনোহর রূপই না সেদিন দেখেছিলাম! অন্ধকারে চোখদুটো জ্বলছিল ও মনে হচ্ছিল যেন বিদ্রোহীর মনের আগুন দুই চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে। তাঁর মুখের কথার চাইতে আমার ঐ তেজোময় চোখের চাহনিই অনেক বেশী মনে হয়েছিল। বিদ্রোহীর বাণী কেবল ঐ চোখ-দুটোই যেন প্রচার করে দিচ্ছিল। পেছনে মেশিনের ব্যাগটা ঝুলছে, সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু, কথাবার্তা বলার পরে যখন উঠে দাঁড়ালেন মনে হ'ল যেন বংশীবাদক পদ্মপলাশলোচন কদমতলা ছেড়ে সুদর্শনচক্র হস্তে সমর-প্রাঙ্গণে এসে পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়ে সপ্তকোটি বীর সন্তানকে মুক্তির জন্যে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করছেন।

নির্ম্মলদা আমায় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমায় কে কি বলেছে। বললাম, সবটুকু গুছিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে বলব? যা যা মনে আসবে তাই বলে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণদা[১] যে বলেছিল Nirmalda is the last man to be captured. He is very intelligent — এই কথাটাই প্রথমে বললাম। তারপর রামকৃষ্ণদার আরও কয়েকটি কথা হুড় হুড় করে বলে গেলাম। কি কি বলেছিলাম ঠিক মনে নাই। তবে এই দুটো কথা বলেছিলাম, 'No revolutionary can die with satisfaction. আমি যদি এখন বের হই, তবে I shall declare equal right to brothers and sisters'.

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, family-র প্রতি আমার কিরূপ টান আছে। বললাম,

---

১. রামকৃষ্ণ বিশ্বাস — পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জী হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

টান আছে, কিন্তু duty to family-কে duty to country-র কাছে বলি দিতে পারব।

পরীক্ষা কেমন দিয়েছি, পাশ করব কিনা জানতে চাইলেন। বললাম, পাশ করব বলেই মনে হচ্ছে।

সেদিন যখন পাশের খবরটা পেলাম, মনে পড়ে গেল নির্ম্মলদা প্রথম দিনই আমাকে পাশ করার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমার তো বিশ্বাস, যে যায় সে একেবারে চলে যায় না। আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকে এবং প্রাণের যা কিছু নিবেদন সবই তার কাছে পৌঁছায়। তাই মনে মনে খবরটা নির্ম্মলদার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু তবুও হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে একটা গভীর বিচ্ছেদব্যথার সুর বেজে ওঠে। মানবহৃদয়ের এইসব অতি সাধারণ সুখদুঃখের কাহিনী যুগযুগান্তর ধরেই চলেছে। কিন্তু আমরা এ সবের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করতে পারি না বলেই বিশ্বের বুকে এত হাহাকার, হা-হুতাশ আব ক্রন্দন। আমরা ভুলে যাই, যে শুভপ্রভাতে দুঃখের সঙ্গে একান্ত বোঝাপড়া করে নিতে পারব সেইদিনই অমৃতের সন্ধান পাব।

তাবপর আমি যখন বললাম যে, পাশ করতে পারব, তখন বললেন, 'তোমার কাছ থেকে extreme success demand করি, আগামী convocation-এ একটা attempt নিতে পারবে তো?'

আনন্দে আমার অন্তর ভরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্জয় অভিমান এসে মনটা জুড়ে বসল এই ভেবে যে, এতদিন পরে মনের ইচ্ছাটা জানাবার সুযোগ মিলল। তাই নির্ম্মলদার এই প্রশ্নের উত্তরে বলে বসলাম, পারব না কেন? আপনারা তো আর বোনদের আমল দেন না। আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, 'কেবল তোমাকে একথা বললাম — আমি অনেকদিন থেকেই জানি।' আমার সঙ্গে যে উনি দেখা করেছেন সেই আনন্দেই তখন বিভোর ছিলাম। অথচ সেই সময় একথা বলার কারণ আর কিছুই নয়, অভিমান। তারপর আমাকে এই কথাগুলো বললেন, 'পাশ করবার পর যে কোন district-এ একটা কাজ নেবার চেষ্টা করো — যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া ইত্যাদি। সেখানকার Magistrate, Commissioner সবার নাম একেবারে মুখস্থ করে বসবে। কখন কোথায় meeting হয় সব খবর রাখবে এবং opportunity খুঁজে বেড়াবে।'

একটা Code বলে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আগে রমণের[২] through-তে যে Code পাঠিয়েছিলেন তা সে বলেছে কি না এবং কি বলেছে।

তারপর বললেন, 'আমাদের ইচ্ছা যাবার আগে আর একটা কিছু করে যাই। এবার আমরা চাই যে একটা fight between intelligent and intelligent হোক।'

'যত তাড়াতাড়ি পারি করে যাব, কারণ কখন ধরা পড়ি ঠিক নাই। এত কিছুর মধ্যেও যে এতদিন ধরা পড়িনি, সেজন্য আমাদের thanks দেওয়া উচিত।'

দ্বিতীয় বার যখন দেখা হয়, তখনও বলেছিলেন, 'চাটগাঁ শহরের উপর একদিন

২. বীরাঙ্গনা কল্পনা দত্তের (যোশী) ছদ্মনাম।

আগুন জ্বালিয়ে দেব। হঠাৎ একদিন শুনতে পাবে যে পৃথিবীর বুকের উপর থেকে কয়েকজন revolutionist-crushed হয়ে গেছে।'

যখন এসব কথা বলতেন, ভাবতাম এমন ছেলে থাকতে ভারতের আজ এ দুর্দ্দশা কেন? যে দেশের সন্তান এমন করে মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ করতে পারে সেই দেশে আবার কিসের দৈন্য? কবি সত্যই গেয়েছেন ঃ

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী
ওগো আমার ভারতরাণী!

তারপর বললেন, 'আমাদের সাথে যদি আর কোনদিন দেখা না হয়, তবে চিরদিন আমাদের কথা মনে রেখ।' আমি বললাম, সে কথা কি আজ আমাদের বলে দিতে হবে?

মেশিনটা বের করে বললেন, 'আর কোনদিন দেখেছ কি?' খুব ছোট্ট একটি মেশিন একবার দেখেছিলাম, তাই বললাম। মেশিনের কোন্ part-কে কি বলে, কি করে গুলি ভরতে হয় সব দেখিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমি তো এখন পর্যন্ত একটুখানি training-ও পেলাম না, কাজ করব কি করে? বললেন, 'বাড়ি থেকে আর কোথাও যাচ্ছ বলে চলে আসতে পারবে তো?' পারব — বললাম। ও-রকম করে এসেই তো training নিতে হবে। সেদিন আর বেশী কথা হয়নি। আমি যখন রমণকে ডেকে দিতে আসছি তখন বললেন, 'তোমাকে তো ভাল করে দেখলাম না, আচ্ছা, আমি একবার ঐ ঘরে যাব, তুমি আমায় চিনতে পারবে তো?' বললাম — চিনব। অন্ধকারে যতখানি পারা যায় নির্ম্মলদাকে দেখে নিয়েছিলাম এবং যখন একথা জিজ্ঞাসা করলেন, মনে মনে বললাম, আর কিছু দেখে না চিনি চোখদুটো দেখে তো চিনবই।

এইভাবে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ শেষ হ'ল। কি অনুভূতি নিয়ে যে সেদিন ফিরে গেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব! এ-সব জনের সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, এবার মাষ্টারদার দেখাও পাব — এ আশা নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। তিন সপ্তাহ পরে আবার দেখা করতে যাওয়ার ঠিক হ'ল। এবার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, মাষ্টারদার সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখা হবে।

চাঁদের আলোতে যখন আমাদের নৌকাখানি স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছিল, মনে পড়ল রামকৃষ্ণদার কথা। আমার কাছেও একদিন কি উৎসাহ ভরেই না বন্ধুদের সঙ্গে এক নৌ-অভিযানের গল্প করেছিল! নৌকা ভেসে চলেছে। চারদিকের গাছপালা মাঠঘাট সব দেখে মনে হচ্ছিল, চট্টলমায়ের প্রতিটি অঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের কত ইতিহাসই না লেখা রয়েছে! নৌকা করে যখন মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে চলেছি, মনে হ'ল আমার এতদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। আমি কতদিন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছি — এমনি করে দেবতাদর্শনে চলেছি।

একটা ছোট কুটিরের অঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, নির্ম্মলদা একটা লুঙ্গি পরে উঠানে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন এবং বললেন, 'খুব ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? এতক্ষণ দেরী দেখে আমি তো ভাবছি, মাঝি তোমাকে মেরে গয়নাপত্র চুরি

করে নিল।' দু'জনেই হাসলাম। আমাকে সিঁড়ির কাছে ডেকে নিয়ে বিধবা মহিলাটিকে[৩] কি বলব সব বলে দিলেন। তারপর নিতান্ত শিশুটির মত হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার তো হাতে শাঁখা নাই, কপালে সিন্দুর নাই, মহিলা যদি সন্দেহ করে!' কথাগুলো বলবার ভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শিশুর মত উলঙ্গ প্রাণ না হলে কি এরা এত সহজে পরকে এতখানি আপন করে নিতে পারে!

আমার আশা নিষ্ফল হ'ল না। নির্ম্মলদা বললেন, 'মাষ্টারদা এখানে আছেন।' আনন্দে প্রাণ ভরে গেল।

নির্ম্মলদা পুকুর থেকে এক হাঁড়ি জল এনে দিয়ে বললেন, 'হাত পা ধোও।' আমি শুধু মুখ ধুয়ে যখন ঘরে গেলাম, তখন বলছিলেন, 'পা ধুলে না কেন? এমন করে লক্ষ্মীছাড়ামি করলে চলে না।' নির্ম্মলদা যখন এই ধরণের কথাগুলো বলতেন, আমার ভারি চমৎকার লাগত। তারপর মাষ্টারদা ঘরের ভিতর এলেন। পরে নির্ম্মলদা আস্তে আস্তে বললেন, 'প্রণাম কর।' সেই রাত্রিতে নির্ম্মলদার সঙ্গে বেশী কথা বলিনি, মাষ্টারদার সঙ্গেই বলেছিলাম। নির্ম্মলদা শুধু বলেছিলেন, 'বাড়িতে কি বলে এলে? কয়দিন থাকবে?' ইত্যাদি।

তারপর বললেন, 'মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বল। এই মানুষটি অতল, এঁর তল পাবে না। আমাদের মত মানুষ ঢের পাবে কিন্তু এঁর মত পাবে না। আমি ওঁকে বলেছি তুমি খুব intelligent। দেখি, তাঁকে কতখানি move করতে পার।' আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল, কারণ আমি ভাল করেই জানি যে আমি intelligent নই। কিন্তু উল্টো চাপ দিয়ে বললাম, intelligent দেখাবার এমন কি একটা সুযোগ দিয়েছেন যে বলছেন? তা ছাড়া আমি একটা মস্ত বোকা। মাষ্টারদা যখন এমনি আমার সঙ্গে কথা বলে বলবেন যে, আমার বুদ্ধি নেই, তখন আপনি খুব জব্দ হবেন। শুনে হাসতে লাগলেন। তারপর মাষ্টারদার সঙ্গে কিছু কথা বলে খেতে গেলাম। আমি নির্ম্মলদার সঙ্গে খেলাম।

খুব ভোরে নির্ম্মলদা এসে আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সামান্য বাজে কথাবার্তা বলার পর আমার হাতে মেশিনটা দিলেন। Trigger টিপতে পারছি না দেখে মুখে হতাশ হলেন না, বরং আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল, আর বললাম, একেই তো মেয়েলোক লক্ষ্মীছাড়া, তারপর হাতটা আরও লক্ষ্মীছাড়া — আমার আঙ্গুলটাকে পিটিয়ে ঠিক করে দিন। আমাকে নিরুৎসাহ হতে দেখে বললেন, 'নিরাশ হয়ো না, তিনদিনে সব ঠিক করে দেব। যদি আরও আগে তোমাদের পেতাম তবে অনন্তলালের হাতে তুলে দিতাম।' এই বলে অনন্তলালের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন, 'অনন্ত একজন born revolutionist-ভারি সুন্দর। সুখেন্দুর[৪] মৃত্যুর পর যখন আমরা meeting করি তখন একেবারে চটে গিয়ে বলেছিল,

৩. আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী ধলঘাট গ্রামের সাবিত্রী দেবী।

৪. বিপ্লবী সুখেন্দুবিকাশ দত্ত। ১৯২৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে একদল গুণ্ডা কর্তৃক ছুরিকাহত হন। ৯ই অক্টোবর কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (বর্তমানে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) তাঁর জীবনাবসান হয়।

"এসব করে কি হবে? বুকেব রক্ত যেদিন দিতে পারব, সেদিনই এর প্রতিকার হবে"। তারপর বললেন, 'তোমাদের অনন্তলালকে ভালত লাগত না।' খুব আশ্চর্য্য লাগল। বিশেষ কিছু না বলে শুধু বললাম, কে বলল আপনাকে? আমি তো বহুদিন ধরেই তাঁকে Indian Napolean ভেবে শ্রদ্ধা করে আসছি। আরও কিছুক্ষণ মেশিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া কবলাম। কয়েকটা যুযুৎসুও শিখিয়ে দিলেন।

এক একটা সাধারণ কথা শুনে নির্ম্মলদা কি রকম প্রাণ খুলে হাসতেন, আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাবতাম, এঁদের দুঃখ সইবার শক্তি যেমন অসীম তেমনি সত্যকার আনন্দ উপভোগ করতে কেবল এঁরাই জানে।

নির্ম্মলদার মধ্যে আমি এ জিনিষটা এত বেশী দেখতাম যে, অবাক হয়ে যেতাম। আমি আর রমণ ঘোমটা দিয়ে কি ভাবে এসেছিলাম, একটা মুসলমানী মেয়েলোককে কি কি বলেছিলাম — এসব গল্প বলছিলাম আর মহোৎসাহে শুনছিলেন। একবার বলছিলেন, 'তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখার বড় ইচ্ছা ছিল। দেখি তোমরা কি কর, কিন্তু দেখলাম না।' যাঁদের ভেতরটি সুন্দর, তাঁরাই এমনি করে জগতের সব কিছুর থেকেই সৌন্দর্য্য গ্রহণ করে থাকেন। তারপর আমাকে রামকৃষ্ণদার কথা বলতে বললেন আর আমি অনর্গল বলে যেতে লাগলাম। বললেন, 'তুমি যখন বামকৃষ্ণের কথা বল তখন মনে হয় যেন গল্প শুনছি — আমার প্রতি রামকৃষ্ণের খুব regard ছিল। আমি যে ধূর্ত তা সে জানত। তাই বলেছিল যে, সবার শেষে ধরা পড়ব। সত্যি ও যে কত বড় আগে বুঝিনি। একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করতাম যে, ও যখন কাউকে প্রণাম করত মাথাটা খাড়া থাকত।' বলতে বলতে নির্ম্মলদার চোখের কোণে জল দেখা দিল, দেখে আমার বুক ফেটে কান্না এল। এদের চোখের জল দেখা সেও বহু জন্মের পুণ্যের কথা, কেননা এ অশ্রুজল মর্ত্তের নয় — স্বর্গের। তারপর আমি নির্ম্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে লাগলাম। ওর নাকি নিরামিষ খেতে একটুও ভাল লাগত না। রোজই খেয়ে উঠে কাশত আর নির্ম্মলদা বলতেন, 'কি যে খেয়ে উঠেই কাশতে আরম্ভ কর!' ...এর পর থেকে খেয়ে উঠেই নাকি রামকৃষ্ণদা বলত, 'নির্ম্মলদা, একবার কাশব, শুধু একটিবার।' নির্ম্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে আমার বড়ই ভাল লাগত, উনিও খুব আগ্রহভরে বলতেন।

রামকৃষ্ণদাকে কয়েদীবেশে কারাগারে প্রথম দেখেছিলাম এবং সেখান থেকেই সে বিদায় নিল। ওর জীবনের এদিকটা আমার কাছে নিতান্তই অজানা ছিল। নির্ম্মলদার কথা শুনতে শুনতে আমি রামকৃষ্ণদাকে আমাদের মাঝখানে কল্পনা করতাম আর মনটি ব্যথায় ভরে উঠত। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একটু ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। নির্ম্মলদা একটু পরে উপরে যেতে বলে চলে গেলেন — আমি গিয়ে দেখি দু'তিনটি মানিব্যাগ খুলে টাকা গুণতে বসেছেন। আমাকে পাশে বসতে বললেন। মাষ্টারদার ব্যাগ থেকে কতকগুলি সিকি আর গিনি দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখ, এগুলি হারালে অমঙ্গল হবে।' বলে খুব হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের টাকা আলাদা

আলাদা থাকে বুঝি? 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, মাষ্টারদার চেয়ে আমার বেশী টাকা আছে। আমি চেয়ে নিতে পারি, কিন্তু মাষ্টারদা কারো কাছে চান না। মাষ্টারদার কাছে সব সময় এক হাজার টাকা থাকা দরকার। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এক এক সময় টাকা-পয়সার চিন্তায় আমার ঘুম পায় না — আর মাষ্টারদা শোওয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েন, ঠিক একটি ছোট ছেলের মত। আমার ভারি চমৎকার লাগে।'

এসব কথা হচ্ছে, এমন সময় মাষ্টারদা নীচের থেকে এলেন। ওঁরা দুজনে অন্য ঘরে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন। একটু পরে দেখি, নির্ম্মলদা ঐ দিন দুপুরে বের হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'দেখ, আমাদের সাহস কম নয়, দিনের বেলা বের হচ্ছি।' বললাম, তা তো দেখছিই, দুনিয়াতে আপনারা কিই বা না পারেন? কিন্তু আমার তো ভয় করছে। কোমরে মেশিন ও যুদ্ধ beltটি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন চোখে খুব সুন্দর লেগেছিল, বাঙালী বীরের এই সাধারণ যোদ্ধার বেশ ভারি নতুন লাগল।

সন্ধ্যার একটু পরে নির্ম্মলদা ফিরে এলেন। তখন জালালাবাদের কাহিনীর একটু বর্ণনা দিয়ে বললেন, স্বর্গের দেবতাগণ হয়ত সেইদিন এই লীলা দেখবার জন্য একত্র হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রিবেলা targetting-এ বের হলাম। জ্যোৎস্নাদেবী অতি সন্তর্পণে তাঁর রূপালী আঁচলখানি পৃথিবীর বক্ষে পেতে রেখেছিলেন। আমি যখন male dress নিয়ে নির্ম্মলদার সামনে এসে দাঁড়ালাম — কি ভীষণ হাসতে লাগলেন, আর বললেন, 'তোমাকে দেখে মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে না। একটি ছোট্ট ছেলের মত লাগছে।' আমি বললাম, তাই নাকি? তবে আমি আপনার ছোট ভাই। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।' আমরা পাঁচজন ছিলাম। কে যেন বললে — পঞ্চপাণ্ডবের মত লাগছে। নির্ম্মলদা আমাকে বললেন, 'তুমি সহদেব।' না, আমার অর্জুন হতে ইচ্ছে হচ্ছে, আর আপনি তো ভীম। যখন মাঠের উপর দিয়ে চলেছি, নির্ম্মলদা বলেছিলেন, 'Absconding life-এ এরকম অভিযান আর হয়নি। আজকের তারিখটা লিখে রেখো। মনে হচ্ছে যেন যাবার আগে দুনিয়ার সব সুখ লুটে নিয়ে যাচ্ছি।' এ-কথাটা আমার বড়ই লেগেছিল।

ফিরবার পথে মাঠের মাঝখানে দু'জনে বসলাম। আমাকে একটি গান করবার জন্য খুব সাধাসাধি করতে লাগলেন। বললাম, পারব না। যা তা হবে। লক্ষ্মীটি, আমাকে সাধবেন না, শেষকালে আমার কষ্ট হবে। লক্ষ্মীটি বললাম বলে খুব হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা দেখি, তুমি কেমন দৌড়াতে পার। একটি দৌড় দাও তো।' আমার খুব মজা লাগল, কারণ দৌড়াতে খুব ভালই পারি। দৌড়ে অনেকখানি গিয়ে যখন ফিরে এলাম, বললেন, 'বাঃ! বেশ তো দৌড়াতে পার, action করার সময় এরকম দৌড়াতে পারবে তো?' তারপর বললেন, 'তুমি আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে কোথায় চলে এসেছ! আমরা এখন তোমাকে মেরে ফেললেও কেউ টের পাবে না।' বললাম, সে অধিকার তো আপনাদের আছেই। আপনাদের কাছে তো নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু

আপনারাই তো নিচ্ছেন না। কেবল আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। বললেন, 'তোমাদের কিসের জন্য মারব? মারব না।'

যখন ফিরলাম, তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই অভিযান আমার জীবন-খাতার একটি বৃহৎ শূন্য পাতা পূর্ণ করে দিয়েছে। যদিও একটিমাত্র গুলি লাগাতে পেরেছিলাম বলে এক একবার খুব খারাপ লাগছিল, তবুও গুলি করলাম বলেই খুব মজা লাগছিল। আজও যখনি সেদিনের কথা মনে হয়, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি নির্ম্মলদার সঙ্গে targetting-এ যাওয়ার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আমি যেন তার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি।

পরের দিন সকালবেলা অনেকক্ষণ মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বললাম। দুপুরবেলা নির্ম্মলদার কাছে গেলাম। তখন বলেছিলেন, 'No revolutionary can die with satisfaction'. ওটা খুব ঠিক কথা। অনেক কিছু করা হ'ল না, ভেবেই তারা সারা।

সেদিন বিকেলেই আমার চলে আসবার কথা। নির্ম্মলদা বললেন, 'তুমি চলে যাবে বলে আমার খারাপ লাগছে। আমিও এখান থেকে চলে যাব। মাষ্টারদাকে একা একা রেখে যেতেও প্রাণ কাঁদে।' বললাম, একেবারে রেখে দিন না। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি মত দিলাম, এবার মাষ্টারদার মত নাও।'

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এস, সোনার বরণী রাণী গো... গানটা জানিস? আমাদের দলে তিনটি রাণী আছে of which you are the eldest.'

আমি বললাম of which আমি হলাম লোহার রাণী আর রমণ হল সোনার বরণী রাণী।

শুনে কি প্রাণমাতানো হাসিই না হেসেছিলেন! বললেন, 'লোহার-বরণী রাণীকেই তো আমার বেশী সুন্দর লাগে।' আমি ভীষণ হাসতে লাগলাম। নির্ম্মলদাও হাসলেন।

তারপর বললেন, 'একদিন হয় তো দেখবি যে দোকান সাজিয়ে দোকানদার হয়ে বসি আছি। যেখানেই থাকি না কেন তোদের খবর নেব। আর যদি ধরা পড়ি, তবে তুই আর রমণ মাঝে মাঝে লালদীঘির পাড়ে একটু দেখা দিস।'

অদৃষ্টের গতি একেবারে অন্যদিকে গেল। নির্ম্মলদার আমাদের খবর নিতে হ'ল না, আমাদেরও দেখা দিতে হ'ল না।

সেদিন বলেছিলেন, 'এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে one foot in grave, পৃথিবীর উপর সবাই এমনিভাবেই চলবে, থাকব না কেবল আমরা।'

নির্ম্মলদার কথাগুলো হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সেদিন তো ভাবিনি যে, তাঁর কথামত এত শীঘ্রই তিনি যাবেন! সত্যই তো আজ পৃথিবীর উপর জীবনের স্পন্দন তেমনিভাবেই হচ্ছে — কর্ম্মের অবিরাম প্রবাহ বিশ্বের বুকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তেমনিভাবেই চলেছে — কিন্তু নির্ম্মলদা তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেছেন।

ক্রমে আমার আসার সময় হ'ল। আসবার সময় যখন নির্ম্মলদাকে প্রণাম করতে গেলাম, বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব — আমাকে আর কোনদিন প্রণাম করো

না।' বললাম, আচ্ছা, আপনি এমনি প্রণাম করতে না দিলে কি হবে? মনে মনে করলে তো আর আটকাতে পারবেন না।

একটা কাগজে বেঁধে আমাকে একটা আশীর্ব্বাদ দিলেন। মাষ্টারদা বললেন, 'এগুলো preserve করো।' কি আনন্দের সঙ্গেই না এই আদেশ মাথায় নিয়েছিলাম!

ওঁদের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে ও ওঁদের দেওয়া শক্তি বুকে ধরে সেদিন ঘরে ফিরলাম।

কিছুদিন পর আবার আমার ডাক পড়ল। সেদিন রওনা হওয়ার কথা। সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সকালবেলা আমার কাছে একবার খবর দেবার কথা ছিল। কিন্তু কোন খবর না পেয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হলাম। ভাবলাম — যদি বৃষ্টির জন্য আমাকে না নেন, তবে খুব বকে দেব। আবার ভাবলাম, হয়তো situation খুব খারাপ হয়ে গেছে। বাসায় বলে রেখেছিলাম, সীতাকুণ্ড যাব। মাকে বললাম — বন্ধুদের জন্য কিছু খাবার করে দাও। দুপুর শেষ হয়ে গেল, তবুও কেউ যাচ্ছে না দেখে মাকে বললাম — নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরূপ কিছু করো না। কাপড়-চোপড় ঠিক করে রাখলাম — তারপর কেবল ঘর-বার করতে লাগলাম।

প্রায় ৫-টার সময় লোক গেল। কি উৎসাহ নিয়েই না সেদিন রওনা হয়েছিলাম — নির্ম্মলদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা করতে আসছি বলেই তো সেদিন এত উৎসাহ নিয়ে এসেছিলাম। উৎসাহ সব সময়ই তো থাকে, কিন্তু এবার যেন একটা অভিনব অনুভূতিতে মনটা ভরে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যখন কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্য পথ বেয়ে চলেছি, ভাবলাম এরকম কাদা মাড়াবার সুযোগ জীবনে আর কতবার মিলবে কে জানে।

গন্তব্যস্থানে যখন গিয়ে পৌঁছালাম — একটা অফুরন্ত উচ্ছল হাসির শব্দ আমার কানে গেল। নির্ম্মলদা বললেন, 'এই হ'ল অপূর্ব্ব সেন, যার সঙ্গে রামকৃষ্ণ তোমাকে আলাপ করতে বলেছিল।' চোখে দেখলাম, একখানা সহাস্য কচিমুখ, অন্তরের সরলতা যেন মুখখানাতে ফুটে উঠেছিল।

আমি যে খাবারের টিনটা নিয়েছিলাম, মাষ্টারদা সেটা থেকে একটা নারকেলের সন্দেশ বের করে খেলেন। দেখে আমার খুব আনন্দ হ'ল।

আমি ঘরের ভিতরে রইলাম, আর সবাই বারান্দায় খেতে বসে গেলেন। নির্ম্মলদা এক একবার ভিতরে ঢুকে আমার ভাগেরটা দিয়ে আসতে লাগলেন। ওঁর কাছে যে আশীর্ব্বাদ ছিল আমার মাথায় তা সস্নেহে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন — ভাবলাম, স্নেহ বিলাতেও বুঝি কেবল এঁরাই জানেন!

রাত্তিরে আর বেশী কথাবার্তা হ'ল না। মাষ্টারদা, নির্ম্মলদা দুজনেই বের হয়ে গেলেন। নির্ম্মলদাকে বললাম, আমাকে নিয়ে যাবেন না? বললেন, 'আর একদিন নেব।'

আমি নীচে মহিলার পাশে শুয়ে রইলাম, ছাদে কেবলই মচমচ শব্দ হচ্ছিল আর হাসির ফোয়ারা ছুটছিল। মহিলা আমার কাছে নালিশ করল, একটা ছেলে এসেছে,

কেবলই হাসে আর 'ভাল লাগে' বলে এমন একটা টান দেয় যে আর থামে না। শুনে ভোলার[৫] প্রতি গভীর স্নেহে আমার মনটা ভরে গেল।

সকালবেলা ভোলা নীচের থেকে খাবারের টিনটা নিয়ে এল। আমি তখন অন্য ঘরে নির্ম্মলদার কাছে বসেছিলাম। টিনটা হাতে নিয়ে ভোলা খুব হাসছিল। তারপর কি মাতামাতি করেই না সবাই মিলে খেতে লাগলেন। এঁদের খাইয়ে তৃপ্তি আছে।

নির্ম্মলদাকে বললাম, আমি এসে অবধি কেবল ওর হাসিই শুনছি, হাসিটা আমার ভারি সুন্দর লাগছে। উনি তখন বললেন, 'ছেলেটা ভারি jolly আর sincere — comic করতে জানে। ওর কাছে থাকলে আমিও হাসি থামাতে পারি না। সম্প্রতি absconder-দের মধ্যে ও হ'ল best production — এ রকমের ছেলে দু'একটা থাকলে দেশ আলো করে রাখতে পারবে।'

নির্ম্মলদার কথা শুনে কেবলই মনে হচ্ছিল এই সেই অপূর্ব্ব সেন। রামকৃষ্ণদা আমার কাছে শুধু তার নামটা করেছিল। ভাবলাম, নির্ম্মলদাকে বলি ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, কারণ রামকৃষ্ণদা বলে দিয়েছে। বলা আর হ'ল না।

সেদিন সারাটা দুপুর নির্ম্মলদা আমাকে machine training দিলেন। কি করে কাপড়ের মধ্যে লুকাব, হঠাৎ বের করব — aiming ইত্যাদি সব শিখিয়ে দিতে লাগলেন। এবার নির্ম্মলদা আমাকে মধ্যের অঙ্গুলি দিয়েই practice করালেন আর বললেন, 'তোকে এই আঙ্গুল দিয়েই action করাব। Secretটি কাউকে বলে দিস না, শুধু আমরা জানব। তারপর action হয়ে গেল সবাই জানবে।' আমার খুব আনন্দ হ'ল। বললাম, আগেরবার যখন আমি পারছিলাম না, তখন কেন এই আঙ্গুল দিয়ে practice করালেন না? নির্ম্মলদা হাসতে হাসতে বললেন, 'তখন তো মাথায় আসেনি।'

তারপর দু'জনে গল্প করতে বসলাম। তখন বিকেল হয়েছে। নির্ম্মলদা কয়েকজন ছেলের নাম করে বললেন, 'এরা সব সময় একসঙ্গে চলত, সদরঘাট এরাই আলো করে রেখেছিল। আনন্দ, রজত, ত্রিপুরা ও টেগরাকে আমরা টুলু, টান্টু, টুনু ও টেগরা বলে ডাকতাম। এতগুলিকে মেরে ফেলেছি, আর ভাল লাগছে না।' ভগবান বোধহয় অন্তরীক্ষ থেকে এই কথা শুনেছিলেন। তাই আর দেরী না করে নির্ম্মলদাকে কোলে তুলে নিলেন।

নির্ম্মলদা যখন এইসব ছেলের কথা বলছিলেন, তখন আমি বললাম, সত্যি চাটগাঁর উপর যে কাণ্ডটা হয়ে গেল তার পেছনে যে কত সুন্দর ইতিহাস রয়ে গেছে তার খবর কয়জনে রাখে? আমার কথা শুনে বললেন, 'তোমার পাণ্ডিত্য ও ছেলেমানুষি দুটোই আছে, এটা আমার খুব চমৎকার লাগে।' নির্ম্মলদার এই 'চমৎকার' কথাটিও চিরদিন আমার মনে থাকবে। কথায় কথায় শুধু 'চমৎকার' বলতেন। ভাবতাম, যে নিজে চমৎকার, তার কাছে সবই চমৎকার লাগে। ওখানে খুব smart চেহারার একটা ছোট ছেলে আসত। আমি নির্ম্মলদাকে বললাম, এই ছেলেটাকে আমার

৫. ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ অপূর্ব সেনের ডাকনাম।

খুব ভাল লাগে। তখন বললেন, 'মাষ্টারদা ওকে খুব আদর করেন — আমাকে আজকাল আদর করেন না। আমি বড় হয়ে গেছি, আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি সে কথা আমাব মনেই থাকে না। আয়না দেখলে মনে পড়ে।' শিশুর মত সরল ও পবিত্র প্রাণ যাঁদের তাঁদের আবার কিসের বার্দ্ধক্য?

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বলে খিচুড়ী রান্নার প্রস্তাব হ'ল এবং রান্নার ভার আমার উপর পড়ল। শুধু খিচুড়িটা রান্না হলেই সবাই মিলে একটা থালা করে খেতে বসে গেল। মহিলাটি বলছিল বেশী করে রান্না দেবার জন্য। ভাজাগুলো তখনো হয়নি বলে আমি নিষেধ করলাম। খাবার সময় ভোলার হাসি তেমনভাবেই চলছিল। নির্ম্মলদা খিচুড়ী খেয়ে এসে আমাকে বললেন, 'খিচুড়ীটা বেশ ভালই হয়েছে। রান্না করতে কবে শিখলে? তোমাদের হাতে নিশ্চয়ই অন্নপূর্ণা আছেন।' বললাম, হ্যাঁ, আমাদের হতে অন্নপূর্ণা আর আপনাদের হাতে বিশ্বকর্মা। খুব হাসতে লাগলেন।

আমি যখন আলুভাজা করছি, ভোলা একটুকরো কাগজ নিয়ে আমার কাছে বসে রইল আর বলল, 'দিদি, I must take আলুভাজা।' অল্প করে দিলাম। আরো চাইলে পর বললাম, আর দেব না, খিচুড়ী খাওয়া হবে কি দিয়ে? আলুভাজা খেয়ে পেঁয়াজভাজা খাওয়ার জন্য বসে রইল। আমাকে ডিমভাজার জন্য কাঁচালঙ্কা কেটে দিল।

নির্ম্মলদা দূর থেকে এসব লক্ষ্য করছিলেন। রাত্রিবেলা আমাকে বলছিলেন, 'ভোলা যখন তোমার সাথে কথা বলছিল আমার দেখে খুব ভাল লাগছিল।' আজ ভাবছি, যাবার আগে নির্ম্মলদা পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে গেলেন। দু'জনে একসঙ্গে যাবে বলেই হয়ত এমনি করে একজন আর একজনকে প্রাণভরে দেখে নিল।

রান্না হবার পর সবাই মিলে খেতে বসলাম। কেউ বেশী খেতে পারল না। পাতেই অনেক রয়ে গেল। ভোলা মহোৎসাহে বলতে লাগল, 'আমি কাগজে বেঁধে সব রেখে দেব আর সকালবেলা খাব।' Excellent হবে।' খাওয়া দাওয়ার পর নির্ম্মলদা নিজের ঘরের ভিতর শুয়ে রইলেন। ঝুমঝুম বৃষ্টি পড়ছিল। আমাকে ডেকে বললেন, 'একটা গান — সঙ্গে ভাত খেলাম — তোর রান্না খেলাম, রইল তোর একটা গান শোনা।'

চির অভ্যাসমত আমি কিছুতেই গান করলাম না। যদি জানতাম যে, নির্ম্মলদা এ জীবনে, আমাকে আর সাধতে আসবেন না তবে সেদিন যা হয় একটা গেয়ে দিতাম। আমি জানতামই যে মৃত্যু প্রতি মুহর্তেই এঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেজন্য গান করছি না বলে আমার খুব খারাপ লাগল আর বললাম, দোহাই আপনার, আমাকে সাধবেন না। ইতিমধ্যে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাষ্টারদা ওপর থেকে নেমে এলেন। নির্ম্মলদাও উঠে কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। নির্ম্মলদা যখন একটা ছাতা মাথায় দিয়ে উঠানে দাঁড়িয়েছেন, আমি বললাম, আমাকে নিয়ে যান। বললেন, 'আচ্ছা চল, এস, আমার ছাতার নীচে এসে দাঁড়াও।' বললাম, দাঁড়ালে কি হবে? শেষকালে তো তাড়িয়ে দেবেন।

রাত্রির অন্ধকারে বারিধারা মাথায় করে রওনা হলেন। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে

মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলাম; ভাবলাম কবি নিশ্চয়ই এই আপনভোলা ছন্নছাড়া বিপ্লবীদের হয়েই বলেছেন ঃ

কেবল তব মুখপানে চাহিয়া
বাহিব হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।

পরেব দিন সকালবেলা (অর্থাৎ ১৩ই জুন, সোমবার) আমি যখন গেলাম সবাই তখন ঘুমোচ্ছেন। মাষ্টারদা আমাকে নির্ম্মলদা যে ঘরে ঘুমিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে বসতে বললেন। নির্ম্মলদা ঘুমুচ্ছিলেন, আমি চুপ করে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পর নির্ম্মলদা ঘুম থেকে জেগে বললেন, 'তুমি যে কখন গোপনে এসে বসে আছ টেরই পাইনি।' তারপর বলতে লাগলেন ঃ

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি —
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।

শুনে আমি খুব হাসতে লাগলাম, নির্ম্মলদাও হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, বাঃ! poetry-তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন দেখছি। আমরা ক্লাশে বসে কি রকম poetry লিখতাম, জানেন?

রাগ করেছিলে ছেলেমানুষ
দেখবি ফিরে উড়বে ফানুস
কিম্বা খাবি লজেঞ্জুস্।

হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমরা তো ভয়ানক দুষ্টু দেখছি। মেয়েরা যে এত দুষ্টু হয় তা জানতাম না। আমার বড় দুঃখ রইল তোমাকে আর রমণকে একসঙ্গে দেখলাম না।'

সেদিন যে সমস্ত কথা বলেছিলেন মনে হয় নির্ম্মলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর যা কিছু বলার আছে সেইদিনই বলে নিতে হবে, আর বলা হবে না। বললেন, 'রমণের সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে বলো, আমার উপর রাগ না করতে। তুমি আর ও প্রায়ই একত্র হয়ে, তোমরা দু'জনের কথা দু'জনকে সব বলতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হচ্ছে Destiny-র against-এ কেউ যেতে পারে না। আমরা যতই করি না কেন, অবশেষে Destiny-র কাছে হার মানতেই হয়।'

তারপর বললেন, 'রামকৃষ্ণের একটা কথা আজ তোকে বলব। আমাদের absconding life-এ কত রকম ইতিহাস যে নিহিত আছে, তা কেউ জানে না।' রামকৃষ্ণদার organise করা একটি ছেলে absconding life-এ কি ভাবে মারা গেল, কি ভাবে ওর সৎকার করা হ'ল, রামকৃষ্ণদার মনে কি রকম লেগেছিল, একটি মহাপ্রাণ এমনি করে গোপনে ঝরে গেল — একই পথের পথিক প্রিয় বন্ধুগণ ছাড়া আর কেউ

জানল না।

তখন বললেন, 'রামকৃষ্ণ যখনই খুব গম্ভীর হয়ে থাকত আমরা ওকে ফুইট্যাদার[৬] কাছে পাঠিয়ে দিতাম। ও নিজে কিছুই বলত না। ফুইট্যাদাকে ও ভালবাসত এবং খুব respect করত।'

রামকৃষ্ণদাকে planchet-এ ডাকার কথা বলে বললেন, 'তুই আর মাষ্টারদা আনিস — আমি নয়; আমার ভয় করে, যদি কিছু না করে বসে আছি বলে বকে দেয়!'

আশ্চর্য্য, এবার মাস্টারদার সঙ্গে এই দুইদিন ধরে মোটেই কথা বলিনি। সারাক্ষণই কেবল নির্ম্মলদার কাছে বসেছিলাম। নির্ম্মলদার সঙ্গে এই জীবনে আর কথা বলতে হবে না বলেই হয়ত এরকম হয়েছিল। সেদিন সকালবেলা ভোলার জ্বর এসেছিল। জ্বরসুদ্ধ সারাদিন comic করেছে। এই আনন্দের উৎসটিকে যতই দেখছিলাম, ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

নির্ম্মলদা বললেন, 'ভোলা হ'ল মাস্টারদার assistant, ও বেশ ইংলিশ জানে। যা কিছু লেখা হয়, মাস্টারদা ওকে দিয়ে পড়ান।' তারপর বকে যেতে লাগলেন, 'ভোলা এর মধ্যে একদিন বাড়ি গিয়েছিল। বাড়িতে ওর সাতজন বৌদি আছে। বাড়িতে বৌদিদের বলেছিল, "তোমরা সবাই fall-in কর; আমি command করছি।" ছেলেপিলে সবগুলোকে জাগিয়ে দিয়েছিল।' শুনে আমার ভারি সুন্দর লাগল। আজ ভাবছি — এরকম করে বিদায় নেওয়াটা কেবল ওকেই সাজে, যাবার আগে একবার বাড়ি গিয়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এল।

নির্ম্মলদা আর একটু ঘুমিয়ে নিলেন। জেগে উঠে বললেন, 'দেখ, আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতে পারতাম। এখন যেন brain-এ কিছুই নেই বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে ক্রমাগত তিন চারদিন শুয়ে থাকতাম আর কাঁদতাম। লোকে বলত, এটার হ'ল কি?'

এই কথাগুলো যে নির্ম্মলদার কতখানি পরিচয় দিচ্ছিল শুধু তাই ভাবছিলাম। জগতের লোকে মনে করে বিপ্লবীরা একটা নেশার ঝোঁকে কেবল মারামারি কাটাকাটিই করতে জানে, কিন্তু এদের ভিতর যে কি বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আছে তার খোঁজ পাওয়ার সৌভাগ্য কয়জনেরই বা হয়। আর নির্ম্মলদার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরে বিশ্বকবির সেই গানটাই কেবল মনে হচ্ছিল ঃ

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো
পাগল, ওগো, ধরায় আস।।

আমাকে একবার একটু অন্যমনস্ক দেখে বলেছিলেন, 'তুমি এখন জীবননদীর এপারে, না ওপারে? জান, আমরা নদীর পারে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করতাম, "এই

৬. শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদারের ডাকনাম 'ফুইট্যা'।

জীবননদীর এপারে থাকবি, না ওপারে যাবি''? আজ ভাবছি, ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বুঝি লোকেব মুখ দিয়ে এরকম কথাই বের হয়। আমি বলেছিলাম, আপনারা যাবার আগে আমাদের দিয়ে কিছু করিয়ে যান। বললেন, 'আমরা চলে গেলেও করতে পারবে। কিন্তু আমরাও মাঝে মাঝে স্বার্থপরের মত মনে করি যে, আমরা না কবলে চলবে না। মাষ্টারদার শেষ কাজটা বাকী রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে female action'. আমি বললাম, আমাব বড় মরতে ইচ্ছে করছে। চন্দননগরে সুহাসিনীদি একটা great chance হারিয়েছেন। এখানে যদি পুলিশ আসে, আমি আপনার কাছ থেকে নড়ব না। নির্ম্মলদা বললেন, 'কিসের জন্য মরবি?' কে জানত যে কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাজির হবে আর নির্ম্মলদাকে কোলে তুলে নেবে — আমাকে স্পর্শও করবে না!

তারপর আমাকে বললেন, 'আমার পিঠে হাত বুলিয়ে শান্তি দে।' আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, শান্তি দেব না, নেব। বললেন, 'আমি আর এক জন্মে তোমার বোন হয়ে জন্মাব।' আমি বললাম, আমি আর জন্মে কিছুতেই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েলোক হব না।

এমনি করেই নির্ম্মলদা যাবার আগে সবকিছুই বলে গেলেন। আমাকে ভোলার জন্য সাগু জ্বাল দিতে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন সাগু রান্না করছি, ভোলা তখন ঘরের ভিতর গুনগুন করে গান করছিল। সাগুটা ঠাণ্ডা করে লেবু আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম। জীবনের শেষ খাওয়া খেয়ে নিল!

ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। স্মৃতির বোঝা আর ভারি না করলে খুশীই হব এবং করলেও অনুযোগ করব না। তারপর ভাত খাওয়ার ডাক পড়ল। নির্ম্মলদা ভাত খাবেন না বলে দিয়েছিলেন। আমি বরাবর নির্ম্মলদার সঙ্গে খেতাম। মাষ্টারদার সঙ্গে ভাত দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে চলে গেলাম। নির্ম্মলদা একা চুপ করে শুয়েছিলেন, না জানি তিনি তখন কোন্ অমরলোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন!

আমি বললাম, মাষ্টারদার সঙ্গে খেতে লজ্জা করছে বলে আমি পালিয়েছি, পালিয়েছি বলে আরও লজ্জা করছে। মাষ্টারদা নিশ্চয় এটা টের পেয়েছেন। নির্ম্মলদা হাসতে হাসতে বললেন, 'তাতে কিছু হবে না।' এমন সময় নীচে থেকে মাষ্টারদা বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে এসে বললেন, 'পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে।' ভাবলাম এই মুহূর্তেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব। কিন্তু আমায় থাকতে দিলেন না — মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে বললেন, কথামত নেমে গেলাম।

দুইদিক থেকে গুলি চালাচালি হতে লাগল। দুই একটা জয়ধ্বনিও আমার কানে গেল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হবার পর নির্ম্মলদার আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম, শোনামাত্র উপরে উঠতে গেলাম আর তিনজনে মিলে আমাকে চেপে ধরল। ওদিকে কি করুণ সুরেই না আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন! উপরে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। ওদের কত ভয় দেখালাম — চোখ রাঙালাম। ছোট মেয়েটিকে একটি ঘুষি দিলাম।

কিছুতেই আমায় ছাড়ল না। তারপর বললাম, আচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না। তবু ছাড়ল না। একবার মইয়ের প্রায় অর্ধেক যেতে পেরেছিলাম — টান দিয়ে আমাকে ফেলে দিল। নির্ম্মলদার ডাক আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। নির্ম্মলদার কাছে যদি একটিবার যেতে পারতাম, জানি না আমায কি বলতেন; কিন্তু আমার নাম ধরে যে এতবার ডাকলেন — এর চাইতে বেশী আর কি চাই? ভগবান আমাকে একটিবার নির্ম্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না! এই ব্যর্থতা আমার বুকে প্রতিনিয়ত শেলের মত বেঁধে — ধৈর্য্যের বাঁধ একেবাবে ভেঙে দিতে চায়। এমন সময় মাষ্টারদা ও ভোলা নীচে নেমে এলেন। দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। এতক্ষণ ওঁদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে একবার মনে হয়েছিল তাঁরাও নেই। মাষ্টারদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব — তোর life-টাও নষ্ট করলাম।' মাষ্টারদার পায়ে ধরে বললাম, আমি আপনাদেব সঙ্গে যাব। আমি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, মাষ্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না। চোখের একটিমাত্র পলকে ভোলাকে একবার দেখেছিলাম। কি চমৎকার লেগেছিল! মুখে এতটুকু চাঞ্চল্যের ভাব নেই। বীরের মত বুক ফুলিয়ে মাষ্টারদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তিনজনে রওনা হলাম। ভোলা আগে আগে ছিল। সম্মুখে মৃত্যু এই বীর ভাইটিকে গ্রাস করবার জন্য তার লেলিহান্ জিহ্বা বের করেছিল। আর সে বীরদর্পে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভদ্রার অভিমন্যুর প্রতি শত্রুর দল শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেছিল। আমাদের অভিমন্যু সহস্রভেদী বাণ খেয়ে নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জন দিল।

মাষ্টারদা দু'টি রত্ন হারিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। মাষ্টারদার সঙ্গে আমি চলে এলাম। আমার জীবন ধন্য হ'ল। না — মাষ্টারদার নাম উল্লেখ করে আর কাজ নেই! মাষ্টারদার যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম এখন তা লিখতে বসে আমি তাঁকে ছোট করে দেব না।

রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন, ভোলার সঙ্গে আলাপ করতে। আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু'দিন ধরে কেবল ওর হাসিই শুনেছিলাম। সবশেষে আমারই দু' চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্ম্মলদা অতি অল্পদিনেই অনেকখানি আপন করে নিয়েছিলেন আমাকে। কেবলই মনে হয় যে, নির্ম্মলদা সব বুঝেছিলেন, তাই একটুও দেরী না করে যা কিছু বলবার বলে নিলেন। যতই মনে পড়ে যে, নির্ম্মলদা বলেছিলেন চাটগাঁ শহরের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন, যাবার আগে একটা কিছু করে যাবেন, ততই মন বলে ওঠে ঃ

মরমেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল
প্রাণভরা আশা সমাধি-পাশে।

(প্রবাসী, ১৩৫৬, আষাঢ় সংখ্যা থেকে গৃহীত)

প্রীতি ওয়াদ্দেদার

কল্পনা দত্ত (যোশী)

পাহাড়তলি স্টেশনের কাছে পাহাড়তলি রেলওয়ে ক্লাব; প্রতি শনিবার সাহেব - মেমদেব জমায়েত হয় সেখানে। খানাপিনা চলে, নাচ বাজনা হয়, কিছুক্ষণ স্ফূর্তি করার পর যে যার ঘরে চলে যায়।

১৯৩২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর ছিল এমনি এক শনিবার। রাত ৯ টা হবে, হঠাৎ সমস্ত স্ফূর্তি কোলাহল থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে উঠল আর্তনাদ এবং বোমা ও গোলাগুলিব শব্দ। সাহেব-মেম ইতস্তত ছুটোছুটি ক'রে দরজা জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে, আবার বাধা পেয়ে ছুটে আসছে ভিতরে।

মিনিট পনের পর দেখা গেল সব চুপচাপ—কেবল আহতদের গোঙানি আর নিহত ও আহতদের রক্তে ঘরের গোটা মেঝেতে রক্তস্রোত বইছে।

আটজন ছেলে হানা দেয় প্রীতি ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে, নির্বিঘ্নে সকলে পালিয়ে যায়, কিন্তু প্রীতি ফিরে গেল না, খেয়ে নিল পটাশিয়াম সায়ানাইড।

ক্লাব-ঘরের দশ গজ দূরে গিয়ে সে পড়ে গেল। একটি বোমার টুকরোয় তার বুকের জামাটাও রক্তাক্ত হয়ে আছে।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অনেক ছেলে ফাঁসিতে গেছে, মরেছে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষের কথাও শোনা গেছে অনেক। কিন্তু এই আন্দোলনে মেয়েদের স্থান ছিল না এতদিন, নেতারা তাঁদের বিশ্বাস করতেন না। ১৯৩০ সালে মেয়েরা কিছু কিছু এর ভিতর এলেও প্রত্যক্ষ কাজে মেয়েরা নেমেছে খুব কমই।

প্রীতি ওয়াদ্দাদারের মৃত্যুতে জনসাধারণ দেখল, মেয়েরাও এসব কাজে পিছিয়ে থাকে না। আত্মদানে ছেলেদের থেকে তারাও কিছু কম নয়। কাজের পন্থা নিয়ে সমালোচনা কেউ কেউ করলেও প্রীতি ওয়াদ্দাদারকে তাদের বীরকন্যা বলে চট্টগ্রামের জনসাধারণ স্মরণ করে। প্রীতি ওয়াদ্দাদারের আত্মদানকে তারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়, বলে, 'পুলিশের হাতে ধরা দেয় নি সে'।

আমি তখন জেলে—প্রীতি তার কাজে লিপ্ত হ'বার এক সপ্তাহ আগেই আমি ধরা পড়ে গেছি। পুলিশেরা ভেবে হয়রান হয়ে গেছে, পুরুষের বেশে পাহাড়তলিতে আমার যাওয়ার অর্থ কী হতে পারে। আমার গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহ করলেও চার্জ করার মতো কিছু পায়নি।

২৫শে সেপ্টেম্বর জেলার গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টার সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেই বললেন, 'বড় বাঁচান বাঁচিয়েছি আমরা তোমাকে।'

আবার কিছুক্ষণ পরে আরেকজন এসে বললে, 'আমাদের বড় সৌভাগ্য আপনার

মতো মেয়েকে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি।' অধৈর্য হয়ে উঠেছি। আসল কথা কেউ জানে না । কিছুক্ষণ পর ইন্সপেক্টর বললে, 'কাল প্রীতি মারা গেছে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে পাহাড়তলি ক্লাব আক্রমণ করার পর; এবার বুঝেছি তুমিও সেই পাহাড়তলি আক্রমণে যাচ্ছিলে — আমরা না ধরলে তোমার সেই একই অবস্থা হতো। প্রীতিকেও ঠিক তোমার পোশাকে পাওয়া গেছে।' আরো অনেক কিছু সে বলে চলল।

আমার অত কথা শোনার মন ছিল না, শুনতে পারছিলাম না।

ঘরে চলে এলাম। প্রীতির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। যে চারজন মেয়ে আমরা এই দলে যোগ দিয়েছিলাম, তার মধে দু'জন শেষ পর্যন্ত চলে গেছে, ছিলাম শুধু আমি ও প্রীতি।

আমরা ধরা পড়ার আগের দিন ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে খবর পেয়ে কাট্টলি গ্রামে গেছি। কথা ছিল, আমাকে ও প্রীতিকে দু'জনকেই একসঙ্গে কাজে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। খবর পেলেই বাড়ি থেকে যেন আমি একেবারে প্রস্তুত হয়ে চলে আসি। বাড়িতে আমাকে ফিরে যেতে হবে না। এর আগের বার যখন আসি, ফুটুদা আমায় একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফুটুদাও একজন পলাতক নেতা।

তাই আমিও প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। প্রীতি মাস দেড়েক আগে পলাতক হয়ে গেছে। পলাতক অবস্থায় তার সঙ্গে সেই প্রথম দেখা।

রাত্রে সমুদ্রের ধারে গিয়ে হল টার্গেটিং শিক্ষা — তারপর দু'জনে মিলে কিছুক্ষণ গান ক'রে চলে এলাম। ফুটুদা বললেন, 'আমায় বাসায় ফিরে যেতে হবে, কাজ শুরু হতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে — খোঁজখবর এখনো সব এসে পৌঁছায়নি। বাসায় ফিরে যদি না যাই, ঘরের লোকও অস্থির হয়ে পড়বে। পুলিশের মধ্যে যখন জানাজানি হবে তখন খানাতল্লাসি বেড়ে যাবে, কাজেও বাধা আসতে পারে।' আমার উপরে নিয়ন্ত্রণ আদেশ ছিল সরকারের।

প্রীতিও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিতে লাগল। আমার দুঃখ রাখবার জায়গা আর রইল না। আমি জানতাম, নিশ্চয় আমি ধরা পড়ব এবার বাড়ি ফিরে গেলে। কিছুদিন ধরে ইন্সপেক্টরটি নিত্যই আনাগোনা করছিলেন আমাদের বাসায়। ঘরে গিয়ে আমায় না পেলে তো নিয়ন্ত্রণ আদেশ লঙঘনের অপরাধেও জেল হবে আমার। আমি যেতে নারাজ। শেষ সিদ্ধান্ত হল বাসায় গিয়ে যদি বুঝি অবস্থা খারাপ তবে চলে আসব, আর আমার সঙ্গে থাকবে রিভলবার। সত্যিই যদি ধরতে আসে, গুলি করে চলে আসব। প্রীতি আমাকে 'ছেলেমানুষি কোরো না' বলে বিদায় দিল।

প্রীতি আমার চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড়। ওর মুখে ঐ ধরণের কথা শুনে রাগ হল, মনে হল যেন কত বড় হয়ে গেছে সে।

১৭ই সেপ্টেম্বর সকালের দিকে বাসার কাছাকাছি যেতেই দেখি গোয়েন্দা বিভাগের লোক ঘরের বারান্দায়। তখনই ফিরে চলে আসি। রাত্রে প্রীতিদের আস্তানায় যাবার

পথে ধবা পড়ি, ধরা পড়েই প্রীতির ওপরেই বাগ হল আর অভিমান — ও আমার বন্ধু, ও জোর করলে হয়ত থাকতেও পারতাম, আজ ধরা পড়তে হতো না।

সাত দিন পরেই প্রীতি মারা যায়। দিন সাতেক আগে যার সাথে কথা কাটাকাটি ক'রে এসেছি, যার উপর এতদিন মনে অভিমান পোষণ ক'রে এসেছি, সে নেই — এ কথা ভাবতে পারছিলাম না; আর ভাবছিলাম, আমি যদি প্রীতির কাছে থাকতাম, আত্মহত্যা করতে দিতাম না ওকে কিছুতেই।

মাষ্টারদার মুখে শুনি প্রীতির আত্মহত্যার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করা যে মেয়েরাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে. দেশের জন্য তারাও লড়তে পারে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, বেঁচে থেকে আরো অনেক বেশি কাজ সে করতে পারত।

প্রীতিকে জানি খুব ছোটবেলা থেকে, একই স্কুলে পড়ি দু'জনে। ও পড়ে এক ক্লাস উপরে, আমি পড়ি এক ক্লাস নীচে। পরিচয় হয় প্রথমে ব্যাডমিন্টন খেলার সাথী হিসেবে।

স্কুলের নিয়ম অনুসারে আমাদের ক্লাস ফাইভে উঠলেই ব্যাডমিন্টন খেলা ও লাইব্রেরির বই ব্যবহার করা ইত্যাদির অধিকার জন্মাত। কিন্তু অধিকার জন্মালেই হয় না। কোর্ট ছেড়ে দিতে হবে বড় মেয়েদের জন্য, সেইজন্য টিফিনের সময় দুপুর রোদে আমি খেলতে চাইতাম, অসময়ে খেলার সাথী হিসেবে পেতাম ওকে। ওব সাথে ঘনিষ্ঠতা এমনি করেই জমে উঠেছিল।

বড় ক্লাসে উঠে দুজনেই 'গার্ল গাইড'-এ যোগ দিয়েছিলাম। আমরা বলতাম আমাদের উচিত ঐ ওদের অর্থাৎ ব্রিটিশদের ভালো জিনিস শিখে নেওয়া, আমাদের কাজে লাগবে। দু'জনে জল্পনা-কল্পনা করতাম। আর ভাবতাম গাইডদের প্রতিজ্ঞাগুলো বদলে নিলে কেমন হয়! To be loyal to God and the king Emperor না বলে To be loyal to God and the Country হলে কেমন হয়!

গল্প প্রসঙ্গে ওর মুখে শুনতাম, ওদের বাড়িতে কেউ বিলিতি জিনিস ব্যবহার করে না, ওরা সকলেই স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করে। ওর কাছে মনে মনে ছোট হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে কাপড়-চোপড় থেকে আরম্ভ করে সবই বিলিতি।

গল্প করতাম আমরা অনেক কিছুই, কিন্তু আমাদের আদর্শ কী, কী করব না করব সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের গড়ে ওঠেনি তখনো। কোনো সময়ে বা আমরা বড় বিজ্ঞানবিদ্ হয়ে যাব মনস্থ করেছি, কোনো সময় বা মনে করেছি ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ হব, কোনো সময় বা হয়ে উঠেছি ঘোরতর বিপ্লবী! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো স্কলার হয়ে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি নেওয়ার পরিকল্পনা বহুবার হয়ে গেছে।

আবার প্রীতি — তখন একথাও বলত, ও যদি ম্যাট্রিকে বৃত্তি না পায় তবে ওর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া চলবে না — খরচ বেশি। অথচ ওর খুব ইচ্ছে ছিল

কলকাতায় পড়ে।

বৃত্তি ও পায়নি,অঙ্কতে ও বিশেষ ভালো ছিল না বলে ফল খারাপ হয়ে যায়। ও চলে যায় ঢাকায়।

তার পরের বছর আমিও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। কলকাতায় আমি ছাত্রী-সমিতিতে যোগ দিয়েছি — লাঠি, ছোরা ইত্যাদি শিখি। প্রীতি ঢাকায় দীপালি সংঘে যোগ দিয়েছে, আর শেখে লাঠি, ছোরা এইসব।

এই সময়েই চাটগাঁয়ে প্রীতি, আমি ও আরো দু'জন মেয়ে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসি। প্রীতি ঐ দু'জনকে বিশেষ বিশ্বাস করত না, যদিও স্কুলে ওরা ছিল ওর বন্ধু। বলত, ঠিক ওরা দল ছেড়ে চলে যাবে। ভীরুতাকে ও ঘৃণা করত।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৯২৯ সালে গোয়েন্দা বিভাগের একটি সার্কুলার বেরোয়। তার প্রতিবাদে সমস্ত স্কুল-কলেজ করবে ধর্মঘট।

আমরা ছুটিতে বাড়ি এসেছি, খাস্তগীর স্কুলে পিকেট করলাম আমরা চারজন। এরপর থেকে স্কুলে বেড়াতে যাওয়া আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। আমরা যেতে পারিনি, অন্য দু'জন ঠিক স্কুলে গিয়ে আবার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে নিল। প্রীতি আমাকে বলেছিল, নিশ্চয় ওরা সুরমাদি মিনিদির কাছে ক্ষমা চেয়েছে। আমরা দোষ করিনি, মরলেও ক্ষমা চাইতে পারব না।

এর পর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। প্রীতি ঢাকা কলেজ থেকে আই-এ পাস করে বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় বেথুন কলেজে চলে এলো। আমি বেথুন কলেজ থেকে 'ট্রান্সফার'নিয়ে চাটগাঁয় এসে পড়বার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম এবং চাটগাঁতেই রয়ে গেলাম, ফলে প্রীতির আগেই মাস্টারদার সঙ্গে আমার দেখা ও যোগাযোগ হয়েছিল।

প্রীতির ছিল অসম্ভব আত্মবিশ্বাস, তাই সে ভাবতেও পারত না কেউ ওকে অবিশ্বাস করতে পারে।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আই-এস্-সি পরীক্ষার কিছুদিন আগে কলকাতা যাই দলের কাজে। মার্চ মাসে পরীক্ষা — তাই ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা যাওয়া অস্বাভাবিক ঠেকেছিল, প্রীতি সন্দেহ করেছিল। শেষকালে দাদাদের নির্দেশ অনুযায়ী যখন আবার জিনিসপত্র নিয়ে অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে আসি, ও মনে মনে অসম্ভব আহত হয়েছিল। আমারও কষ্ট হয়েছিল, আমিও জানতাম, প্রীতির মতো বিশ্বাসযোগ্য আর কেউ নেই। সেইবারেই মাষ্টারদাকে প্রীতির সঙ্গে দেখা করবার জন্য অনুরোধ করি। সে আমাদের সকলের চাইতে ভালো, এই ছিল আমার ধারণা। ১৯৩২ সালে প্রীতির সঙ্গে মাষ্টারদার প্রথম দেখা হয় — ও তখন বি-এ পরীক্ষা দিয়ে চাটগাঁয়ে চলে এসেছে।

প্রীতির কথা বলতে গিয়ে মাষ্টারদা এক কথায় বলেছিলেন, 'অমন মেয়ে আর আমি দেখিনি।' দু'টো জিনিসের এত সুন্দর সামঞ্জস্য আর কোথাও মেলে না। ও যেমন স্ফূর্তিবাজ তেমনি ধীর স্থির আবার চিন্তাশীল। কোমলে-কঠিনে মিলে ও অনন্য।

ওর জীবনেরই একটি ঘটনা। মাষ্টারদাদের সঙ্গে ও দেখা করতে গেছে ১৯৩১

সালের মে মাসে ধলঘাটের এক গ্রামে। সন্ধ্যার সময় ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে সৈন্যদল বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। প্রস্তুত ছিল না ও একটুও, মেশিনগান চলল অপর পক্ষ থেকে, আমাদের পক্ষ থেকেও গুলি চলল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হতভম্ব ভাব কেটে গেলে প্রীতিও গুলি চালাতে লাগল। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত, নির্মলদা গুরুতবভাবে আহত, বাঁচবেনা। ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের মৃত্যুতে সৈন্যরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, মাষ্টারদার নির্দেশ এলো পালাবার চেষ্টা করতে হবে।

যে-প্রীতি এতক্ষণ অন্যান্যদের মতো প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল সে- প্রীতি আহত নির্মলদার জন্য বিচলিত হয়ে পড়ল। আহত সাথী একজনকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে সে পারবে না। অসম্ভব ভালোবাসত প্রীতি দলের প্রত্যেককে, নিজেব প্রাণ ওর কাছে ছিল তুচ্ছ ব্যাপার। শেষকালে মাষ্টারদা ওকে টেনে বের করে নিয়ে আসেন। ঘটনাটা শুনে মনে হয়েছিল মাষ্টারদার উক্তির সত্যতা। মনে হয়েছিল — হাতে আছে ওর আয়ুধ, আর বুকে আছে ওর অমৃত।

প্রীতি বিপদের সম্মুখীন হয়ে এতটুকুও ভয় পেত না। কিন্তু নিজের জন্য আর কাউকে অসুবিধায় ফেলতে সে সংকোচ বোধ করত।

এই ধলঘাটের ঘটনাব পর সে পালিয়ে আসতে পারলেও সেই বাড়িতে তার কাপড়চোপড় পাওয়া যায়। শহরে নিজের বাসায় ফিরে এলেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি, সন্দেহ করতে পারেনি।

মাষ্টারদা খবর পাঠালেন শহরে ওকে লুকিয়ে রাখতে হবে। বাসা থেকে ওর চলে আসার পর পুলিশের দৃষ্টি আমার উপর বেড়ে গেল। আমাদের বাড়িতে শাসনও আরো একটু কড়া হয়ে উঠল। তাই ও মনস্থ করল নিজের বাসায় চলে যাবে এবং বলল, 'কল্পনা, আমি চাইনা আমার জন্য তুমিও গ্রেফতার হও, আমি অন্য ব্যবস্থা করব, এখন বাসায় চলে যাই।'

মাষ্টারদা ওর জন্য পরে অন্য ব্যবস্থা ক'রে তাকে নিয়ে যান। ৫ই জুলাই, ১৯৩২ সালে, পুলিশ তাকে ধরতে গিয়ে দেখে সে পালিয়েছে। আমাদের বাসায় এসে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর বলে, 'এত শান্তশিষ্ট নম্র মেয়ে ও, এত সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারে, ভাবতেও পারি না তার ভেতর এত কিছু আছে! আমাদের খুব ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে গেল।'

শুধু চাটগাঁয়ের এদের ফাঁকি দেওয়া নয়, কলকাতায় দিনের পর দিন মিথ্যা নামে ফাঁসির আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রীতি দেখা ক'রে এসেছে। কেউ তাকে চিনতেও পারেনি, ধরতেও পারেনি, বুঝতেও পারেনি। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন চাটগাঁয়ের ছেলে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামী, চাঁদপুরে তারিণী মুখার্জীর হত্যার মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কলকাতা সেন্ট্রাল জেলে তিনি থাকতেন। প্রীতি 'অমিতা দাস' নাম দিয়ে ৪০ বার 'ইন্টারভিউ' দিয়েছে তাঁর সঙ্গে, পুলিশের বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। শুধু পুলিশ নয়, বোর্ডিং-এ সুপারিণ্টেডেন্টেও সন্দেহ করেনি কোনোদিন।

ধলঘাটে রামকৃষ্ণদা সম্বন্ধে ওর লেখা একটি প্রবন্ধ পাওয়ার পরে পুলিশ জানতে পারে।

রামকৃষ্ণদার ফাঁসি হওয়ার পর প্রীতি প্রত্যক্ষ কাজে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তারপরে হয় ওর মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা। ধলঘাটে চোখের সামনে নির্মলদার মৃত্যু ওকে আরো বিচলিত ক'রে তোলে। মাষ্টারদা বলেছিলেন, হয়ত আত্মহত্যা করবার সপক্ষে এত যুক্তি সে সে-জন্যই দিয়েছিল। অত্যন্ত প্রিয় দু'জনের মৃত্যু ওকে আঘাত করেছিল খুব বেশি। মাষ্টারদা বলতেন, 'আত্মহত্যা আমি একেবারেই সমর্থন করি না, কিন্তু যাওযার আগের মুহূর্তে তার যুক্তি দিয়ে সে আমার সমর্থন আদায় ক'রে পটাশিযাম সায়ানাইড চেয়ে নিয়ে গেল। প্রীতির আগ্রহের কাছে আমার যুক্তি টিকল না।'

ছোট একটি কথা, কিন্তু তাতেই প্রীতির স্নেহপ্রবণ ও দয়ালু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩০-এর পূজার বন্ধে ওদের বাড়িতে গিয়েছি। কথা হচ্ছিল, পাঁঠা কাটতে পারব কি না। আমি বলেছিলাম, 'নিশ্চয় পারব, আমার মোটেই ভয় করেনা।' প্রীতি উত্তর দিয়েছিল, 'ভয়ের প্রশ্ন না, কিন্তু আমি পারব না নিরীহ একটি জীবকে হত্যা করতে।' একজন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, 'কী, দেশের স্বাধীনতার জন্যও তুমি অহিংস উপায়ে সংগ্রাম করতে চাও?' আমার মনে পড়ে প্রীতির স্পষ্ট জবাব, 'স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও পারব, প্রাণ নিতেও মোটেই মায়া হবে না। কিন্তু নিরীহ জীব হত্যা করতে সত্যিই মায়া হয়, পারব না।' দু'বছরের মধ্যেই এর প্রমাণ অক্ষরে অক্ষরে সে দিয়ে গিয়েছে। পাহাড়তলি আক্রমণের নেতৃত্ব প্রীতিই নিয়েছিল, পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা ক'রে প্রমাণও ক'রে দিয়েছিল দেশের জন্য আত্মদান সে কত সহজেই করতে পারে।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে শুরু ক'রে চাটগাঁয়ে সব আন্দোলনের সমস্ত খরচই দলের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেই নেওয়া হতো। প্রত্যেক কর্মীই তার সাধ্যমতো টাকা বাড়ি থেকে এনে দলের কাজে দিয়েছে। প্রীতির বাড়ির অবস্থা বরাবরই খারাপ ছিল। বাবা মিউনিসিপ্যালিটির কেরাণি ছিলেন, সামান্য মাইনে যা পেতেন তাতে সংসার চালানোই কষ্টকর ছিল। প্রীতির উপরই সংসারের সমস্ত ভার ছিল। বাবা মাইনে পেয়েই ওর কাছে দিতেন। একদিন দুপুরে ওদের বাড়িতে বসেই টাকার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। ৫০০ টাকা সেদিনই মাষ্টারদার কাছে পাঠাতে হবে। ৪৫০ টাকা জোগাড় হয়েছে, আরো ৫০ টাকা চাই। ওকে টাকার কথা বলা হয়নি, ওদের বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলে। আলোচনাকালে কাউকে কিছু না বলে সে উঠে গেল, পরমুহূর্তেই ৫০ টাকা এনে হাতে দিল। টাকা কোথায় পেল জিজ্ঞেস করাতে অম্লান বদনে সে বলল, 'কাল বাবা মাইনে পেয়েছেন, টাকাতো আমার কাছেই থাকে, সমস্ত টাকাটাই দিলাম।' প্রতিবাদ করা হলো দু'টো কারণে। প্রথমত, সংসারে খরচ চালাবার আর কিছুই রইল না, আর বাসায় বাবা যখন ফিরবেন তখন এই নিয়ে হৈ চৈ হবে, ওর উপর বাড়ির সবাই বিশ্বাস হারাবে। প্রীতি উত্তর দিল, 'সংসার চালাবার ভার আমার উপর। আমি বুঝব, তা নিয়ে

আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আর বাড়িতে এই নিয়ে গোলমাল হবার কোনো আশঙ্কাই নেই। আমার উপর বাবার বিশ্বাস কোনোদিনই ভাঙবে না, তা ছাড়া আমি তো নিজেই বলব বাবাকে যে আমিই টাকাটা খরচ করেছি। আপনাদের ভয় নেই — বাবা জিজ্ঞাসাও করবেন না কিসে খরচ হল। আমি টাকা খরচ করেছি শুনলেই বুঝবেন কোনো ভালো কাজেই খরচ হয়েছে এবং সে কাজ সংসার চালাবার চেয়েও 'মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ।' তবুও টাকা গ্রহণ করায় আপত্তি দেখে ও প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, 'গরিব দেখে আমাদের টাকা নিতে চান না। আমি যে নিষ্ঠাবান কর্মী হতে পারব তার প্রমাণ করার সুযোগও কি আমায় দেবেন না?' এই কথার পর টাকা নিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

প্রীতি শুধু স্কুল কলেজে ভালো মেয়েই ছিল না, সে লিখতে পারত খুব ভালো, ভালো সাহিত্যিক ছিল সে। ইন্টারমিডিয়েটে ঢাকা ইউনিভারসিটি থেকে মেয়েদের মধ্যে সে প্রথম হয়। পলাতক জীবনে সে যা লিখত সকলে তা আওড়াতো কথায় কথায়।

ছোটবেলা থেকে তার অদ্ভুত মেধাশক্তি দেখে ওর বাবা অবস্থাপন্ন না হলেও ওকে পড়িয়েছেন। প্রীতিও বলত, ওর বাবা বলেন, 'তোকে ঘিরেই রয়েছে আমার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা।' বাবার কথা বলতে গিয়ে প্রীতির চোখদু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ওর বাবাকে ও খুবই ভালোবাসত।

প্রীতির বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার কিছু আগে ওর বাবার চাকরি যায়, ফলে প্রীতির আয়ের উপরই নির্ভর ক'রে চলতে হতো সকলের। মা-বাবা, আর চারটি ভাইবোন। সে নন্দনকানন হাইস্কুলে মাস্টারি করত, আর করত একটা টিউশনি।

কিন্তু দেশের কাজের জন্য ও সমস্ত তুচ্ছ ক'রে চলে গিয়েছিল। একান্ত আপন যারা ছিল তাদের দুঃখ-কষ্ট, তাদের চোখের জলও তাকে পিছু টানতে পারেনি। দেশের হাজার হাজার মা বাবার চোখের জল দূর করবার আদর্শকে সে গ্রহণ করেছে।

প্রীতির বাবা শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রীতির মা গর্ব ক'রে বলতেন, আমার মেয়ে দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছে।' তাঁদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না, তবু তিনি সে-দুঃখকে দুঃখ মনে করেননি। ধাত্রীর কাজ নিয়ে তিনি সংসার চালিয়ে নিয়েছেন, আজও তাঁদের সে-ভাবে চলছে। প্রীতির বাবা প্রীতির দুঃখ ভুলতে পারেননি। আমাকে দেখলেই তাঁর প্রীতির কথা মনে পড়ে যায়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। দুর্ভিক্ষের সময় মেয়েদের কাজ দেখতেন আর ভাবতেন, প্রীতি থাকলে এর চেয়ে বেশি কাজ হতো।

দেশের লোকও প্রীতিকে ভোলেনি, প্রীতির আত্মদানকে ভোলেনি। তাই জগদ্বন্ধুবাবু যখন রাস্তা দিয়ে যান, অপরিচিতের কাছে তাঁকে সবাই পরিচয় করিয়ে দেয়, 'প্রথমে যে-মেয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল, উনি তারই বাবা।'

[সূত্র ঃ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা', জানুয়ারী ১৯৪৬, থেকে গৃহীত]

অগ্নিযুগের প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতিলতার নেতৃত্বে

ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ

কালীকিংকর দে

[কালীকিংকব দে,—১৯১০ সালে ৪ঠা মে চট্টগ্রাম শহবে গোসাঁইডাঙ্গায জন্ম, ১৯২৮সালে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। যুববিদ্রোহ ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ নেন। ডিনামাইট ষডযন্ত্রে খুব দাযিত্বশীল ভূমিকা ছিল। বাড়ীতে বিস্ফোবক প্রস্তুতেব গোপন কাবখানা ছিল। ১৯৩২ সালে ২৪ শে সেপ্টেম্বব প্রীতিলতাব সাথে পাহাডতলী ইউবোপীযান ক্লাব আক্রমণ কবেন। দীর্ঘদিন কাবাভোগ কবেন।]

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদাব অগ্নিযুগের প্রথম মহিলা শহীদ। আজ থেকে ৫৪ বৎসর আগে তিনি এক হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্য হাতে পটাশিযাম সায়ানাইড নিয়ে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করে গেছেন।

তখন আমাদের দেশ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে শৃঙ্খলিত। আমরা ছিলাম পরাধীন। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা আমাদের কঠোর হাতে শাসন করত। অস্বাভাবিক উপায়ে নির্যাতন ও অত্যাচার করত, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের উপর তারা অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাত। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের ন্যায় পরবর্তীকালেও সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর তারা মেশিনগানের গুলি চালিয়ে রাজপথ রাঙ্গিয়ে দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জনসাধারণকে শোষণ করা, ভারতের সম্পদ অপহরণ করা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের নামে নিজের দেশকে ধনশালী করা। এই শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরাই ছিল আমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু। তাই এই কুচক্রীদের বিরুদ্ধেই ছিল আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম।

১৯৩০ সালে আমাদের এই মুক্তি সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে দেখা দিয়েছিল। দল নির্বিশেষে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল — এই মুক্তি সংগ্রামে। আমাদের জাতীয় কংগ্রেস মনে করত অহিংস, অসহযোগ এবং শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের মত বিপ্লবীদের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা বিশ্বাস করতাম স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই বিপ্লবীরা তখন সারা বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল। এই বিপ্লবী আন্দোলনের এক অন্যতম সৃষ্টি হল বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলতা আজ প্রাতঃস্মরণীয়া।

প্রীতিলতা জন্মগ্রহণ করেন ১৯১১ সালে। তাঁর পিতা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ছিলেন চট্টগ্রাম পৌরসভার হেড ক্লার্ক। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রীতিলতার মায়ের নাম ছিল প্রতিভা ওয়াদ্দেদার। তাঁরা দুজনেই ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং শিক্ষানুরাগী। তাঁদের চারকন্যা—প্রীতিলতা, কনকলতা, শান্তিলতা, আশালতা এবং এক পুত্র — সন্তোষ। প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষা

লাভেব সুযোগ পেয়েছেন। প্রীতিলতাব শিক্ষানুবাগ ও স্বাদেশিকতার মনোভাব দেখে তাঁর বাবা এক সময়ে বলেছিলেন, ''আমার এই মেয়ে একদিন চট্টগ্রামের সরোজিনী নাইডু হবে।''

প্রীতিলতা ১৯২৭ সালে চট্টগ্রামের খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ কবেন এবং ঢাকায গিয়ে ইডেন কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবীদল শ্রীসঙেঘর নেত্রী লীলা রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবই কিছুদিন পরে ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে এসে চট্টগ্রাম জেলা মহিলা সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে প্রীতিলতার বন্ধু ও সহযোদ্ধা কল্পনা দত্তও কলকাতা থেকে এসে যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনের আয়োজন কবেছিলেন এবং পরিচালনা করেছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক মাষ্টাবদা সূর্য সেন এবং তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীরা। এ কথা প্রীতি ও কল্পনা উভযেই জানতেন। তাই তারা উভয়ে মিলে মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলে যোগদান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হয়ে সেদিন দুজনকেই ফিরে যেতে হয়েছিল। কাবণ তখনকার দিনে চট্টগ্রামের ওই বিপ্লবীদলে মহিলাদের সভ্য করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯২৯ সালে প্রীতিলতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহিলাদের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করে আই. এ. পাশ করেন। পরে কলকাতায় গিয়ে বেথুন কলেজে বি. এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু বিপ্লবীদলে যোগ দিতে না পারায় তার মন ছিল ভীষণ ক্ষুব্ধ। তিনি সদা সর্বদা ঐ বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার কথাই চিন্তা করতেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত ১০টায় ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী নেতৃত্ব সামরিক অভিযানের মাধ্যমে জেলার সকল অস্ত্রাগারগুলি দখল করে মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভারতের প্রথম স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করেন এবং জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য দেশের নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, সকল দেশপ্রেমিককে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদানের জন্য আহবান জানান। এই ঘোষণাটি কোন কোন জাতীয় সংবাদপত্রেও 'ধন্য চট্টগ্রাম' এই শিরোনামায় পরিবেশিত হয়েছিল।

এরপর ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে মাত্র ৫৬ জন বিপ্লবী সৈনিক ব্রিটিশ ফৌজের প্রায় ৫০০ জন দুর্ধর্ষ সৈনিককে হঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে শুরু হয় গেরিলা যুদ্ধ। ফেণীসংঘর্ষ, অমরেন্দ্র নন্দীর আত্মাহুতি, কালার পুলের খণ্ড যুদ্ধ, চন্দননগরের লড়াই, ঢাকার লোম্যান হত্যা, চাঁদপুরের তারিণী মুখার্জী হত্যা ইত্যাদি বীরোচিত বিপ্লবী কার্যসমূহ দেশের যুবক যুবতীদের দেশপ্রেমকে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তও গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন।

এই সময় চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় ছাত্রকর্মী মনোরঞ্জন রায় (ক্যাবলা রায়) কলকাতায় থাকতেন। তার উপর ভার পড়েছিল নানা রকমের এ্যাসিড, বহুল

পরিমাণে জোগাড় করে চট্টগ্রামে পাঠাবার। কিন্তু তখনকার দিনে পুরুষ যাত্রীদের উপর গোয়েন্দা বিভগের নজর ছিল খুব কড়া। তাই এই কাজের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কিছু সাহসী বিপ্লবী মেয়েব। কারণ তখনও গোয়েন্দা বিভাগ মেয়েদের তেমন সন্দেহ করত না। এই সময়ে ঘটনাচক্রে মনোরঞ্জন রায়ের সংগে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তের যোগাযোগ হয়ে গেল। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মনোরঞ্জনবাবু বুঝলেন যে এই মেয়ে দুটিই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবী কাজ করতে সক্ষম হবে। তাই তিনি মাষ্টারদার অনুমতি নিয়ে এঁদের দিযে প্রয়োজনীয় কাজ করতে আরম্ভ করলেন। কলকাতা চট্টগ্রামের যোগযোগও এবার অনেকটা সহজ হয়ে গেল।

এই সময়েই মনোরঞ্জনবাবু একদিন প্রীতিলতাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী বিনয়-বাদল-এর সাথী দীনেশ গুপ্তের গুনু পিসীমার সংগে। এই পিসীমা দল নির্বিশেষে বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। গুনু পিসীমার উপদেশ অনুযায়ী প্রীতিলতা বোন পরিচয় দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে চট্টগ্রামের 'বিপ্লবী',-মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত দেখা করার অনুমতি চাইলেন সৌভাগ্যের কথা তিনি অনুমতি পেয়েও গেলেন। ১৯৩১ সালে ৪ঠা আগষ্ট রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ফাঁসির পূর্ব পর্যন্ত প্রীতিলতা প্রায় চল্লিশবার দেখা করেন। এই সাক্ষাতকার প্রীতিলতার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাস্তবপক্ষে এই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই ফাঁসির আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের কাছেই তাঁর বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা হয়। সাক্ষাতকারের সময় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রীতিকে বলেছিলেন —"যতশীঘ্র পার মৃত্যুপণ নিয়ে একটি কাজে নেমে যেও।" উত্তরে প্রীতিলতা বলেছিলেন — "আমি আজই আপনার সামনে শপথ করে বলছি কাজ করতে গিয়ে আমি কাজের জায়গাতেই আত্মবিসর্জন দেব।" প্রীতিলতাকে শেষ পর্যন্ত এই সংকল্প থেকে কেউ-ই বিচ্যুত করতে পারেননি।

ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন, ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে কধুরখীল গ্রামে সুবোধ চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়ে মাষ্টারদা ও নির্মলদার সংগে কল্পনা দত্ত গোপনে দেখা করেন। এই সাক্ষাতের সময় কল্পনা দত্ত প্রীতিলতা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর তাদের জানান। এই সময়ে ঐ গ্রামে দ্বারিকানাথের আশ্রয়ে মাষ্টারদা-নির্মলদার সংগে তারকেশ্বর দস্তিদার, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী এবং আমি শ্রীকালীকিংকর দেও ছিলাম। সাক্ষাতকারের পর দ্বারিকানাথের আশ্রয়ে ফিরে এই দিনই সর্বপ্রথম মাষ্টারদা ও নির্মলদা সবাইকে জানালেন যে, তাঁরা কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতাকে দলের সভ্যা হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন এবং তাদের আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে দুজনেই যেন একসংগে আবার চট্টগ্রামে আসে এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে যায়।

১৯৩১ সালে প্রীতিলতা বেথুন কলেজ থেকে সম্মানের সংগে বি.এ. পাশ করেন এবং ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামে ফিরে নন্দনকানন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার

পদ গ্রহণ করেন। ঐ সালেই জুন মাসে কল্পনা দত্তও কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে আসেন, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাষ্টারদা লোক পাঠিয়ে ১২ই জুন রাত্রে প্রীতি ও কল্পনা দুজনকেই ডেকে নিয়ে গেলেন ধলঘাট গ্রামের সাবিত্রী মাসিমার বাড়ীতে। ঐ বাড়ীর গোপন নাম ছিল 'আশ্রম'। তখন এই আশ্রমে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন মাষ্টারদা, নির্মলদা এবং তরুণ বিপ্লবী ভোলা বা অপুর্ব সেন। পরের দিনই কল্পনা দত্তকে কলকাতা ফিরতে হবে তাই রাত্রে তাকে শহরে ফিরে যেতে হল। প্রীতিলতা আলোচনার জন্য আশ্রমেই থেকে গেলেন একদিনের জন্য। ১৩ই জুন মাষ্টারদা ও নির্মলদার সংগে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়। রাত্রি ১০টার পরেই আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা আশ্রম ছেড়ে বাইরে আসেন। আর এটাই নিয়ম, সেই নিয়মানুযায়ী এই দিনও আশ্রম থেকে বার হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সকলে। রাত দশটায়। এমন সময় দেখা গেল একদল ব্রিটিশ ফৌজ এবং সশস্ত্র পুলিশ ঐ বাড়ীটি ঘিরে ফেলেছে। ঐ ব্যূহ ভেদ করে বাইরে আসার কোন উপায় নেই। বিপ্লবীরা ধরা দিতে চান না। শুরু হল তুমুল লড়াই। নির্মলদার গুলিতে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের ক্যাপ্টেন ক্যামারুণের মৃতদেহ গাঁট ছেড়া সুতার গুলির মত সিঁড়ি বেয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ে গেল। এবার শুরু হল মেশিনগানের সাথে লড়াই। প্রাণ দিলেন বিপ্লবী নেতা নির্মলদা এবং তরুণ বিপ্লবী অপূর্ব সেন। মাষ্টারদা সে সুযোগে প্রীতিকে সংগে নিয়ে ফৌজী অবরোধে ভেদ করে জৈষ্টপুরা গ্রামের কুটীরে আশ্রয়ে গিয়ে উঠলেন। তখন সেই আশ্রয়ে পলাতক অবস্থায় ছিলেন সুশীল দে, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী এবং আমি-কালীকিংকর দে। মাষ্টারদার মুখে সকলেই শুনলেন সদ্য অনুষ্ঠিত সশস্ত্র সংগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা। মাষ্টারদার নতুন চিন্তা প্রীতিলতার নিরাপত্তা। তাই সেদিনই শহরে লোক পাঠিয়ে জেনে নিলেন প্রীতির বাড়ী নিরাপদ আছে কিনা। খবর পাওয়া গেল নিরাপদ আছে। প্রীতিলতা কিন্তু বাড়ী ফিরে যেতে কোনরকমেই রাজী হচ্ছিলেন না। মাষ্টারদার কথায় শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। ১৩ তারিখ দিনের আলোচনা এবং রাত্রের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়ার বিরাট অভিজ্ঞতা নিয়ে পরের দিন প্রীতিলতা বাড়ী ফিরে গেলেন। পুলিশের দৃষ্টি পড়েনি বলে শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগ দিতেও তাঁর অসুবিধা হয়নি।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে খবর পাওয়া গেল, চট্টগ্রামের সকল উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা প্রায়ই সমবেত হয় পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে মদ্য পান করে, নৃত্য গীতে মেতে উঠে, আবার কখনও গোপন আলোচনায় বসে বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার ষড়যন্ত্র করে। এই পাহাড় ঘেরা ক্লাবটির চর্তুদিকে সব সময়ের জন্য কঠোর এবং অতি সতর্ক প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছিল। একমাত্র শ্বেতাঙ্গরা ব্যতীত এবং ক্লাবের কর্মচারী, বয়-বেয়ারা, দারোয়ান ছাড়া দেশীয় কোন মানুষের পক্ষে ঐ ক্লাবের সীমানার কাছাকাছি যাওয়ারও সাধ্য ছিল না । কিন্তু বিপ্লবী পরিকল্পনার কাছে সাম্রাজ্যবাদের সকল সতর্কতা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সময়ে বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করলেন জুলাই মাসের কোন এক দিনে ঐ ক্লাবটি

আক্রমণ করে ধ্বংস করা হবে। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের অভিজ্ঞ বিপ্লবী কর্মী শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সাতজনের একটি বিপ্লবী দল আক্রমণ করতে গিয়েও বিশেষ কতকগুলি গুরুতর কারণে ক্লাব আক্রমণ না করে ফিরে আসতে বাধ্য হল। শৈলেশ্বরদার প্রতিজ্ঞা ছিল ক্লাব আক্রমণের কাজ শেষ হওয়ার পরে নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরার যদি সুযোগও পান তিনি ফিরবেন না। সেখানেই আত্মবিসর্জন দেবেন। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে সেই ভোর রাত্রেই শৈলেশ্বরদা মাষ্টারদাকে এক টুকরো কাগজে লিখলেন, 'Days are dull, life is growing more and more anomalous day by day, mind is absolutely vague and vacant: আরও লিখেছিলেন — 'মায়ের ডাক শুনেছিলাম, সে ডাকে সাড়াও দিয়েছিলাম কিন্তু আত্ম বলিদানে ব্যর্থ হলাম।' এইটুকু লিখেই তিনি মারাত্মক বিষ পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ফেললেন। বেশ কিছুক্ষণ কষ্টের সঙ্গে নাক ডাকার শব্দ হল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তাঁর শরীর পাথর হয়ে গেল, গভীর রাত্রে সমুদ্র সৈকতে তাঁর শবদেহ বীরোচিত মর্যাদায় সমাহিত করা হল।

ইতিমধ্যে ধলঘাট যুদ্ধে প্রীতিলতার উপস্থিতি সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরেছে বুঝে মাষ্টারদা প্রীতিকে আত্মগোপন করার নির্দেশ দিলেন। মাষ্টারদা ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এবার মহিলা বিপ্লবীদের দিয়ে নূতন উদাহরণের সৃষ্টি করবেন এই উদ্দেশ্যে মাষ্টারদা স্থির করলেন এই আক্রমণের নেতৃত্বের ভার থাকবে প্রীতিলতার উপর। প্রীতিলতার সঙ্গে থাকবেন আরও দুইজন মহিলা বিপ্লবী কল্পনা দত্ত ও প্রেমলতা এবং পাঁচজন পূর্ব নিবাচিত বিপ্লবী যুবক। দুঃখের বিষয় এবারের আক্রমণও পরিত্যক্ত হল কারণ নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন পূর্বে ১৭ই সেপ্টেম্বর কল্পনা দত্ত পুরুস বেশে ধরা পড়ে গেলেন ক্লাবের কাছাকাছি একটি জায়গায়।

এবার মাষ্টারদা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ২৪শে সেপ্টেম্বর ক্লাব আক্রমণ করতেই হবে বলে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। এবারের আক্রমণের নেতৃত্বের ভারও পড়ল প্রীতির উপর। কিন্তু পুরুষবেশে কল্পনা দত্ত ক্লাবের কাছাকাছি জায়গায় দুইজন যুবক বন্ধু সহ ধরা পড়ে যাওয়াতে প্রীতি ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে এইবারের ক্লাব আক্রমণে পাঠাবেন না স্থির করেছিলেন। এইবার প্রীতিলতার সংগে গেলেন মাষ্টারদার নির্বাচিত 'আরও সাতজন অভিজ্ঞ বিপ্লবী। নির্দিষ্ট দিনে ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত দশটায় ক্লাবের ভিতর থেকে যোগেশ মজুমদার ওরফে 'জয়দ্রথ' নামে একজন গোপন বিপ্লবীকর্মী সময় 'উপযুক্ত' এই সংকেত দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে তিন দিক থেকে ক্লাব আক্রমণ শুরু হল, ক্লাব থেকে কিছু দূরে সুবিধামত নিরাপদ জায়গায় ইস্তাহার বিতরণ করার কর্মীরাও অপেক্ষা করছিলেন। শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ছুটে গেলেন শহরে চার রকমের ইস্তাহার বিলি করতে। প্রথমটিতে ছিল সকল দেশপ্রেমিককে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান। দ্বিতীয়টিতে ছিল; চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর অকথ্য

অত্যাচারের ধিক্কার এবং হিজলী বন্দী নিবাসে নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যার প্রতিবাদ। তৃতীয়টিতে ছিল; অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ধরে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা। চতুর্থটিতে ছিল; প্রীতিলতার ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি।

সেদিন প্রীতিলতার নেতৃত্বে ক্লাব আক্রমণ পরিপূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করেছিল। বিপ্লবী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে বিপ্লব বিরোধী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র চুরমার হয়ে গেল। বোমা ও গুলির আঘাতে বহু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ হতাহত হল। আহতদের আর্তনাদে ঐ অঞ্চল সে সময়ে কেঁপে উঠেছিল। অকস্মাৎ একজন মিলিটারী অফিসারের গুলিতে সামান্য আহত হয়েছিলেন।

প্রীতিলতা নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন করার পর প্রত্যেকটি সহকর্মীকে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য এগিয়ে দিতে নিজেও এগিয়ে এসেছিলেন প্রায় পাঁচশত গজ রাস্তা। শেষমুহূর্তে তিনি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাশের সাথীর হাতে নিজের আগ্নেয় অস্ত্রটি দিয়ে বললেন, কালীদা আপনার সায়ানাইডটুকু আমাকে দিন, আমার টুকু আমি খেয়েছি। এ বলেই লুটিয়ে পড়লেন। সাথী বন্ধুটি তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করে ছিলেন নিজের সায়ানাইড টুকু প্রীতির মুখে দিয়ে। পরে সকলে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে চলে যায়। ফিরলেন না একমাত্র প্রীতিলতা। প্রীতিলতার আত্মদান আমাদের স্বাধীনতার দিনকে ত্বরান্বিত করেছে। আজ আমরা ব্রিটিশ শৃঙ্খল মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু শোষণ মুক্ত নই।

ব্রিটিশ হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনই প্রীতির কাজের শেষ নয়। যত দিন না ভারতের জনগণ শোষণ মুক্ত হবে তত দিন প্রীতিলতার আদর্শ জনগণের মনে শোষণ মুক্তির সংগ্রামে প্রেরণা জোগাবে। প্রীতিলতার স্মৃতি অমর হউক, অক্ষয় হউক।

প্রীতিলতা — মৃত্যুপথের স্বেচ্ছারোহী

শান্তি সেন

[শান্তি সেন, মাষ্টারদা ও অন্যান্য আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সংগে নানা সাংগঠনিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার হয়ে বক্সাবন্দী শিবিরে ও অন্যান্য জেলে বহু বৎসর আটক ছিলেন।]

তাঁর পুরো নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯৩২ এর ২৪শে সেপ্টেম্বর তাঁর যে মরণ তা হল জেনে শুনে মরণের মুখে ঝাঁপ, আগে থেকে ঠিক করা বিপ্লবী কাজের এক মর্মান্তিক পরিণাম।

প্রীতিলতার জন্ম চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। ছাত্রী হিসেবে ওঁর একেবারে ঝলমলে সব রেকর্ড। ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগ; আই.এ.তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের মধ্যে পয়লা জায়গা। ঢাকাতেই রাজনীতিতে তাঁর হাতে খড়ি। বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগ (রায়) তাঁকে দীপালি সংঘের সভ্যা করেন। এরপর প্রীতিলতা কলকাতায় এসে বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন।

সবে কৈশোর পার হয়েছে এমন সময়ে প্রীতিলতা একজন সাচ্চা বিপ্লবী হিসেবে ফুটে উঠেছে, আর মাষ্টারদা সূর্য সেনের পরিচালনায় ১৯৩০-র ১৮ই এপ্রিল যে বিদ্রোহ হয় তার আসল কথা মর্মে শোষণ করে নিয়েছে মহিলার স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্ম ও বিকশিত অনুভব দিয়ে। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ঘটনাগুলি নাটকীয় পরম্পরায় অতি দ্রুত প্রীতিলতার অনুভবী মনে রেখাপাত করে। বিদ্রোহের মাত্র চারদিন পরেই ২২শে এপ্রিল বারজন তরুণ বিদ্রোহী জালালাবাদের খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ দেয়; এর মাত্র এক দিন আগে অমরেন্দ্র নিজেকে পুলিশের হাতে সঁপে দেবার প্রস্তাবকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে সামনাসামনি যুদ্ধে গুলি বিনিময় করে প্রাণ দিল; ৬ই জুন রজত, স্বদেশ, মনোরঞ্জন ও দেবু প্রাণ দিল কালারপোল যুদ্ধে — বুড়ী বালামের তীরে বাঘা যতীনদের কীর্তিকে নতুন করে তুলে ধরে; ২রা সেপ্টেম্বর মাখন ঘোষাল চন্দননগরে পুলিশের সংগে গুলি বিনিময় করে প্রাণ দিল। তারপর এল ১৯৩১। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তখন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ফাঁসীর দড়ি কখন গলায় দেবে এজন্য দিন গুনছিল। রামকৃষ্ণের মুক্তির জন্য প্রীতিলতা উঠে পড়ে লাগল, আইরিশ জেল অধ্যক্ষের সহানুভূতির ফলে প্রায় বার চল্লিশ গিয়ে বোন সেজে সে রামকৃষ্ণের সংগে দেখা করে। এ সব দেখাসাক্ষাতের ফলে রামকৃষ্ণের মনের আগুনে প্রীতিলতার কল্পনাও আগুন হয়ে ওঠে, সে মন ঠিক করে ফেলে যে মাষ্টারদার মৃত্যুপথ যাত্রীদের মধ্যে সে একজন হবে। আলিপুরে তাঁর

চেষ্টায় কিছু হল না। ৪ঠা আগস্ট ১৯৩১ বামকৃষ্ণেব ফাঁসী হয়ে গেল। এ দারুণ অভিঘাত প্রীতিলতার কাছে বন্দুকেব গুলি অপেক্ষাও বেশী ভয়ংকর ও মর্মবেদনার কাবণ --- হয়। সবাব অলক্ষ্যে নীরবে এক নতুন প্রীতিলতা জন্ম নেয়। যাঁর পুরো সত্ত্বা বামকৃষ্ণেব পথের পথিক হবাব জন্য পা-পা করে এগোতে থাকে।

অন্তবে বিপ্লবের শিখা নিয়ে প্রীতিলতা এবপর কলকাতা থেকে আসে চট্টগ্রাম, পুলিশকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার কাজ নেয়।

যার টানে চট্টগ্রাম আসে প্রীতিলতা, তারই জন্য সে ১৯৩২-এর ১৩ই জুন ছুটে যায় ধলঘাট গ্রামে মাষ্টারদার গোপন আশ্রয়ে। আব হবি তো হও সে রাতেই মাষ্টারদার আশ্রয় গৃহে পুলিশ হানা দেয়। ফলে হয় খণ্ড যুদ্ধ। ফৌজী কাপ্তান কেমারণ নিহত হয়। মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা কিন্তু পুলিশের বেড়াজালের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এ যুদ্ধে প্রাণ হারায় মাষ্টাবদার ডান হাত নির্মল সেন ও তরুণ বিদ্রোহী ভোলা। গুলি লাগার পর নির্মল সেন শেযবারের মত প্রীতিলতার ডাক নাম 'রাণী রাণী' ডেকে চুপ হযে যান। প্রীতিলতা সে রাতে এ ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। ফলে বাণীব নির্মলদার মর্মভেদী তীব্র সে ডাক তাঁর অন্তরকে বেদনায় নিথর করে দেয় — স্মৃতিপথে বাব বার উদিত হয়ে তাঁকে নিশির ডাকের মত ডাকতে থাকে — এস আমার পথ ধরে এস। সে রাত্রিতে প্রীতিলতার অভিষেক হয় গুলিগোলার মধ্যে, এরই পরিণতি হল জীবন দিযে চরম দীক্ষালাভের মধ্যে।

শেযে এল সেই নিয়তির নির্দিষ্ট দিন ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২। রাত তখন দশটা হবে। মাষ্টারদা যথারীতি স্বয়ং এসে বিপ্লবী কর্মস্থলে হাজির। সব নিখুঁত আছে জেনে নিয়ে তিনি প্রীতিলতাকে ডেকে বললেন, "যাও বোন, পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বের ভার তোমার ওপর, তুমি এগিয়ে যাও। বোমার আঘাতে উড়িয়ে দাও ইংরেজদের প্রমোদভবন। ভারতে বৃটিশ শাসকদের প্রতি এ হবে ভারত ছাড়াব নোটিশ।"

সেদিন প্রীতিলতার পরণে ছিল পুরুষদের মত করে মালকোচা দিয়া পরা ধুতি, মাথায় ছিল গৈরিক পাগড়ি, গায়ে ছিল লাল ব্যাজ লাগানো সার্ট। ঋজু দোহারা মেয়েটির চোয়াল তখন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, চোখ দুটিতে তাঁর সংকল্পের ছাপ। তাঁকে তখন শান্ত সাহস ও নিবেদনের প্রতিমার মত দেখাচ্ছিল। আরও সাতজন লুঙ্গি পরা বিপ্লবী ভাই তাঁর সাথী হয়। তাঁদের সকলের পায়ে ছিল রবার সোলের কাপড়ের জুতা।

চট্টগ্রাম শহরের সামান্য দূরে উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়গুলির কোলে ছিল পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব। ক্লাব থেকে রেলের বড় কারখানা দেখা যায়। এরপরেই একটি চওড়া রাস্তা তার পরেই গ্রাম, আরও কিছুটা গেলে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের জল দিগন্ত পর্যন্ত ঝিলমিল করছে। পূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে আছে হকিন্স ক্লাব। সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রাগার ও পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় কয়েকটি সাহেব বাড়ী। সমস্ত এলাকাকে চক্কর দিয়ে

বেড়াত এক পুলিশ বাহিনী। চক্কর পুরা করতে লাগত ২০ মিনিট সময়। টহলদারী পুলিশ চলে যাবার পরই — চক্করের পরিসীমা অতিক্রম করে প্রীতিলতার বিপ্লবী বাহিনী। এতে ২০ মিনিট সময়ের এক নিরাপদ সেতু তাঁরা পেয়ে যায়। ঝটিকা বাহিনীর নবম সেনানী ছিল যোগেশ মজুমদার। উনি ছিলেন ক্লাবের কর্মচারী। এঁরই বাড়ী থেকে প্রীতিলতা ও তাঁর সাথীরা চরম আক্রমণের জন্য রওনা হয়; যোগেশই ক্লাবঘর থেকে সংকেত দেয় আক্রমণের। এর আগে ১৯৩২ এর ২০শে আগষ্ট শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী ভাই ক্লাব আক্রমণে এসে পরিসীমা পার হতে ব্যর্থ হয়। হতাশ শৈলেশ্বর আত্মহনন করে ব্যর্থতার জ্বালা ভোলে। কিন্তু এবার আর ফেরা নয়। প্রীতিলতা ও বিপ্লবী ভাইয়েরা এবার পরিসীমার গুরুত্বপূর্ণ স্থান পার হয়ে ক্ষিপ্রতার সংগে ক্লাবের মাঠ ডিঙ্গিয়ে ক্লাবঘরে গিয়ে ওঠে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া স্প্রিং-এর মত।

ক্লাব গৃহের মধ্যে ছিল একটি বড়সড় নাচেব হলঘর আর একটি বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। হলঘরটিতে পিয়ানো, সেক্সোফোন ও ড্রামের মিলিত আনন্দ সংগীত চলছে। জনৈক শ্বেতাঙ্গ হুইস্কির গেলাস নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ঘরময় ঘুরে চলেছে। চারপাঁচ জোড়া শ্বেতাঙ্গ নারী পুরুষ অন্যমনস্কভাবে নেচে চলেছে। মদ্যপানের জন্য উঁচু টুলে বসা কয়েকজন সাহেব বোধ হয় টহলদারী ফৌজের বুটপরা পায়ের আওয়াজ শোনবার চেষ্টা করছিল। বিপ্লবীর সাথী যোগেশ তখন অভ্যর্থনা অঙ্গণে বসেছিল।

পুলিশ ও টহলদারী পাহারার আড়ালে কার্ফু আদেশের সুরক্ষায় যখন সাহেবরা নাচে গানে মশগুল হঠাৎ তখন উচ্চ বিস্ফোরক পিকরিক এ্যাসিডে পূর্ণ একটি বোমা বজ্রের মত ভয়ংকর শব্দে হলঘরে ফেটে পড়ল। প্রীতিলতা, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অভিজ্ঞ অংশীদার কালি দে ও শান্তি চক্রবর্তী ওয়েবলি রিভলবার, বোমা ও তরবারি নিয়ে হলঘরের সামনে দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বীরেশ্বর রায়ের হাতে ছিল ৯ ঘড়া পিস্তল আর প্রফুল্ল দাশ ও পান্না সেনের হাতে ছিল রাইফেল ও হাতবোমা। এঁরা বিলিয়ার্ড ঘর অবরোধ করে দাঁড়ায়। ওয়েবলি রিভলবার নিয়ে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের এক বীর মহেন্দ্র চৌধুরী এবং সুশীল দে আর একটি দরজার মুখে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। অদম্য যোগেশ ঘরের ভেতর থেকেই তার শক্ত বাহু দিয়ে সাহেবদের মাথায় মুগুরের মত আঘাত করতে থাকে।

এইভাবে প্রীতিলতা ও তাঁর পরিচালিত বিপ্লবী ভাইয়েরা ইউরোপীয়ান ক্লাবকে শ্মশানে পরিণত করে কয়েক মুহূর্ত সময়ে। সুরায় মত্ত সাহেব মেমদের নাচের আসর ২৪শে সেপ্টেম্বরের রাতে বোমা্র বিস্ফোরণে,গুলির শব্দে তরবারির আঘাতে ও সাহেব মেমদের বীভৎস মরণ চীৎকারে দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়। এর মধ্যে বিজলীর তার ছিঁড়ে যায়, ঘন অন্ধকারে পালাবার চেষ্টা করে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বেয়নেট ও তরবারির মুখোমুখি হয়। এবার বৃটিশ প্রতিনিধিদের ভারতে তাদের সীমাহীন পাপ কাজের পুরো বেতন দেওয়া হল। এদের আর্তনাদ চট্টগ্রামের রাতের আকাশকে দীর্ণ করে, পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তোলে এবং শেষে নৈশ বাতাসে ধীরে

ধীরে সমুদ্রের দিকে মিলিয়ে যায়। কমাণ্ডোরা ক্লাব ঘর ছেড়ে যাবার আগে তিনটি-বিলম্বে ফাটে এরকম-বোমা রেখে যায়। একই সময়ে প্রায় তালে তালে ইস্তাহার বিলির জন্য নির্দিষ্ট কর্মীরা অর্থাৎ দীনেশ চক্রবর্তী, শান্তি সেন, পঙ্কজ চৌধুরী এবং নরেন দাশ সারা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে ইস্তাহার সেঁটে দেয়। কোতোয়ালী থানার গায়ে একটা বাড়ী থেকে এঁরা বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজের সংগে সংগে ইস্তাহার লাগাবার কাজে বেরিয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার কার্ফু আদেশ তখন জারি ছিল এবং কোন লোককে কার্ফুর সময়ে দেখামাত্র গুলি করার আদেশ ছিল।

এভাবে বিপ্লবী আঘাত হানার পর সব বিপ্লবী বীরেরা ফিরে আসে। শুধু একজন আসেনি। আর উনি হলেন সেদিনের দল-নেত্রী প্রীতিলতা। ক্লাব প্রাঙ্গণেই তিনি মৃত্যুরকোলে ঢলে পড়ার আগে বল্লেন আপনারা ফিরে যান। আমি বিষ খেয়েছি, চললাম যেখানে আছে শহীদ নির্মলদা, ভোলা, রামকৃষ্ণদা ও আর সবাই-বিদায়।" মাষ্টারদার কাছে বাকী ৭ জন ফিরে গেলেন। সব শুনে মহানায়কের চোখের পাতা দ্রুত ওঠানামা করে। চোখের জল কেউ যাতে না দেখে তিনি চেষ্টা করলেন।

পরের দিন সকালে পুলিশ ক্লাব প্রাঙ্গণের অদূরে দেখতে পায় প্রীতিলতার মৃতদেহ। প্রীতিলতা আজ শহীদ প্রীতিলতা, অগ্নিযুগের প্রথম বিপ্লবী নারী শহীদ।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ

(২৪ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)

বীরেশ্বর রায়

(বীরেশ্বব বায় প্রীতিলতাব নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে সক্রিয় অংশগ্রহণ কবেন। পুলিশ একথা কিছুতেই জানতে পারে নি। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়াবী মাসে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে প্রায় ৫ বৎসর বন্দী ছিলেন)।

চট্টগ্রামে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার কর্মসূচী, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দিন ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল সফল হয় নি। মাষ্টারদা সূর্য সেন একথা ভোলেন নি, তাই গুপ্ত শিবির থেকে তিনি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য আবার তৎপর হন।

চট্টগ্রামে ইউরোপীয়দের তখন দুটি ক্লাব। একটি পল্টন ময়দানে। এ অঞ্চলে কড়া সামরিক ও পুলিশ পাহারা চব্বিশ ঘন্টা মোতায়েন থাকত। অপর ক্লাবটি হল পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব। শহরের উত্তরদিকে পাহাড়তলী ষ্টেশনের কাছে এই ক্লাব। এখানেও প্রায় সমান পুলিশী সতর্কতা। ক্লাবটিতে প্রধানত রেলের সাহেবরা আসত, অন্যান্য সাহেবরাও নিরাপদ ভেবে এই ক্লাবেই অবসর বিনোদনের জন্য নাচ গান পান ভোজন কোরত। শাসকশ্রেণীর বাঘা বাঘা শ্বেতাঙ্গরাও তখন আভিজাত্যের কথা ভুলে পাহাড়তলী ক্লাবে মাঝে মাঝে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এক গেলাসের ইয়ার বনে যেত। এ সময়ে তাই পাহাড়তলী ক্লাবের মান পল্টন ক্লাবের থেকে কম ছিল না।

পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ বিষয়ে শ্রীদীনেশ দাশগুপ্তের কাছ থেকে, এর পরে অন্য সূত্রেও খবর যোগাড় হয়। ক্লাবের অবস্থান, সভ্যদের গতিবিধি, পাহারা বদলি, রাস্তাঘাট, আক্রমণের আগে ও পরের আশ্রয়স্থল — এ সব বিষয়ে নানা সূত্রে খবর নিতে হয় ও ব্যবস্থা করতে হয়।

হঠাৎ খবর এল ১৯৩২ এর ১০ই আগষ্ট একটা বড় অনুষ্ঠান ক্লাবে হবে। খবর পেয়ে মাষ্টারদা ঐদিন শৈলেশ্বর চক্রবর্তীকে নেতা করে বিপ্লবী দলকে ক্লাব আক্রমণের নির্দেশ দেন। পড়ৈকোড়া গ্রামের রমণী চক্রবর্তীর বাড়ী তখন দলের গুপ্ত শিবির, নাম 'কুন্তলা'। 'কুন্তলা' শিবিরে মাষ্টারদা ও প্রীতিলতাকে রেখে তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা), কালীকিঙ্কর দে ও শৈলেশ্বর চক্রবর্তী পাহাড়তলী ক্লাবের নিকটে কাট্টলি গ্রামে চলে আসে। কাট্টলি গ্রামের শিবির থেকে আক্রমণে অংশ গ্রহণ করার জন্য যারা রওনা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল শৈলেশ্বর চক্রবর্তী (নেতা), কালীকিঙ্কর দে, মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী ও বীরেশ্বর রায় (লেখক)। ফুটুদা বোমা, রিভলবার, রাইফেল ও তরবারিতে সজ্জিত বিপ্লবী ভাইদের যাত্রা করিয়ে দিলেন।

পাহাড়তলী ক্লাবের অতি কাছে পাহাড়ের উঁচু ঢালে জঙ্গলের আড়ালে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করছে। নীচ থেকে সবুজ সংকেত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই একসঙ্গে আক্রমণ শুরু কোরবে। কিন্তু সে রাত্রি সাড়ে নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোন সংকেত পাওয়া গেল না। ব্যর্থ মনোবথ হয়ে, সবাইকে ফিরে যেতে হল। এই ব্যর্থতার আঘাত সহ্য করতে না পেরে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ক্ষোভে আত্মবিলোপ করেন।

কয়েকদিনের মধ্যে খবর এল পাহাড়তলী ক্লাবে আবার জমজমাট জলসা বসবে। ২৪শে সেপ্টেম্বর। যুদ্ধ জাহাজের বড় বড় সাহেব সুবো জড়ো হবে। জেলা শাসক A. S. Hands, বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত থাকবে। খবর পেয়ে এবার মাষ্টারদা স্বয়ং আক্রমণের জায়গার কাছাকাছি কাট্টলি গ্রামে ফুটুদা ও প্রীতিলতাকে নিয়ে হাজির। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা হল, ঠিক হল আক্রমণ কারীদের পরনে লুঙ্গি ও সার্ট থাকবে। এ হল চাঁটগায়ের সাধারণ মুসলমানের পোশাক। এবারের আক্রমণের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলতার পরণে ছিল মালকোঁচা করে পরা ধুতি, মাথায় পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ী, বুকে একটি সুদৃশ্য লাল রঙের নিশান বা ব্যাজ। সকলের পকেটে এক একটি নিজস্ব জবানবন্দী ও ইস্তাহার ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় প্রীতিলতার জবানবন্দীটি তাঁর মৃতদেহ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে।

২৪শে সেপ্টেম্বর আবার ক্লাব আক্রমণের জন্য যাত্রার দিন। এবারে নেত্রী প্রীতিলতা। সে দিন সকালে আক্রমণে যারা যাবে তারা সবাই মিলে মাষ্টারদা ও ফুটুদাকে ঘিরে বসল, মাষ্টারদা তখনম ধীরভাবে জানালেন যে সেদিনের অভিযানের নেত্রী হবেন প্রীতিলতা। প্রীতিদি ভাইদের যোগ্যতার কথা ভেবে আপত্তি তুললে বাকী সবাই একবাক্যে প্রীতিলতাকেই আক্রমণকারী দলের নেত্রী হিসাবে মেনে নিলেন।

এবারের আক্রমণের ছক মাষ্টারদা বুঝিয়ে দিলেন, বিলিয়ার্ড হলের দিকে থাকবে ঠিক হল বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস ও পান্না সেন। ক্লাব বাড়ির হলঘর আক্রমণে থাকবে প্রীতিলতা স্বয়ং আর সঙ্গে থাকবে কালীকিঙ্কর দে ও শান্তি চক্রবর্তী। আর সামনের দিকে যে দরজা ও জানালা সেগুলি আগলে থাকবে সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী। আক্রমণকারীর সংখ্যা এবার বেড়ে হয়েছে আটজন। অস্ত্রশস্ত্রও অনুরূপ। সুশীল ও মহেন্দ্রর সাথে ছিল রাইফেল ও হাত বোমা। প্রীতিলতা ও কালীর সঙ্গে ছিল রিভলবার ও হাত বোমা। শান্তির সঙ্গে ছিল তরবারি ও বোমা। পান্না সেন, প্রফুল্ল ও বীরেশ্বরের কাছেও রাইফেল হাতবোমা ও পিস্তল ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু গাঢ় হলেই বিপ্লবীদল সামরিক কায়দায় মাষ্টারদা ও ফুটুদাকে অভিবাদন জানিয়ে মৃত্যুপণ আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। আর মাষ্টারদা ও ফুটুদাও জলপথে তারিণী মাঝির সাম্পানে বটতলীর আশ্রয়ের দিকে যাত্রা করলেন।

আবার সেই পাহাড়ের গোড়ায় সংকেতের জন্য প্রতীক্ষা চলল। ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত তখন সাড়ে নটা হবে, ক্লাবঘর থেকে বিপ্লবী বন্ধু আক্রমণের নিশানা দেখাল। নেত্রী প্রীতিলতা নির্দেশ দিল আক্রমণের। বিপ্লবী ভাইরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্লাব

গৃহের উপর। ঘন ঘন গুলি ও বোমার আওয়াজে চত্বরটি কেঁপে উঠল। স্বভাবতই ক্লাবঘরের সব বাতি নিভে গেল তার কেটে গিয়ে। নেমে এল অন্ধকার। তার মধ্যে সাহেবদের ভয়ার্ত চিৎকার, ইতস্তত ছোটাছুটি। বিপ্লবীরা এবার টাইম বোমাতে লোশান দিয়ে সেগুলি ঘরে ঘরে রেখেছিল। আর পলায়নরত সাহেবদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার বিরাম ছিল না। সাহেবদের নাচের আসরকে, গানের জলসাকে শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে বিপ্লবীরা ফিরে এসেছিল। ফেরেনি শুধু একজন সেদিনকার দুঃসাহসী অভিযানের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলতার দেহ ক্লাবগেটের বাইরে পড়ে রইল, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ করেছিলেন। বাকী বিপ্লবী ভাই-এরা অগ্নিযুগের প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতাকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে প্রীতিলতা অন্যান্য বন্ধুদের দ্রুত চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে যান। এদিকে পূর্বের ব্যবস্থামত দীনেশ চক্রবর্তী ক্লাবঘরের নিকট অপেক্ষা করছিল। প্রথম বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই সে সাইকেলে পাথরঘাটায় যায়। সেখানে শান্তি সেন, সরোজ চৌধুরী, সুশীল দাস, নরেন দাস অপেক্ষায় ছিল। দীনেশ চক্রবর্তীর মুখে খবর শোনার পর এরা মাষ্টারদার নির্দেশমত শহরের পাড়ায় পাড়ায় তিন রকমের ইস্তাহার বিলি করে। শহরের সর্বত্র এভাবে ক্লাব আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভূত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ইস্তাহার প্রাচীরে প্রাচীরে লাগানো হয়। সান্ধ্য আইন ও পুলিশ টহলের মধ্যে পোষ্টার লাগানোতেও সেদিন জীবন দেওয়া নেওয়ার ঝুঁকি ছিল।

প্রীতিলতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলে দ্রুতবেগে রেল লাইন পার হয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়ে। ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ীর হেডলাইট পড়লে বিপ্লবীরা সবাই মাটিতে বসে প'ড়ে নিজেদের আড়াল রাখে। তারপর শান্তি ও প্রফুল্লের হেপাজতে রাইফেলগুলি জমা দিয়ে, রিভলবার ও পিস্তল সঙ্গে রেখে মাষ্টারদার শিবিরের উদ্দেশ্যে বন্দর বা বটতলী গ্রামের দিকে বিপ্লবীরা অগ্রসর হন এবং গিয়ে মাষ্টারদাকে এ্যাকশানের বিবরণ দেন। আক্রমণের সাফল্যে সবাই উল্লসিত হলেও প্রীতিদির আত্মাহুতিতে আনন্দের মধ্যেও বেদনার ছাপ পড়ে; এর ভেতর থেকেই খবর নিয়ে জানা গেল যে, সে রাতে [illegible]তরজন সাহেব ক্লাব ঘরেই খতম হয়েছিল আর আহতদের সংখ্যা ছিল এগার, তার [illegible]ধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। [illegible]ই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আহত ও নিহতদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে ইউরোপীয় এ্যাসোসিয়েশন রিলিফ ফাণ্ড খুলেছিল। সরকারও শাস্তিমূলক কর বসিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এ টাকাও রিলিফ তহবিলে জমা পড়ে।

এইভাবে পাহাড়তলীর ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের সার্থক পরিণতি ঘটে। জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ শাসকরা যে হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়, আক্রমণের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। নেতা শৈলেশ্বর চক্রবর্তীকে দল হারায়। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সার্থক হয়, এতে দলকে হারাতে হয় আক্রমণকারী দলের নেত্রী প্রীতিলতাকে। প্রীতিলতা সেদিন শহীদ হয়, বাঙলার অগ্নিযুগের প্রথম মহিলা শহীদ।

প্রীতিলতার নিকট শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পত্র

(১)

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
শুক্রবার বেলা দশটা
১০|৭|৩১ ইং

মনে হচ্ছে, একদিন তোমার ব্লাউজে একখানা স্বামীজির মনোগ্রাম আঁটা দেখেছিলাম। আমার ওটা খুব ভাল লেগেছিল। যুগগুরুর প্রতি এই অকপট শ্রদ্ধা এমনি করে চিরদিন তোমার অন্তর আলো করে রাখবে কি? ওকে তোমার খুব ভাল লাগে, আমারও তাই। কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে ওর কী পরিচয় তোমার জানা আছে? কি জবাব দেবো ভেবে ত পাইনে। ওকে কতখানিই বা আমরা চিনতে পেরেছি। পশ্চিমের লোকেরা বলেছে cyclonic Hindu — আমার মতে He is the moral and spiritual force of all India — আজকালকার দিনে কথা কাটাকাটির ত অন্ত নেই। কারণ Blind belief জিনিষটা পছন্দ করে না কেউ। কিন্তু বিবেকানন্দর বেলায় কোন্ যুক্তিতর্কের আমল দিতে চাইনে। ওর প্রত্যেকটি কথা শুধু ওর কথা বলেই বিনা বিচারে মেনে নেওয়া চলে, ওর আদর্শের উপর একান্ত চিত্তে নির্ভর করা চলে। শুধু sentiment এর দিক থেকে আমার এ ধারণা জন্মেনি, ওকে চিনবার যেটুকু চেষ্টা আমি করেছি তার তরফ থেকেই আমি বলছি, মনুষ্যত্বের এত বড় আদর্শ আর কেউ দিতে পারেনি, পারবে কিনা তাও জানি না। মানুষকে শুধু মানুষ বলেই আর কেউ এমন ভালো বেসেছে কি?

অনেকদিন ভেবেছি তোমায় লিখব। তুমি লিখবে বলে আমিও লিখিনি। আমার চিঠির উত্তর পাব নিশ্চয়। বড় চিঠি লিখব ভেবেছিলাম কিন্তু ভাবলেই ত লেখা যায় না, তেমন পুঁজি ত থাকা চাই। সে যাক্ আমার চিঠি কিন্তু চাই-ই। বেশ ভালই আছি। বেহায়া শরীরটাকে বাগ মানাতে এখনও পারিনি। সব সময় অসুস্থ হব হব করে। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা জেনো। আসি তা হলে।

তোমার 'রামকৃষ্ণদা'

(২)

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
বুধবার ২৯|৭|৩১ ইং

তোমার baby envelopeখানা অদ্য দুপুরে পেলাম। তার মধ্যে দেখি এক দুই করে চার পাতা চিঠি। দেখে খুসী হলাম। বসে বসে অনেকবার পড়া যাবে। পড়তে গিয়ে পড়লাম গণ্ডগোলে। কিছুই দেখি পড়তে পারিনে। অবাক হয়ে লেখাগুলোর দিকে চাইছিলাম। আগে তোমার লেখা দেখে কত হাসতাম আজ কিন্তু প্রশংসা না করে পারছিনে। আমার লেখা দেখে তুমি নিশ্চয় হাস, হেসো না কিন্তু; আমি রাগ করব।

এত লম্বা চিঠি লিখেছ আমার কাছ থেকে তেমন একখানি পাবে বলে। কিন্তু তোমাকে জানাচ্ছি আমার লিখতে বড় কষ্ট হচ্ছে। আজ তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমাকে বলেছিলাম সর্দ্দি হয়েছে কিন্তু তখনই ১০২° জ্বর ছিল। দুপুরের দিকে জ্বর বাড়তে লাগল, প্রায় ১০৪° এর বেশী উঠল। বিছানা নিতে হ'ল কিন্তু তবুও ইচ্ছা হ'ল তোমার চিঠির উত্তর লিখি। কাগজ তখনও পাইনি কাজেই লেখাও হয়নি। এখন রাত আটটা বেজেছে কিন্তু জ্বর ত এখনও একটু কমলো না। মাথাটা বুঝি এবার ভেঙ্গে যাবে। সারাদিন সকলে হুড়াহুড়ি করেছে, এখন চিঠি লিখতে আমাকে সবাই বারণ করছে। কিন্তু এক দিন দেরী হওয়া যে আমার পক্ষে কি তাও বুঝতেই পার। বাম হাতে মাথায় ice bag চেপে ধরে লিখছি কিছুতেই সুবিধা পাচ্ছি না। তবু লিখে যাচ্ছি — তোমার কথা না রাখলে যে রাগ করবে।

এত কথাও তোমার মনে থাকে? আজ তোমার চিঠি পড়ে সমস্ত অতীতটা একবার চোখের উপর ভেসে উঠল। তুমি কিন্তু ভারী দুষ্টু, কি সব মনে করিয়ে দিচ্ছ বল ত? তুমি মনে করেছ আমি সব ভুলে গেছি কিন্তু সত্যি আমি ভুলিনি। আমার আজও মনে পড়ছে।

তোমার সজল চোখ দুটি, আর কাঁদ কাঁদ মুখখানি, কি নিষ্ঠুরই আমি ছিলাম। তুচ্ছ একটা কানবালার লোভে তোমার কান পাকড়ে ধরে ছিলাম; তোমার হয়ত এই স্মৃতিটুকুই আনন্দ দিচ্ছে, কিন্তু আমি ত আনন্দ পাচ্ছি না মোটেই। ঝোঁকের মাথায় কিলটা চড়টা মেরে বসি কিন্তু তুমি কাঁদছ দেখলেই প্রাণটা হায় হায় করে ওঠে। কিন্তু তোমার কাছে তা প্রকাশ করতে পারিনে। দাদাগিরির অভিমান এসে বাধা দেয়। এখনও কথা বলতে গিয়ে কোথায় জানি তোমাকে offend করে ফেলি। যখন বলি তখন হুঁশই থাকে না পরে analyse করে দেখে যখন টের পাই তখন তা বুকে তীরের মত বেঁধে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। কত মধুর স্মৃতিই মনের কোণে জোট বেঁধেছে। সে দিন নেই কিন্তু সে সুখের রেশও ত যায়নি, আজ সুর গিয়েছে থেমে তবু "নীরবতায়

বাজছে বীণা বিনা প্রয়োজনে'', সত্যি সকল জিনিষেরই কল্পনা অতি মধুর। যতক্ষণ তুমি তোমার প্রার্থিত বস্তুটি পাওনি ততক্ষণ তা পেলে কেমন আনন্দ হবে তা ভেবে যতখানি তৃপ্তি পাও সত্যি সত্যি জিনিষটা পেয়ে গেলে তেমনটি পাও না, মনে হয় এ আর বিশেষ কি, যেন খুব সহজেই পেতে, এ কথা সত্যি নয় কি?

তোমার মতে আমি শুষ্ক, গান জিনিষটা মোটেই পছন্দ করিনে এই ত। কিন্তু তোমার এ ধারণা ভুল। গান জিনিষটা পছন্দ করে না এমন কাউকে ত আমি দেখি নে। উহার এমন আশ্চর্য্য শক্তি যে যে-কোন অবস্থায় মানুষের মনের একটা স্বচ্ছন্দ ভাব এনে দিতে পারে। তোমার গান শুনতে আমার সব সময়ে ভাল লাগত। কিন্তু তোমাদের মত বসে বসে তর্জ্জমা করবার ফুরসৎ আমার কোথায় — বিশেষতঃ আমি মোটেই সমঝদার নই, কানে বেশ লাগে — আসলে ছাঁই-পাঁশ কিছুই বুঝিনে; তোমাকে আমার গানের একটু নমুনা দিচ্ছি। একদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি আর সে দুইখানি চেয়ার পেতে বসে আছি, এমন সময় একটি ছোট মেয়ে কোলে একটি ছেলে নিয়ে এলো। ছেলেটির সে কি কান্না। কিছুতেই থামবে না। অগত্যা বন্ধুকে relief দেওয়ার জন্য বললাম ''আমি একটা গান করি'' শুনেই বন্ধুটি দু'হাতে আমার মুখ চেপে ধরল ''তুই থাম ভাই, তোর গানের চেয়ে ছেলের কান্না ঢের ভাল।'' দেখতো কেমন তারিফ করল আমার গানের। এখানে কিন্তু আমরা দু'জনে গান করতাম, কয়েকটি কোরাস আমাদের বাঁধা ছিল। বাইরে হলে এমন দুঃসাহস কখনো করতাম না। গানের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত পিঠে বিশ চড়ই পড়ত। কিন্তু এখানে বাধা দেয় না কেউ, তবে দু'জনে যখন সুর ভাঁজতাম তখন হাত শতকের ভিতর কেউ বোধ হয় কারো কথা শুনতে পেত না।

এখন তুমি কি করছ জানিনে। হয়ত বই নিয়ে বসেছ কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে তোমার দু'পাতাও পড়া হচ্ছে না। মনটা তোমার কোথায় উধাও হয়ে চলে গেছে, তুমি তাকে বইতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না। তুমি লিখেছ ডিগ্রী পাওয়াটাই বড় নয়; ডিগ্রী না পেলেও অনেকে বিদ্বান্ হতে পারে। এ যুক্তি আমি মানি নে তা নয় তবে আমার মত ব্যক্তি যদি একথা বলে তখনই লোকে মুখের উপর বলবে ''Grapes are sour'' কেমন বলবে ত? আমার কিন্তু বড় ভয় আমি কিছুতেই এ কথা বলতে পারিনে।

প্রায় তিন পাতা ত লিখলাম — আর ত পারছিনে, মাথাটা কেবল টন টন করছে, এবার আমাকে ছুটি দাও, এই নিয়ে খুসী থেকো, কেমন?

(প্রবাসী, ১৩৫৬, বৈশাখ সংখ্যা থেকে গৃহীত)

বোমা রিভলবার ও রাইফেল

প্রীতি সম্মেলনে ইউরোপীয়ানদিগকে আক্রমণ

পুরুষের বেশে বিপ্লবী নারী নিহত

কুমারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বলিয়া সনাক্ত

জনৈকা ইউরোপীয় মহিলাও নিহত

আক্রমণকারীদের পলায়ন

চট্টগ্রাম, ২৫শে সেপ্টেম্বর

গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় বিপ্লবী বলিয়া বর্ণিত একদল লোক, পাহাড়তলী ইনস্টিটিউট নামক আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাবে অতিশয় দুঃসাহসিকভাবে ইউরোপীয়ানদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণকারীর দলে পুরুষের বেশে সজ্জিত একজন নারীও ছিল। এপর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ৭/৮ জন লোক বোমা, রিভলবার এবং রাইফেল লইয়া ক্লাবটি আক্রমণ করিয়াছিল। কারণ ঘটনাস্থলে রাইফেলে ব্যবহৃত কয়েকটি কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। ফাটে নাই — এমন কয়েকটি বোমাও নাকি পুলিশ পাইয়াছে। প্রকাশ যে ক্লাবের উপর কতকগুলি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

আরও প্রকাশ যে রিভলবার ও রাইফেল সহ দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ চলিয়াছিল। ইহাতে ৭/৮ জন ইউরোপীয়ান অল্প বিস্তর আহত হইয়াছেন। তাহাদিগকে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। জনৈকা বৃদ্ধা ইউরোপীয়ান মহিলার উপর গুলি পড়িয়াছিল। ইহা তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া যায়। ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আক্রমণকারী দলের আর সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। পুরুষের পোষাকে সজ্জিত এই নারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ ক্লাব হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছিল। ইহার বক্ষঃস্থল গুলিবিদ্ধ হইয়াছিল। প্রকাশ যে, এই স্ত্রীলোকটিকে কুমারী প্রীতি ওয়াদ্দেদার বি. এ. বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। সে নাকি চট্টগ্রাম শহরের শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু ওয়াদ্দেদারের কন্যা। তাহার পকেটে রিভলভার ও রাইফেলের কতকগুলি কার্ত্তজ পাওয়া গিয়াছে।

দুই রকমের বিপ্লবী ইস্তাহার তাঁহার নিকট পাওয়া গিয়াছে। গতকল্য রাত্রিকালে চট্টগ্রাম শহরের নানাস্থানে এরূপ ভীতি মূলক ইস্তাহার লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে ইউরোপীয়ানদের সমূহ বিপদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। ইউরোপীয়ান ক্লাবের নিকটে মুসলমানদের ব্যবহৃত কতকগুলি টুপীও পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ পলাইয়া যাইবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া আক্রমণকারীরা মুসলমানেব পোষাক পরিযা আসিয়াছিল।

নানাস্থানে বিশেষভাবে খানাতল্লাস হইতেছে।

— ফ্রী প্রেস

(অপর বিবরণ)

চট্টগ্রাম, ২৫শে সেপ্টে:

গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থিত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইউরোপীয়ান ইনস্টিটিউটে যখন প্রীতি-সম্মেলন হইতেছিল, তখন একদল বিপ্লবী পুলিশ মাস্কেট (৪৭৬) রিভলবার, বন্দুক ও বোমা লইয়া উক্ত ইউরোপীয়ান ক্লাবে হানা দেয়। আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহার ফলে একজন বৃদ্ধা ইউরোপীয়ান মহিলা নিহত এবং ইন্সপেক্টার ম্যাকডোনাল্ড সার্জ্জেন্ট উইলিস এবং অপর ছয়জন ইউরোপীয়ান আহত হন। মৃত ইউরোপীয়ান মহিলার নাম এখনও জানা যায় নাই।

আক্রমণকারীগণ পলাইয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই। ঘটনার নিকটবর্ত্তী স্থানে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ইনস্টিটিউটের নিকটে গুলিতে নিহত ২০ বৎসর বয়স্কা এক মহিলার দেহ পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। বিগত ১৪ই জুন তারিখে ধলঘাট সঙ্ঘর্ষে নিহত এক ব্যক্তির নিকট প্রীতিলতার ফটো পাওয়া গিয়াছিল। প্রীতিলতাকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য গবর্নমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি এই বারই কলিকাতার বেথুন কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়াছিলেন।

— এ. পি.

১০ জন আক্রমণকারী

দার্জ্জিলিং, ২৫শে সেপ্টেম্বর

গত রাত্রিতে চট্টগ্রামে যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ণ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে ইহা জানা গিয়াছে যে, আক্রমণকারীদের সংখ্যা ১০ জন ছিল। তন্মধ্যে একজন নারী। সংবাদ আদান-প্রদানের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। আর কোন গোলমাল হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

— এ.পি.

বাঙ্গালার লাটের তার
আহতদের প্রতি সমবেদনা

চট্টগ্রাম, ২৫শে সেপ্টেম্বর

পাহাড়তলীর ব্যাপার সম্পর্কে আসাম্-বেঙ্গল রেলপথের এজেন্ট বাঙ্গলার লাটের নিকট হইতে নিম্নলিখিত তাব পাইয়াছেন —

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের ঘৃণিত ব্যাপারের সংবাদ এইমাত্র পাইলাম। আহতদের অবস্থা কিরূপ আছে, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র আছি। অনুগ্রহপূর্বক উপদ্রুত ব্যক্তিদিগকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিবেন। এই ব্যাপার অত্যন্ত পাশবিক। অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করা অথবা আহত কবিবার উদ্দেশ্যেই ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভারতবর্ষ এবং জগতের সর্ব্বত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তরে এই ব্যাপারে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবেই। সেসব অপরাধী এখনও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে স্বাধীন আছে, তাহারা যাহাতে সত্বর ধরা পড়ে, সেজন্য গবর্নমেন্ট লোকের সহযোগিতার আশা করিতেছেন।

খানাতল্লাসী

কতকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং কয়েকজন যুবককে কোতোয়ালীতে লইয়া যাওয়া হয়।

শহর ও পাহাড়তলীর বিভিন্ন স্থান হইতে নানাধরণের বৈপ্লবিক লাল ইস্তাহার পাওয়া গিয়াছে।

নিহত শ্বেতাঙ্গ মহিলার নাম মিসেস সুলিভান।

— এ. পি.

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

২৬. ৯. ১৯৩২

চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের হানা
বিষপানে নারী বিপ্লবীর মৃত্যু
১৩ জন আহত ও ১ জন মহিলা নিহত

চট্টগ্রাম, ২৬শে সেপ্টেম্বর

প্রকাশ যে, পাহাড়তলীর ব্যাপারে ১৪ জন হতাহত হইয়াছে। মিসেস সালিভান নিহত হইয়াছেন এবং অন্যান্য ১৩ জন আহত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫ জন মহিলা এবং ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, সার্জ্জন উইলিস ও বন্দরের একখানি জাহাজের জনৈক কর্ম্মচারী মিঃ চ্যাপম্যান আহত হইযাছেন। আহতদের অধিকাংশই রেল কর্ম্মচারী। তাঁহাদিগকে কটেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদের সকলের অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া প্রকাশ। আক্রমণকারীগণের মধ্যে শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহাকে পুরুযের বেশে মৃত অবস্থায় পাওযা গিয়াছে। পাঠকগণের স্মরণে থাকিতে পারে যে ধলঘাট মামলা সম্পর্কে এই মেয়েটিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার শুনানী চলিতেছে। যে বাড়ীতে ফেরারী আসামীর খোঁজ পাওয়া গিয়াছিল, সেই বাড়ীতে শ্রীমতী প্রীতিলতার একখানি ফটো পাওয়া যায়। প্রীতিলতা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইনি কিছুদিনের জন্য স্থানীয় মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের কিছুক্ষণ পরেই সরকারী কর্ম্মচারীগণ ও সৈন্যদল সকল তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে রওনা হয়। ইনস্টিটিউটের মধ্যে কতকগুলি বোমার টুকরা ও গুলিকরা শূন্য কার্ত্তুজ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশ যে, বিগত ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত বন্দুক দ্বারাই এই সকল গুলি করা হইয়াছে। দুইটি বোমাও পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত শহর নিস্তব্ধতার ধারণ করিয়াছে।

স্থানীয় জেলা উকিল সমিতি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের এই ঘৃণিত ব্যাপারে তীব্র নিন্দা করিয়া ও হতাহতগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বিপ্লবপন্থার নিন্দা করিয়া এই সমিতি গবর্নমেন্টের সহযোগিতায় চট্টগ্রামবাসীগণকে বিপ্লবী দলের ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন।

— এ. পি.

পদব্রজে বিপ্লবীদের স্থানত্যাগ

একদল কর্তৃক ইস্তাহার বিলি

পাহাড়তলী ব্যাপারে আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আক্রমণকারিগণ মোট ১২ জন ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল, তাহারা পদব্রজে অগ্রসর হয়। আহত ৮ জন পুরুষ ও মহিলারা মধ্যে ৫ জনের অবস্থা গুরুতর বলিয়া প্রকাশ।

৬০ বৎসর বয়স্কা জনৈকা মহিলা মিসেস সালিভ্যান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। বিপ্লবী দল পদব্রজে স্থান ত্যাগ করে।

চৌমাথার ধারে পাহাড়তলী হাইস্কুলের সন্নিকটে ক্লাবটি নিতান্ত অরক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। ইহার প্রায় দেড় মাইল দূরে গুবখা রাইফেল দলের ছাউনি।

বিপ্লবীদের একদল লাল ইস্তাহার বিলি করিতে ও দেওয়ালে লাগাইতে নিযুক্ত ছিল এবং অন্যদল ক্লাবগৃহ আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রীতিলতা বুকের কাছে সামান্য জখম হইয়াছিলেন এবং উহার ফলে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন। তিনি বাঙ্গালী পুরুষের বেশে সজ্জিত ছিলেন। তাঁহার শবব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য পাঠান হইয়াছে। মৃতদেহ তাঁহার আত্মীয়গণের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে।

অদ্য সকালে রায় বাহাদুর কামিনী দাস, নগেন্দ্র গুহ, মিঃ পার্সিভ্যাল ও আব্দুল খালেক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই দুর্ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের যে ১২ জন লোক বন্দুক সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল ও সকলের নজর এড়াইয়া রাত্রি প্রথম ভাগেই তাহারা শহরময় লাল ইস্তাহার লাগাইল। অতঃপর তিনি শহরবাসীগণকে কর্তৃপক্ষের সহিত যোগ দিয়া আততায়ীগণকে খোঁজ করিয়া বাহির করিতে অনুরোধ করেন।

প্রকাশ যে, আগামী বুধবার বিশিষ্ট শহরবাসীগণ একটি সভা করিয়া এই ঘটনার ও বিপ্লবী দলের তীব্র নিন্দাবাদ করিবেন।

—ফ্রী প্রেস

(আনন্দবাজার পত্রিকা)
২৭.৯.১৯৩২

মাষ্টারদা আমার প্রাণের ভেতর

কামালউদ্দিন আহমদ খাঁ

আমি মাষ্টাবদাকে দেখি ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে জে. এম. সেন হলে; শ্রোতা ও দর্শক হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলাম। সুভাষ বসুকে দেখতে এসেছি; মাষ্টারদারও নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সুভাষ বসুর সুদর্শন চেহারা, মাষ্টারদা সে তুলনায় ছোট খাটো হালকা পাতলা গড়ন। তখন কংগ্রেসের জোয়ার, কংগ্রেসের কোনো অনুষ্ঠানে লোকে লোকারণ্য। আমার বাড়ি করালডেঙ্গা, বোয়ালখালী, তখন পনেরো ষোল বছর বয়স, আমাদের করালডেঙ্গার অন্যান্য ছাত্র যুবকদের মধ্যে লাঠিখেলা, কুস্তি শরীরচর্চা ইত্যাদি করতাম, আমাদের গ্রামে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ সকলে মিলেমিশে ছিলো, অত্যন্ত সদ্ভাব আমাদের মধ্যে বজায় ছিলো, কিন্তু হিন্দু যুবকেরা যেহেতু লেখা পড়ায় এগিয়ে ছিলো তাই তারা আমাদের নানা বই পড়তে দিতো, নানা বিষয়ে উপদেশ দিতো, তারা বলতে গেলে আমাদের দাদা ছিল।

আমার আড্ডা ছিল রাম কুমার ও রাজকুমারের বাড়িতে, তাদের সাথে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল, বিপ্লবীরা ১৯৩০ সালের জালালাবাদ যুদ্ধের পর গ্রামে চলে যান, আমাদের গ্রামে তাদের নিরাপদ আশ্রয়; করালডেঙ্গা পাহাড়ের ছন খোলার ভেতর তারা লুকিয়ে থাকতেন, সেখানে অস্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি হতো। ১৯৩২ সালে মাষ্টারদাকে আমি প্রত্যক্ষ দেখি; তিনি শিব চরণের বাড়িতে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ সময় প্রায় দু'মাস এখানে ছিলেন, বিপ্লবীরা ছিল ছনখোলার ভেতর, প্রতিদিন শিবচরণের বাড়ি থেকে রান্না করে তাঁদের জন্যে ভাত নিয়ে যাওয়া হতো পাহাড়ের জঙ্গলে, ভাত নিতাম আমি, আব্দুল হক, শিব চরণ দাস, জীবক বড়ুয়া প্রমুখ। এটা অগ্রহায়ন পৌষ মাসের দিকে। মাষ্টারদা সারদা শীলের ধোরলা বাড়ীতে, সেখানেও দেখা করেছি। মীর আহমদের বাড়িতে মাষ্টারদা যখন ছিলেন তখন একটা চিঠি মাষ্টারদাকে পৌঁছে দিয়েছি। মাষ্টারদা ছিলেন মাটির গর্তে এবং উপরে মীর আহমদের মা বিছানা করে শুয়েছেন, সেখান থেকে মাষ্টারদাকে উঠে আসতে দেখেছি। তবে অন্যান্য বিপ্লবীদের থাকার আশ্রয় এবং নৌকা পার করার জন্যে আমি সাহায্য করেছি। আমার বন্ধু সুশীল দে, যিনি ধুম রেল লাইন তুলেছিলেন এবং প্রীতিলতার সাথে ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁকে আমি বহুবার আশ্রয় দিয়েছি, নিরাপদ স্থানে পার করে দিয়েছি।

অনেকের ধারণা হিন্দু যুবকেরা এই বিপ্লবী দলে ছিলেন আর অন্য কেউ এ কাজ গ্রহণ করেন নি একথা ঠিক নয়; এ দলে বহু মুসলমান ও বৌদ্ধ ছিলেন তথে হিন্দুরা

অগ্রসর এবং শিক্ষিত বলে আমাদের উপর দাদার কাজ করতেন।

তবে বিপ্লবীদের আশ্রয় দান কিংবা নিরাপদে চলা ফেরার জন্যে হিন্দুরা যেমন এগিয়ে আসতেন, মুসলমানরাও কোথায় বিরোধিতা করে নি, আমি বলবো মাষ্টারদাকে মুসলমানরা অত্যন্ত-আপন লোক হিসাবে দেখতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

মাষ্টারদার কাছে কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি ছিল না। যে অল্প সময়ের জন্যে তাঁকে দেখেছি কোনো রূঢ় ভাব কিংবা কারো প্রতি প্রভেদমূলক আচরণ করতে দেখিনি। মাষ্টারদা সকলের প্রিয়, মাষ্টারদাকে একবার খুব কাছে থেকে দেখার পর আমি জীবনে অন্য কিছু করতে পারি নি, দেশের জন্যে জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছি। মাষ্টারদার আদর্শকে বুকের ভেতর সম্বল করেছি।

কিন্তু দুঃখ তখনকার দিনের সেই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সদ্ভাব এখন আর দেখা যায় না; এখন যেন মনে হয় আমরা খুব পর হয়ে গেলাম, আমার বিপ্লবী বন্ধুরা আমাদের সামান্য সংযোগকে আজ স্বীকৃতি দিতে নারাজ; দেশের সবাই জানে আমি কি করেছিলাম, আবদুল হক কি করেছিলো; নোয়াব মিয়ার উপর কি অত্যাচার হয়েছিল, নওয়াব মিয়া ছয় বছর জেল খেটেছিলেন, সে কথা লেখা হয় না। এটা সত্য ব্রিটিশ পুলিশ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চেষ্টা করেছিলো, এসব হিন্দুদের কাজ বলেছিলো কিন্তু ব্রিটিশের কথা কেউ বিশ্বাস করতেন না; তবে তারা দু-একজন গুণ্ডা যে জোগাড় করতে পারে নি তা নয়, সাধারণ মানুষ এ সব গুণ্ডাদের মোটেই পছন্দ করতো না।

বিপ্লবীদের কাজ ছিল অত্যন্ত গোপনে, তাই তারা মুসলমানপাড়াতে লুকাবার সময় বোরখা পরে কৃষকের বেশে লাঙ্গল কাঁধে কোদাল ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। আমার বন্ধু সুশীল জেলেদের জাল নিয়ে পালাতেন। এমনি দু'একবারের জন্যে গা ঢাকা দিতে সাহায্য করেছিলাম। এসব কাজের জন্যে অনেক দুঃখ পোহাতে হতো, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হতো; তবে যতই নির্যাতন চলতো ততই মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এবং বিপ্লবীদের পক্ষে চলে এসেছিলো।..........

(শ্রী অমলেন্দু দে সম্পাদিত সূর্য সেন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম গ্রন্থ থেকে)

ধলঘাটের যুদ্ধ

মণিলাল দত্ত

"তিন চারদিন ধরে মাষ্টারদার সঙ্গে ধলঘাটের গোপন আশ্রয়স্থলে থেকে ঘন্টা তিনেক আগে বাসায় ফিরেছি। আমি যে বাসায় থাকতাম, তা ঐ গ্রামের এক প্রান্তে, আশ্রয়স্থল হতে আধ মাইল দূরে। পুলিশের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য কিছুদিন ঐ বাড়ীতে আমি গৃহ - শিক্ষক হিসাবে ছিলাম। তিন-চারদিন ধরে অনিদ্রায় থেকে চোখ খুবই ক্লান্ত ছিল, তাই শুয়ে পড়তে না পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। গুলি গোলার আওয়াজ কিছুই কানে এলো না।

রাত তখন প্রায় বারোটা। আমার ছাত্র ননী আমার গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। ননী তার বাবার সাথে বারান্দায় শুয়েছিল। আমার নাম ধরে কয়েকবার ডাক শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে মাষ্টারদাকে চিনত, মাষ্টারদাও ননীকে চিনতেন। ভিজে কাপড়ে ঐ সময়ে ঐ অবস্থায় মাষ্টারদাকে দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। মাষ্টারদা তাকে বললেন, আমাকে ডেকে দিতে। সে আমাকে জাগিয়ে খবরটা দিতেই এই অভাবনীয় ঘটনায় আমি চমকে উঠি। কোন একটা বিপদের আশঙ্কায় বুক দুর দুর করতে লাগলো। ছুটে গিয়ে মাষ্টারদার সামনে যেতেই তিনি বললেন,' আমাদের আশ্রয়স্থল সৈন্যবেষ্টিত। দু'পক্ষে অনেকক্ষণ গুলি চালাচালি হয়েছে। নির্মলবাবু ও ভোলা নিহত।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'প্রীতিদি'? তিনি বললেন, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, চল্ তাড়াতাড়ি, ভেবে ঠিক কর্ কোথায় আমাদের নিয়ে যাবি। আমি তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

কয়েকদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠঘাট সব জলে ডুবে গেছে, অনেক রাস্তা জলের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জলের মধ্যদিয়ে রওনা হলাম জৈষ্ঠ্যপুরা গ্রামের এক আশ্রয়স্থলের উদ্দেশ্যে। এই আশ্রয়স্থলের নাম রাখা হয়েছিল 'কুটির'। এর খুব কাছেই ছিল পাহাড় ও জঙ্গল। আর কিছুদূরে ছিল নদীপথ। পরদিন পুলিশ তন্ন তন্ন করে গ্রামে গ্রামে মাষ্টারদাকে খুঁজে বেড়াবে। কাজেই প্রয়োজন হলে ঐ জঙ্গলে ঢুকে পড়া যাবে ভেবে ঐ দিকে রওনা হই । এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হল প্রায় মাইল তিনেক। কোথাও এক কোমর, কোথাও বা সাঁতার কাটার মত জল।"

(সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির সৌজন্যে)

University of Calcutta

MATRICULATION EXAMINATION

I certify that Pritilata Wadder

of Chittagong Dr. Khastagir's High School for Girls aged

~~years~~ ~~months~~ on the 1st of March, 1928, duly

passed the Matriculation Examination, held in the month of

March, 1928 and was placed in the First Division.

SENATE HOUSE:

The 14th June, 1928.

Controller of Examinations.

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রাপ্ত প্রীতিলতার শংসাপত্র (১৯২৮)

Calcutta Sanskrit Association.

CALCUTTA SANSKRIT ASSOCIATION

This is to certify that Srimati Pritilata Wadada

Daughter of Jagatbandhu Wadadar

of Village Dhalghat Post Office Dhalghat

District Chittagong and pupil

of Pandit Tripura Charan Kavya Vyakaran Smrititirtha place

of Tol Emattanagar in the District of Chittagong

duly passed the First Sanskrit Examination in Kalap.

held in the month of February 1926, and was placed in

the First Division

Kshirod Chandra Ray
President of the Vidyadhirini Sabha
Chittagong Association.
Secretary [illegible]
The [illegible] 192[illegible]

Aditya Nath Mukherji
Secretary,
Calcutta Sanskrit Association.
The June 1926

'কলাপ' পরীক্ষায় প্রাপ্ত প্রীতিলতার শংসাপত্র (১৯২৬)

BETHUNE COLLEGE
English - Paper III
Mark Sheet Session 1930

Full Marks ... . . *Third Year B.A Class*

Roll No.	Name	Marks obtained	Remarks
12	Bibha Ghosh	51	
13	Usha Dasgupta (No 2)	52	
14.	Prativamayee Gupta	70	
15.	Santilata Maulik	53	
16	Subarna Kumar Roy	44	
18	Sunity Pakrassy	48	
20	Parulbala Gupta	55	
21	Pritilata Waddar	65	

BETHUNE COLLEGE
Philosophy - Paper I
Mark Sheet Session 1930

Full Marks. *Third Year B.A. Class*

Roll No.	Name	Marks obtained	Remarks
19.	Renu Datta Mazumdar	41	
20	Parulbala Gupta	69	
21	Pritilata Waddar	65	
22	Arundhati Sen		
23	Nalini Banerjee		

(বেথুন কলেজ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে)

No. 1435
V Reg H. 9

Bethune College
11.9.31
14

To The Registrar, Cal University

Sir

In forwarding herewith a migration certificate from the Secretary Board of Intermediate and Secondary Education Dacca in favour of Miss Pritilata Waddar a student of the Fourth year class of this College, I have the honour to state that she passed the matriculation examination from the Calcutta University with mathematics, Sanskrit English Bengali additional mathematics and additional Sanskrit in the year 1928 and was placed in the first division

She passed the Intermediate examination from the Dacca Board in the year 1930 with English, Bengali Sanskrit Economics and Logic, and was placed in the First division

She took admission in the third year BA class of this College on the 10.7.30 with English Bengali Sanskrit and Philosophy

A registration form duly filled up is also ~~sent herewith, in anticipation~~ enclosed.

A sum of Rs 17/- (Rupees seventeen only) being the migration (Rs 15/-) and registration fee (Rs 2/-) of the student is sent herewith. The favour of an acknowledgment of the receipt of the money is requested.

I have etc.
Rajkumari Das
Principal, Bethune College

প্রীতিলতার মাইগ্রেশন্ সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে এই পত্র লিখেছিলেন বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা রাজকুমারী দাশ।

No C/1211/O.U.

In replying please quote the number and date of this letter

The Registrar, University of Calcutta.

To

The Principal,

Bethune College, Calcutta.

Madam,

With reference to your letter No.1435/V.Reg.Mig., dated the 14th September,1931, on the subject of migration of Miss Pritilata Wadder, I have the honour to point out that in the first paragraph of the letter the student has been shown as belonging to the <u>4th year class</u> of your college, whereas in the third paragraph it has been stated that she took admission to the <u>third year B.A. Class</u> on the 16th July, 1931. As it appears to be a discrepancy, probably due to a clerical error, I am to request that the class to which the student now belongs as also the class to which she was admitted on migration from the Dacca Board together with the date of her admission may be correctly stated.

In this connection I am to add that in case the student was admitted to the 3rd year class of your college in 1930, the reason why the case was not reported to the University in proper time may also be stated.

I have the honour to be,
Madam,
Your most obedient servant,
[signature]
Registrar.

প্রীতিলতার মাইগ্রেশন্ সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যক্ষা রাজকুমারী দাশের নিকট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পত্র

The Principal, Bethune College.

Education

The Principal, Bethune College.

1581
V.Reg.Mig. the 5th October 1931

The Registrar,
Calcutta University.

Sir,

With reference to your letter No.C/1211/O.U. dated the 23rd September, 1931, I have the honour to state that Miss Pritilata Waddar is a student of the Fourth year class of this College. She took admission into the third B.A. class on the 10th July, 1930.

With reference to para 2 of your letter, I have the honour to state that her case was forwarded to you as soon as the migration certificate together with the migration fee was received from the student. The student was late in the submission of her migration certificate, although repeated reminders were sent to her.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Raj Kumari Das

P.B.

প্রীতিলতার মাইগ্রেশন্ সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যক্ষা রাজকুমারী দাশের পত্র

চিত্রে ধলঘাট ইউনিয়নে মাষ্টারদা সূর্য সেনের বিচরণ ক্ষেত্র
প্রীতিলতার বাস্তুভিটা ও উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহ

দক্ষিণে পটিয়া

পটিয়া বোয়ালখালী সংযোগ সড়ক

পূর্বে কেলিশহর

পশ্চিমে গৈড়লা

বীরকন্যা প্রীতিলতার বাস্তুভিটা,
প্রীতিলতা ও অর্ধেন্দু দস্তিদারের স্মৃতিস্তম্ভ

গৈড়লার যে বাড়ি থেকে
মাষ্টারদা সূর্য সেন বৃটিশ
আর্মিদের হাতে
গ্রেপ্তার হন।

সাবিত্রী দেবীর বাড়ী। যে বাড়ীতে
নির্মল সেন, অপূর্ব সেন শহীদ
হয়েছেন এবং বৃটিশ আর্মি ক্যামারুণ
মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক পুলিন দে সড়ক

ছালেহ্ আহম্মদ সড়ক

ঐতিহাসিক ধলঘাট বৃটিশ সৈন্যদের ক্যাম্প

বীর কন্যা প্রীতিলতা
প্রাথমিক বিদ্যালয় ও
প্রীতিলতার আবক্ষমূর্তি

উত্তরে বোয়ালখালী

(শ্রী পঙ্কজ চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের সৌজন্যে)

পাদটীকা

১. পূর্ণেন্দু দস্তিদার। চট্টগ্রামে মাষ্টারদা সূর্য সেনের সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু বছর কারাবরণ করেছেন। প্রীতিলতার সম্পর্কিত দাদা।

২. বিপ্লবী কল্পনা দত্ত। আত্মগোপনকালীন অবস্থায় ১৯৩৩ সালের ২০ মে তিনি ও তারকেশ্বর দস্তিদার ধরা পড়েন। বিচারে তারকেশ্বরের ফাঁসির হুকুম ও তাঁর কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

৩. বিপ্লবী লীলা রায়। ঢাকায় দিপালী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু বছর কারাবরণ করেছেন।

৪. বিপ্লবী অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে তিনি আহত হন এবং শেষে ২৪ এপ্রিল ১৯৩০ শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। প্রীতিলতার সম্পর্কিত দাদা।

৫. মাষ্টারদার সংগঠনের সাথে যুক্ত এই বিপ্লবী বহুবছর কারাবরণ করেছিলেন।

৬. বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তর গুনু পিসীমা। দল নির্বিশেষে সমস্ত বিপ্লবীকেই তিনি সাধ্যমত সাহায্য করতেন।

৭. তারকেশ্বর দস্তিদার, মাষ্টারদার পর ইনি সংগঠনের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারী ফাঁসিমঞ্চে তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

৮. শহীদ অমরেন্দ্র নন্দী। যুব বিদ্রোহ ও জালালাবাদ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী। ১৯৩০ সালের ২৪ এপ্রিল শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

৯. বিপ্লবী বীরেন দে। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার ওয়াতলী গ্রামে বাড়ী। যুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী।

১০. বিপ্লবী বীণা দাস। ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসনকে গুলী করেছিলেন। এজন্য তাঁর ৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

১১. বিপ্লবী বিনোদ বিহারী দত্ত। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও জালালাবাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের আত্মোৎসর্গের পর তিনিই হয়েছিলেন সংগঠনের তৃতীয় সভাপতি।

১২. কালীপদ চক্রবর্তী। তারিণী মুখার্জী হত্যা মামলায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম ও কালীপদ চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল।

১৩. শৈলেশ্বর চক্রবর্তী। যুব বিদ্রোহ ও জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জীবনপঞ্জি

১৯১১ — ৫ই মে, মঙ্গলবাব। চট্টগ্রাম জেলাব ধলঘাট গ্রামে জন্ম।

১৯১৮ — ডাঃ খাস্তগীর ইংবাজী উচ্চবিদ্যালযে প্রাথমিকে ভর্তি।

১৯২৬ — সংস্কৃত কলাপ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ।

১৯২৮ — ঐ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ ও ঢাকা ইডেন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি। বিপ্লবী লীলা বাযের সাথে পরিচয ও ঘনিষ্ঠতা।

১৯৩০ — ইন্টারমিডিয়েটে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সবাব মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার। কলকাতার বেথুন কলেজে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে ভর্তি। গুনু পিসীমার সাথে পবিচয়।

১৯৩১ — বামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎ। ৪ঠা আগষ্ট রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির মঞ্চে আত্মোৎসর্গের পর বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেওয়াব ঐকান্তিক আগ্রহ।

১৯৩২ — বেথুন কলেজ থেকে ডিসটিংকসনে বি. এ পাশ।

চট্টগ্রামে অপর্ণাচরণ দে হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকা পদে যোগদান।

বিপ্লবী নির্মল সেনের সাথে সাক্ষাৎ।

মাষ্টারদা সূর্য সেনের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা।

১৩ জুন ধলঘাটের সংগ্রাম। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের প্রাণদান।

৫ জুলাই গৃহত্যাগ।

২৪ সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্বদান ও দেশের প্রথম নারী শহীদ হিসাবে গৌরবজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি।

প্রীতিলতার প্রিয় গান

অবনত ভারত চাহে তোমারে
কামিনী কুমার ভট্টাচার্য

অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুবারী।
নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত কর ভারত-নরনারী।
মঙ্গল শঙ্খ ভৈরব নিনাদে বিচূর্ণ কব সব ভেদ বিবাদে
সম্মান শৌর্য্যে, পৌরুষ বীর্য্যে,
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।
মুক্ত সমুন্নত পতাকা তলে মিলাতে ভাবত সকলে,
নব আশে হিন্দুস্থান ধরুক নূতন তান।

এস রিপু শোনিতে মেদিনী রঞ্জিতে নববেশে ভীষণ অসিধারী
এস ভারত পাপনাশকারী।

(বাংলা সংগীত ও ভারত চিন্তা, রাজেশ্বর মিত্র থেকে গৃহীত)